জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে
বিশেষ প্রকাশনা

বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা: উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনা

প্রকাশকাল
জুন ২০২১

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মনিরুল ইসলাম

মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৮সি/১, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত

উপদেষ্টা

- **স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি**
  প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান সম্পাদক

- **মোঃ রেজাউল আহসান**
  সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক

- **মোঃ আমিনুল ইসলাম**
  প্রাক্তন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

সদস্য

- **সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু**
  মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)
- **মোঃ রাশিদুল ইসলাম**
  অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- **চন্দন কুমার দে**
  অতিরিক্ত সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- **আশরাফ উদ্দীন আহাম্মদ খান**
  যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- **কাজী মোশতাক জহির**
  উপসচিব (প্রতিষ্ঠান-২), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- **মোঃ মিজানুর রহমান**
  উপসচিব (প্রশাসন-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- **মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী**
  সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ওয়ার্কিং কমিটি

আহবায়ক

- **এস.এম. মাসুদুর রহমান**
  পরিচালক (যুগ্মসচিব), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

সদস্য

- **মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ**
  যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
- **ড. মোঃ কামরুল হাসান**
  পরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা
- **ড. শেখ মেহ্‌দী মোহাম্মদ**
  ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া
- **মোঃ আবুল খায়ের**
  উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর
- **আফরিন মোহাম্মদ আঁখি**
  প্রোগ্রামার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সদস্য সচিব

- **মোঃ সাইফুল ইসলাম**
  সম্পাদক, সমবায় অধিদপ্তর

"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে— এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।"

— জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণ, ৩০ জুন ১৯৭২

"বর্তমান যুগে ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে সমবায়ের মাধ্যমেই আমাদের দেশের উন্নয়ন করতে পারব।"

— মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবস-২০১৯ উদযাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০২ আষাঢ় ১৪২৮
১৬ জুন ২০২১

বাণী

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদী কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ০৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "প্রত্যেকটি গ্রামে বহুমুখী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে"। সমবায়ের মাধ্যমে আয় বৈষম্য হ্রাস করে তিনি একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগসহ ব্যবসা বাণিজ্যে পুঁজি গঠনে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। এছাড়া স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের সংবিধান রচনা, জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণ, সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল, কৃষি বিপ্লব, কলকারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণসহ দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসাবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি।

বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক; গড়ে উঠুক সাহসী, ত্যাগী ও আদর্শবাদী নেতৃত্ব- এ প্রত্যাশা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১ আষাঢ় ১৪২৮
১৫ জুন ২০২১

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' ডকুমেন্টরি প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। সংবিধানের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। জাতির পিতা দেশের দুগ্ধ চাহিদা পূরণ এবং দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ১৯৭৩ সালে 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। বর্তমানের মিল্কভিটা তাঁরই সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের ফসল। তিনি সমবায়ের মাধ্যমে সমন্বিত/যৌথ খামার প্রচলন করে স্থানীয় রাজস্বে পল্লী উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করি এবং পরবর্তীতে ২০১২ সালে আইন প্রণয়ন করে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিতে রূপান্তর করি। দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক অগ্রগতি ও নারী-পুরুষ সমতার উদ্দেশ্যে পল্লী-দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ প্রণয়নের মাধ্যমে এ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ প্রণয়ন করা হয়। আমরা পুনরায় সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছি।

আমাদের সরকার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করে। ১৯৯৯ সালে সরকার গঠনের পর 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (বর্তমানে আমার বাড়ি আমার খামার)' একটি অনন্য উদ্যোগ গ্রহণ করি। এ প্রকল্পে ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মডেল দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যা দেশে ও বিদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। আমরা এজন্য বাজেট বৃদ্ধি করেছি, প্রশিক্ষণ প্রদান করছি এবং আর্থিক ও উপকরণ সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ জীবনমান ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করছি। জাতীয় অর্থনীতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অবদান আরও শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আসুন, জাতির পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমবায় ভিত্তিতে মূল্যবোধের চর্চা এবং পল্লী উন্নয়ন ও ন্যায় সংগত সমাজ গঠন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করি।

আমি 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' শীর্ষক ডকুমেন্টরি প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিববর্ষ' উদযাপনের অংশ হিসেবে এ প্রকাশনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। বঙ্গবন্ধু সমবায়ের মাধ্যমে শোষণমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এদেশের কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষি ঋণসহ সবক্ষেত্রেই উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাপনা প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা; পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া; বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ; মিল্ক ইউনিয়ন (মিল্ক ভিটা); পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ); ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং বাংলাদেশ জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। তিনি উৎপাদন বৃদ্ধি, সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় পল্লীর উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। গ্রাম ও শহরের উন্নয়নকে একসূত্রে গাঁথার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার 'আমার বাড়ি আমার খামার'সহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিতব্য 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' প্রকাশনাটির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(**মোঃ তাজুল ইসলাম**, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' ডকুমেন্টরি প্রকাশ করছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ প্রকাশনাটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও দক্ষ নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। এ অগ্রযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম।

স্বাধীনতা অর্জনের পর বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এ দেশ হতে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে সমবায় আন্দোলনের সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে সত্যিকার সোনারবাংলা নির্মাণ। তিনি চেয়েছিলেন গ্রামভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে সম্মিলিত উদ্যোগকে জনগণের উন্নয়নে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গঠন করতে।

সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের এক ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াস। দেশের পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ ও পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিসহ নারীর ক্ষমতায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ, মিল্ক ভিটা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এবং ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ দেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন লালন করে অংশগ্রহণমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধুর গ্রামভিত্তিক সমবায় ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের বিশেষ অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর' ধারণায় গ্রামের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে গ্রামীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করে 'বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' প্রতিষ্ঠাসহ নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হবে এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' প্রকাশনাটির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(**স্বপন ভট্টাচার্য্য**, এমপি)

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাফল্য বিষয়ক প্রকাশনা 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' শীর্ষক ডকুমেন্টরি প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এ প্রকাশনা পল্লীর আনাচে, কানাচে উন্নয়নকামী মানুষের এবং দেশের সকল সমবায়ীগণের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ও দিকনির্দেশনার প্রকাশ ঘটবে।

স্বাধীনতাত্তোরকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে পল্লীর হতদরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক ও জীবন মানোন্নয়ন এবং স্কুল, কলেজ, রাস্তা-ঘাটের উন্নয়নে তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নানা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরিত বিভিন্ন নথিপত্রে এসব উদ্যোগের সাক্ষ্য বহন করে আজও। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ নির্মাণ করা। তিনি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "প্রত্যেকটি গ্রামে বহুমুখী গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে"। সমবায়ের মাধ্যমে আয়বৈষম্য হ্রাস করে তিনি একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করে এবং ২০১২ সালে আইন প্রণয়ন করে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিতে রূপান্তর করে। এ ছাড়াও এ সরকার সমবায় সমিতি আইন, ২০০১; পুনরায় সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করে। বর্তমান সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ 'আমার বাড়ী, আমার খামার' প্রকল্প গ্রহণ করে সকলের সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টায় যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বাঙালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাফল্যে সংবলিত 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' শিরোনামের প্রকাশনাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম আরো গতিশীল, সক্রিয় এবং যুগোপযোগী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(**খন্দকার মোশাররফ হোসেন,** এমপি)

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ সম্বলিত প্রকাশনা 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, কৃষি ঋণ, সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প, সমবায় ব্যাংকিং, সমবায় কৃষি, সমবায় বাজার, দুগ্ধ সমবায় ও অন্যান্য সমবায় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পল্লী উন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবন ও দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন, সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে লিয়াঁজোসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই সব কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য এ বিভাগের অধীনে সমবায় অধিদপ্তর; বিআরডিবি; মিল্ক ভিটা; পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ); ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ); বার্ড, কুমিল্লা; আরডিএ, বগুড়া; বাপার্ড, গোপালগঞ্জ; আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প; বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়বর্ধক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। এ মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল সীমিত সম্পদ দিয়ে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানো। সমবায় পদ্ধতিতে উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও বণ্টন নিশ্চিত করতে পারলে পণ্যের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি মধ্যস্বত্বভোগী না থাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই ন্যায্যমূল্যও পাবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষনমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। তিনি দরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দর্শনকে সামনে রেখে পল্লী এলাকায় প্রত্যাশিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে "বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা" পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর ও তাদের জীবনমান-উন্নয়নে প্রতিনিয়ত দিকনির্দেশনা প্রদান করে চলেছেন। সেই দিকনির্দেশনা অনুসরণপূর্বক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' শীর্ষক প্রকাশনাটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ রেজাউল আহসান)

মুখবন্ধ

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৩% গ্রামে বসবাস করে। একসময় গ্রামগুলো ছিল এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ইউনিট। সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে শহরের সংখ্যা। আধুনিক উন্নত জীবনের সুযোগ সুবিধাদির কেন্দ্র হচ্ছে শহর; অন্যদিকে গ্রামগুলো আজও রয়ে গেছে কৃষি ও কারখানার কাঁচামাল উৎপাদনের উৎস। প্রতিযোগিতায় দিনদিন গ্রামের তুলনায় শহরগুলো এগিয়ে যায়; ফলে পিছিয়ে পড়ে গ্রামের মানুষ। কিন্তু গ্রামের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে পিছিয়ে রেখে দেশের সুসম ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'সমগ্র শরীরকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্ত জমলে তাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না, তেমনি গ্রামগুলোকে বঞ্চিত করে শহরগুলোর ফুলিয়ে ফেঁপে ওঠার নামও উন্নয়ন নয়।' পিছিয়ে থাকা মানুষের মুক্তির কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বহু লেখায় এসব মানুষের পক্ষে কথা বলেছেন। মহান কবিদের এসব ভাবনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন জনদরদি রাজনৈতিক নেতৃত্বের। পরবর্তীতে তেমন নেতৃত্বের গুণাবলি নিয়ে আবির্ভাব ঘটে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। বাংলাদেশের কৃষক, জেলে, কামার-কুমার, তাঁতি, দিনমজুরসহ সকল প্রকার খেটে খাওয়া মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সারাজীবনের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বেতার টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্য অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।" একই ভাষণে তিনি প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে জন্য বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা গ্রহণ, বনসম্পদ, ফলের চাষ, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগির চাষ, দুগ্ধখামার এবং মৎস্যচাষের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এবং সুসংহত ও সুষ্ঠু বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ভাবনার অন্যতম উপজীব্য ছিল।

স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধু তাঁর পল্লী উন্নয়ন ভাবনাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের প্রয়াস পান। বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রণীত দেশের সংবিধানে ১৬নং অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চল বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনগণের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। সংবিধানের ১৩(খ)নং অনুচ্ছেদে সমবায় ব্যবস্থার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তিনি আধুনিক কৃষিব্যবস্থা এবং দেশীয় মডেলে পল্লীসমাজ গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছিলেন, যার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে কৃষির আধুনিকীকরণকে বেছে নেওয়া হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দেওয়া ভাষণে সমবায়কে গ্রামোন্নয়নের প্রধান পথ হিসেবে বেছে নেওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি ৫ বছরের পরিকল্পনায় ৬৫ হাজার গ্রামের প্রতিটিতে বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সরকারের তরফ থেকে সেসব সমিতিকে আর্থিক প্রণোদনা, ফার্টিলাইজার, টেস্ট রিলিফ এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য সহায়তা প্রদানের ঘোষণা প্রদান করা হয়। সমবায়ের মাধ্যমেই তিনি তাঁর কৃষি বিপ্লবকে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। সমবায়ের মাধ্যমে আয়বৈষম্য হ্রাস করে তিনি একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। গ্রাম পর্যায়ে সরকারের স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) কে সারাদেশে বিস্তৃত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে দেশে খাদ্যের অভাব দূর করে দ্রুত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশে পরিণত হয়েছিল।

তিনি চাষি, কামার-কুমোর, জেলে, তাঁতি, কুটিরশিল্পের শ্রমিক এসব মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথ হিসেবে সমবায়, কুটিরশিল্প এবং

গরিববান্ধব ব্যাংকিং পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। আখতার হামিদ খানের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় ব্যবস্থা, ভারতের আমুলের আদলে মিল্কভিটাকে গড়ে তোলা জাতির পিতার এসব প্রচেষ্টার মূলে ছিল তাঁর গ্রামের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ভাবনা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। তিনি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে গণমুখী সমবায় আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষত গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের কাজটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের একমাত্র দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এছাড়াও সামগ্রিক বিবেচনায় পল্লীতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে স্থানীয় সরকার বিভাগ, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য জাতিগঠনমূলক সংস্থার সম্পৃক্ততাও রয়েছে। দেশের প্রায় চার কোটি মানুষ এ উন্নয়ন প্রচেষ্টার উপকারভোগী। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ তার আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, আরডিএ বগুড়া, বার্ড, বাপার্ড প্রভৃতি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের কাজটি করে আসছে। এসব দপ্তর/সংস্থা তাদের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বাস্তবায়ন করে আসছে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প। স্বাধীনতা-উত্তরকালে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে পল্লীর হতদরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক ও জীবনমান উন্নয়ন এবং স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাটের উন্নয়নে তিনি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নানা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষরিত বিভিন্ন নথিপত্রে এসব উদ্যোগের সাক্ষ্য বহন করে আজও। দেশের দুগ্ধ চাহিদা পূরণ, দরিদ্র, ভূমিহীন, নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ১৯৭৩ সালে 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করেন। বর্তমানের মিল্কভিটা তাঁরই সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের ফসল।

জাতির পিতা সমবায়ের মাধ্যমে সমন্বিত/যৌথ খামার প্রচলন করে স্থানীয় রাজস্বে পল্লী-উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার সমবায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগসহ ব্যবসা বাণিজ্যে পুঁজি গঠনে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশের দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে নিবন্ধিত সমবায় সমিতিগুলো তাদের সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনে এ বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর, উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পিডিবিএফ, এসএফডিএফ, বাপার্ড, আরডিএ, মিল্কভিটা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সুনির্দিষ্ট ভিশন ও মিশনকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করে এবং ২০১২ সালে আইন প্রণয়ন করে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিতে রূপান্তর করে। এছাড়াও এ সরকার সমবায় সমিতি আইন, ২০০১, পুনরায় সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য ২০০০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি অনন্য উদ্যোগ একটি বাড়ি একটি খামার (বর্তমানে আমার বাড়ি আমার খামার) পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০০৯ সালে পুনরায় রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে এসে প্রকল্পটির বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রকল্পে ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মডেল দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে যা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছানোর জন্য গ্রাম ও শহরের উন্নয়নকে একসূত্রে গাঁথার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে 'আমার গ্রাম আমার শহর' প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কাজ করছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে নিঃসন্দেহে উপকৃত হচ্ছেন গ্রামের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী। এটা কেউই অস্বীকার করেন না। বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন, গ্রাম অবধি নতুন প্রযুক্তির বিস্তার লাভ, আকাশ মিডিয়ার আওতা গ্রাম পর্যন্ত সম্প্রসারণ, বিলাসজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা, গ্রামের মানুষের সনাতন পেশায় ব্যাপক পরিবর্তন, কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, এনজিওদের কার্যক্রম, ব্যাপক

নারী জাগরণ প্রভৃতি কারণে গ্রামবাংলায় নানাধরনের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে দেশের পল্লী উন্নয়ন ভাবনা ও কৌশলেও পরিবর্তন ঘটেছে।

জাতীয় অর্থনীতিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, পোশাক, দুগ্ধ উৎপাদন, আবাসন, ক্ষুদ্র ঋণ ও সঞ্চয়, কুটিরশিল্প-চামড়াজাত-মৃৎশিল্প ইত্যাদি খাতের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে বিশাল অবদান রাখছে। কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস পুরো বিশ্বে স্থবিরতা সৃষ্টি করলেও পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন দলসমূহ এ সময় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, সদস্যদের ঋণ মওকুফসহ দুর্গত সদস্যদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে। করোনায় আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে।

দেশে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সেবা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উপকারভোগী মানুষ প্রায় ৪ কোটি। দেশে সমবায়ীর সংখ্যা ১ কোটি ১৫ লক্ষ প্রায়; বিআরডিবি-এর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৬৮ লক্ষ জন। 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের উপকারভোগী মানুষের সংখ্যা প্রায় ২.৫ কোটি জন। অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার উপকারভোগী সংখ্যাও অনেক। আর্থিক প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান, বিনা সুদে অথবা নামমাত্র সুদে ঋণ প্রদান, আয়বর্ধনমূলক পেশাগত প্রশিক্ষণ দান, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে আসছে এ বিভাগ। দেশের কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন, স্বকর্মসংস্থান প্রভৃতি সেক্টরে পল্লী উন্নয়ন সমবায় বিভাগের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিভাগ কেবল গ্রামের মানুষকে সহায়তামূলক সেবাই দিচ্ছে না, একইসঙ্গে শহরের সুবিধাদি গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার কাজও করে যাচ্ছে।

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায়, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/প্রতিষ্ঠানসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বনির্ভর ও উন্নত পল্লী সৃজন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের অদম্য অভিযাত্রায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার উদার ও প্রাগ্রসর নেতৃত্বে পল্লী উন্নয়নে বহুবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ পল্লী উন্নয়নে নিজ নিজ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। এ অদম্য অভিযাত্রায় সকল অংশীজনের সহযোগিতা, অংশগ্রহণ ও উদ্যোগী ভূমিকা একান্ত প্রয়োজন।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়নে সরকারের ব্যাপক উন্নয়ন প্রয়াসের কথা, সাফল্য গাথা, সীমাবদ্ধতা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা ইত্যাদি বিষয় সংবলিত সংকলন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়। দেশের উন্নয়নচিন্তক, গবেষক, উন্নয়নকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পক্ষে দেশের পল্লী উন্নয়ন প্রয়াস ও সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ না থাকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী কার্যক্রম উদযাপন উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' শীর্ষক প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রকাশনার লেখকগণ প্রায় সবাই পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী। চলমান কোভিড-১৯ অতিমারির মধ্যেও তারা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াসের সক্রিয় অংশীদার হয়েছেন। এজন্য তারা ধন্যবাদ পাওয়ার দাবিদার। সম্পাদনা পরিষদ এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণকেও তাদের আন্তরিক কর্মতৎপরতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এ কাজে নিরন্তর দিকনির্দেশনা, উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য এমপি-এর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি তাঁদের মূল্যবান বাণী দিয়ে এ প্রকাশনার গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি করেছেন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

প্রকাশনাটি জনপ্রতিনিধি, উন্নয়নভাবুক, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, বিজ্ঞানী ও সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে লাগলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

মোঃ রেজাউল আহসান
প্রধান সম্পাদক
ও
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সম্পাদকীয়

গ্রাম বাঁচলে বাঁচবে দেশ এই আপ্তবাক্যকে শিরোধার্য মেনে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গ্রামের মানুষের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে আসছে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে। গ্রামের কৃষক শ্রমিক খেটে খাওয়া মানুষের জন্য স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গভীর ভালোবাসা ও দূরদর্শী ভাবনা সেসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখিয়ে আসছে। সেই আলোর পথে যোগ হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বাস্তবমুখী দিকনির্দেশনা। এটা দেশের সকল মানুষের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে দেশের প্রতিটি গ্রাম আজ আধুনিক জীবনের আলোয় কমবেশি উদ্ভাসিত। গ্রামের যে সকল মানুষ সম্পদহীন অথবা যাদের সম্পদ তুলনামূলকভাবে কম, তাদের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গৃহীত কল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহের ইতিবাচক প্রভাব গভীর ও প্রশংসনীয়। বিভিন্ন সময় পত্রপত্রিকায় এবং বিভাগীয় প্রতিবেদনে এসব উঠে এসেছে। তারপরও এসব কর্মসূচি ও কার্যক্রম সম্পর্কে একটি অখণ্ড প্রকাশনার আবশ্যকতা রয়েছে অনুভব করে "পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ" শিরোনামের প্রকাশনাটি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের যথার্থতা স্বতঃসিদ্ধের মতো স্বপ্রতিষ্ঠিত। অধিকন্তু সময়ের বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষকে বেছে নেওয়াটা এই প্রকাশনার গুরুত্বে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে।

যাদের লেখায় এই প্রকাশনা, দুএকজন ছাড়া কেউই পেশাদার লেখক নন। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাঁরা সকলেই। তাঁরা এসবের বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন এবং একধরনের মূল্যায়নের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। ফলে বিষয় সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ। তাঁদের লেখায় যেসব তথ্য উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর প্রায় সবই পরিসংখ্যানের ভাষায় প্রাথমিক উপাত্ত বা প্রাইমারী ডাটা। এসব লেখার সঙ্গে লেখকদের কোনো ব্যক্তিগত চাওয়া কিংবা লক্ষ্য জড়িত না থাকায় তাঁদের পক্ষে নির্মোহ থাকা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। যেহেতু এই প্রকাশনায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ লেখক পেশাদার লেখক নন, সেহেতু কোনো কোনো লেখায় শিল্পগত দুর্বলতা থাকাটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু প্রতিটি লেখায় ব্যবহৃত তথ্য উপাত্ত, ছবি, প্রমাণক ইত্যাদির শতভাগ বস্তুনিষ্ঠতার গুণে ডক্যুমেন্টস হিসেবে এ প্রকাশনার গ্রহণযোগ্যতা মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এ প্রকাশনার মূল কারিগর হচ্ছেন এর লেখকগণ। সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সম্পাদনা পরিষদের আগেই এসব লেখা সংগ্রহ ও একত্রিত করার কাজটি করেছেন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যবৃন্দ। সম্পাদনা পরিষদ এবং ওয়ার্কিং কমিটির সকল সম্মানিত সদস্য তাঁদের পরিশ্রম ও মেধা বিনিয়োগের মাধ্যমে এটিকে বাস্তবে রূপদানে ও সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলায় ভূমিকা রেখেছেন। তাদের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, উপসচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সমবায় অধিদপ্তরের উপনিবন্ধক জনাব আবুল খায়ের এবং সমবায় অধিদপ্তরের সম্পাদক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম যে শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করেছেন, তার জন্য তাঁরা বিশেষ ধন্যবাদ পেতে পারেন। তবে প্রকাশনার স্বপ্নদ্রষ্টা ও পরিকল্পক ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান। তিনি প্রধান সম্পাদক। গতানুগতিকভাবে প্রধান সম্পাদকের পদটি অনেকটাই আলংকারিক। কিন্তু তিনি সেই গতানুগতিক ভূমিকাকে অতিক্রম করে প্রথম থেকে শেষাবধি প্রকাশনার সকল পর্যায়ে ক্রিকেট ক্যাপ্টেনের মতো প্রত্যক্ষভাবে কাজের মধ্যে থেকে সক্রিয় নেতৃত্ব দিয়ে এসেছেন। সম্পাদনা পরিষদ এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে একাধিকবার সভা অনুষ্ঠান, ওয়ান টু ওয়ান ভিত্তিতে মত বিনিময়, অগ্রগতি পর্যালোচনা, পরামর্শদান এসব কিছুই করেছেন তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ধৈর্য ও অক্লান্ত উৎসাহ বিনিয়োগ করে। এতে করে আমাদের সম্পাদনা পরিষদের কাজের বেশিরভাগই হালকা ও সহজতর হয়ে গিয়েছে। এমনতর একটি প্রয়োজনীয় ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী উদ্যোগ গ্রহণ এবং সেই উদ্যোগ বাস্তবায়নে সামনে থেকে সক্রিয় নেতৃত্বদানের জন্য আমরা

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে সম্মানিত প্রধান সম্পাদক জনাব মোঃ রেজাউল আহসানকে অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানাতেই পারি। পরিশেষে যার কথা বলতে চাই তিনি হচ্ছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় প্রকাশনার মান বৃদ্ধিতে কনটেন্ট, সাইজ, ছবি নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে একাধিকবার আমাদের সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করতঃ আমাদের কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। সেইসঙ্গে আমরা অনুপ্রাণিতও বোধ করেছি। এমন বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা ও উদার পৃষ্ঠপোষকতা যেকোনো উদ্যোগকেই সফল হতে প্রণোদনা জোগাতে পারে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব তাঁদের মূল্যবান বাণী দিয়ে প্রকাশনার গুরুত্ব ও মান বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন। সম্পাদনা পরিষদ তাঁদের সকলের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ থাকতে চায়।

প্রকাশনাটির ব্যয়ভার সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সমবায় উন্নয়ন তহবিল থেকে বহনের জন্য তহবিল পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যের জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

এই প্রকাশনার প্রায় সব লেখাই লেখকদের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতালব্ধ নিজস্ব পরিশ্রম ও চিন্তার ফসল। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ এই প্রকাশনাকে বাস্তবে রূপদান প্রক্রিয়ায় কেউ প্রত্যক্ষভাবে কেউ পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারপরও সম্পাদনা পরিষদ কোনো দায় এড়াতে পারে না। আমরা প্রকাশনার প্রতিটি লেখা পড়েছি, প্রয়োজনে লেখকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি, সভায় উপস্থাপন করেছি, মতামত শুনেছি এবং এভাবে সেসবের মান ও বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিতকরণে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। আমাদের চেষ্টায় কোনো ঘাটতি ছিল না। তারপরও আমাদের মানবীয় চোখ এড়িয়ে দু'চারটি ভুল বিশেষত বানান বিভ্রাট রয়ে যেতে পারে। আমরা আমাদের সকল ব্যর্থতার জন্য সম্মানিত পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই।

এই প্রকাশনা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, চিন্তক, গবেষক, জনপ্রতিনিধি, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সমবায়ী প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের কারো না কারো কমবেশি কাজে লাগবে বলে আমাদের প্রত্যাশা ও বিশ্বাস। সেটি ঘটলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে গণ্য হবে।

আমিনুল ইসলাম
সম্পাদক
ও
প্রাক্তন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

সূচি

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উন্নয়ন ও সাফল্যের একযুগ : মোঃ রেজাউল আহসান	৩১
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম : মোঃ মিজানুর রহমান	৫৬
রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও কর্মপরিকল্পনা-প্রেক্ষিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ : মোঃ রেজাউল আহসান	৫৮
বাংলাদেশ, সমবায় এবং বঙ্গবন্ধু : মোঃ আমিনুল ইসলাম	৬৩
বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা এবং টেকসই উন্নয়ন : ড. আতিউর রহমান	৭৩
বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা এবং আমাদের দায়বদ্ধতা : মোঃ আসাদুজ্জামান	৭৬
নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : হরিদাস ঠাকুর	৮১
পল্লী উন্নয়নে সমবায় : মোঃ জিল্লুর রহমান	৮৯
সমবায় সেক্টরের উন্নয়নে শেখ হাসিনার সরকার : মুহাম্মদ গালীব খান	৯৪
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিআরডিবি : সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু	১০০
নারীর উন্নয়নে বিআরডিবি : মো. আলমগীর হোসেন আল নেওয়াজ	১০৫
পল্লী উন্নয়ন : প্রেক্ষিত এশিয়া : ফেরদৌস মামুন শিমুল	১১০
পল্লী উন্নয়নে প্রযুক্তি : সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ আরিফ আসদাক	১১৫
পল্লী উন্নয়নে শেখ হাসিনার সরকার : ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান, ফারুক জোয়ার্দ্দার, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মোঃ আসাদুজ্জামান, মনিরুল ইসলাম	১২২
বঙ্গবন্ধু ও পল্লী উন্নয়ন : মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য	১৩৩
পল্লী উন্নয়ন : একটি বহুমুখী আলোকপাত : ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা	১৪০
পল্লী উন্নয়নে প্রযুক্তি : প্রেক্ষিত বার্ড এবং আরডিএ : আবুল কালাম আজাদ, মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, ড. মোঃ আব্দুল কাদের ও নূর মোহাম্মদ	১৪৮
পল্লী উন্নয়নে নারী : সারাওয়াত রশীদ, নাছিমা আক্তার, মোছাঃ রেবেকা সুলতানা ও মৌপিয়া আবেদীন	১৫৪
বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) : মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার	১৬২
জাতির পিতা ও জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ : এ এইচ এম আবদুল্লাহ	১৭০
মিল্কভিটা : বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনার সোনালি স্মারক : অমর চান বণিক	১৭৫

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০ এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৯ প্রদান অনুষ্ঠানে 'সমবায়ের সাফল্যগাথা' গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে
মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্রেস্ট উপহার প্রদান
করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মাননীয় মন্ত্রী জনাব
মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি এবং প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের
উন্নয়ন ও সাফল্যের একযুগ

মোঃ রেজাউল আহসান

পরিচিতি

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, সমবায় সমিতি গঠন ও পরিচালন, সমবায় বিপণন, বিমা ও ব্যাংকিংকে উৎসাহ দান, পল্লী অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত এবং স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনার আলোকে সরকারের অনুসৃত নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে এ বিভাগ পল্লীর জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লী উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয় ভি-এইড (গ্রামীণ কৃষি এবং শিল্প উন্নয়ন) কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে। ভি-এইড কর্মসূচিসহ পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৯৫৯ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণাকে সংযুক্ত করা হয়। একাডেমি পল্লী উন্নয়নের মডেল হিসেবে

কুমিল্লা মডেল উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, যা দেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। কুমিল্লা মডেলের প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে : দ্বি-স্তর সমবায়, পল্লী পূর্ত কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং থানা সেচ কর্মসূচি। কুমিল্লা মডেলের এসব উপাদান থেকে জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে : দ্বি-স্তর সমবায় থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি); পল্লী পূর্ত কর্মসূচি থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি); থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) থেকে উপজেলা কমপ্লেক্স এবং থানা সেচ কর্মসূচি (টিআইপি)-র অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। ইতোমধ্যে বার্ড কর্তৃক পরীক্ষিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প (এসএফডিপি)-কে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এবং সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচিকে জাতীয় কর্মসূচিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ঋণ, প্রশিক্ষণ ও উপকরণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে আসছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। রূপকল্প-২০২১ এবং রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প' এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)-এর অবদান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) একদিকে যেমন মানবসম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে পল্লীর জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার হালনাগাদ চিত্র তুলে ধরাসহ পল্লী উন্নয়নের নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে নিয়োজিত রয়েছে। এ বিভাগের আওতায় রয়েছে সবচেয়ে পুরোনো প্রতিষ্ঠান সমবায় অধিদপ্তর।

রূপকল্প (Vision)

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

পল্লী উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং অব্যাহত গবেষণার মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলি

১. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচি/প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. পল্লী উন্নয়নভিত্তিক নীতিমালা, সমবায় আইন ও বিধি এবং তৎসংশ্লিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন;
৩. ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, সমবায়ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, সমবায় ব্যাংকিং, সমবায়ী কৃষি খামার সৃষ্টি ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দুগ্ধ ও অন্যান্য সমবায়ভিত্তিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
৪. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়ভিত্তিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, পল্লী উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তৈরি, সম্প্রসারণ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ;
৫. পল্লী উন্নয়নভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং এই সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়সাধন;
৬. প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন কৌশল ও মডেল উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ;
৭. সমবায়ভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন; এবং
৮. পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য

এমটিবিএফ-এর কাঠামো অনুযায়ী এ বিভাগের মোট তিনটি কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলো হচ্ছে :

১. পল্লী এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়ন নিশ্চিতকরণ,
২. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি,
৩. পল্লী উন্নয়নে যুগোপযোগী কৌশল উদ্ভাবন ও বিস্তৃতকরণ।

বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় একটি প্রাচীনতম ব্যবস্থা। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ফ্যামিন কমিশন প্রতিবেদনে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সহজ শর্তে কৃষিঋণ চালুর সুপারিশ করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার ১৯০৪ সালে বহুমুখী সমবায় আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষিঋণ সমবায় সমিতি চালু করে। এর মাধ্যমে এদেশে সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সমবায় আইন পাস হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় বাংলাদেশে প্রায় ৩২,০০০টি প্রাথমিক সমিতি ছিল যার অধিকাংশই ছিল কৃষি সমবায় সমিতি। ষাটের দশকে কুমিল্লায় বার্ড কর্তৃক দ্বি-স্তর সমবায় প্রবর্তনের মাধ্যমে এক নতুন আঙ্গিকের সমবায়ের গোড়াপত্তন হয়। কুমিল্লার দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির নজির স্থাপিত হওয়ায় সরকার এ মডেল সম্প্রসারণে উৎসাহিত হয়। সত্তরের দশকে আইআরডিপি এবং আশির দশকে বিআরডিবি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ মডেল দ্রুততার সাথে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের

বাজেট

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলোর বাজেট বরাদ্দ (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) এক নজরে বিগত পাঁচ বছরের বাজেট উপস্থাপন করা হলো :

লক্ষ টাকা

২০১৬-২০১৭		২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০		২০২০-২০২১	
পরিচালন	উন্নয়ন	পরিচালন	উন্নয়ন	পরিচালন	উন্নয়ন	পরিচালন	উন্নয়ন	পরিচালন	উন্নয়ন
৪৬,৫৫৯	১,১৫,৭৫৭	৪৮,১১৩	১,৭১,৫২৮	৫২,১২৯	১,৭৪,৫২৮	৫৯,২০৯	১,৬৩,৭১৬	৬০,৫৩৮	১,৬৩,১৯০

সংবিধানে সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন

বিশ্বব্যাংকের তথ্য মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে শতকরা প্রায় ৬৩% মানুষ পল্লী অঞ্চলে বাস করে এবং এ দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের অবস্থান পল্লী অঞ্চলে। ফলে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের জীবিকায়ন পল্লীর ওপর নির্ভরশীল। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এবং একটি বাড়ি একটি খামার (বর্তমানে আমার বাড়ি আমার খামার) প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

কর্মসংস্থান ও জনগণের পুষ্টির চাহিদা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই কৃষকের ভাগ্যের উন্নয়ন, খামারিদের দুধের ন্যায্যমূল্য প্রদান এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণির মাঝে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্রের মাধ্যমে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (এফএও) এবং ইউএনডিপি'র প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ১৩.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে "সমবায় দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্প" নামে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রাথমিকভাবে ৫টি এলাকায় যথা- ঢাকা, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, টেকেরহাট ও বাঘাবাড়িঘাটে মিল্কভিটার কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর ৮টি বিভাগের ৪২টি জেলায় ৫১টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, ৩টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে ৩,০৮৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতির এবং ৬৯টি কেন্দ্রীয় সমিতির ১,৩২,৬০৮ জন সদস্যর মাধ্যমে প্রতিদিন দুগ্ধ সংগ্রহ করে একটি সর্ববৃহৎ সমবায় দুগ্ধ শিল্প গড়ে উঠেছে। মিল্ক ইউনিয়নের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৮.০৫ লক্ষ সুবিধাভোগী সম্পৃক্ত রয়েছে।

মিল্কভিটায় দুধ বাজারজাত করায় সমবায়ীগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত মূল্য পেয়ে থাকেন। এতে কৃষকগণের আর্থিক সচ্ছলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি মিল্কভিটার উৎপাদিত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত উন্নতমানের পণ্য দেশের মানুষের প্রাণিজ পুষ্টি চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা; পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বগুড়া; বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ প্রধান তিনটি কাজ হলো: প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা।

নিম্নে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো :

সমবায় অধিদপ্তর

এ উপমহাদেশে ১৯০৪ সালে কৃষিঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম সমবায়ের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও সমবায় মন্ত্রী হিসেবে সে সময়ে সমবায় সমিতিগুলোকে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন। স্বাধীনতা-উত্তরকালে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায়কে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। জাতির পিতার যোগ্য উত্তরসূরি জননেত্রী শেখ হাসিনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় সমবায় খাতে বিপুল সফলতা অর্জিত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জীবনমান ও সামাজিক উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০০৯ হতে জুন ২০২০ সময়কালে সমবায় অধিদপ্তরের অর্জিত সাফল্যের তথ্যাদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

নাম	২০০৯-২০১০	২০১৯-২০২০
সমিতির সংখ্যা	১,৬৯,৩০৫টি	১,৯২,০২০ টি
সদস্য সংখ্যা	৮৬,৭৪,১০১ জন	১,১৫,০৯,৮২৫ জন
পরিশোধিত শেয়ার মূলধন	৫৯১.৮৬ কোটি টাকা	১,৭৯৩.৪৯ কোটি টাকা
সঞ্চয় আমানত	৩,৬৫৫.৭৪ কোটি টাকা	৮,৫৯৪.৩২ কোটি টাকা
মোট কার্যকরী মূলধন	৬,৬৯২.১৬ কোটি টাকা	১৪,৪৯২.১৪ কোটি টাকা
মোট সম্পদ	২,৪৭৬.২৩ কোটি টাকা	৫,৯৮৩.২৫ কোটি টাকা

আইন সংশোধন

সমবায় সেক্টরে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা নিরসন, সমবায়কে অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে সরকার সমবায় আইন সংশোধন করে। এ আইন সংশোধনের ফলে সমবায় অধিদপ্তর সমবায় সেক্টরে আর্থিক অনিয়ম রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে সমবায় অঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

নিবন্ধন নীতিমালা সহজীকরণ

বর্তমান সরকারের গৃহীত নীতিমালার ফলে সমবায় নিবন্ধীকরণে আলোচ্য সময়ে মানসম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি গঠিত হয়। এ সময়ে উৎপাদনমুখী সমবায় নিবন্ধনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর ফলে সমবায় সমিতির মাধ্যমে আর্থিক খাতে বিভিন্ন সূচকে লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধিত হয়।

সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন শ্রেণির সমবায় সমিতি

বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধনকৃত ৩৫ প্রকারের সমবায় সমিতি কার্যকর রয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম

প্রশিক্ষণ প্রদান

সমবায় অধিদপ্তরের মুখ্য কাজ হচ্ছে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তৃণমূলে জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসা। বিগত সময়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি কুমিল্লা এবং এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধনমূলক (IGA) বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৯ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৮৭,১৪২ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও

ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় সমবায় সমিতির সুবিধাভোগী সদস্যদের মধ্যে গাভী ঋণের চেক বিতরণ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি।

সমবায়ীদের গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ দল কর্তৃক সমবায় সমিতিতে গিয়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদি পশুপালন, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০০৯ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট এর মাধ্যমে ৭,১৮,২০৮ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গৃহীত নীতি ও কৌশলসমূহ

লিঙ্গ অনুকূল (Gender Based) বাজেট কাঠামো প্রবর্তন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের নারী উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের বাজেট কাঠামোতে পরিবর্তন এনে নারীবান্ধব করা হয়েছে। ১০,০০০ সুবিধাবঞ্চিত মহিলাকে উন্নত জাতের গাভী পালন ও দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য ১,২০,০০০ টাকা হারে বিনা সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গাভী পালনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমিতির পুঁজি প্রবাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সৃষ্ট মোট কর্মসংস্থান ৯,২৫,৬৯৯ জন (প্রত্যক্ষ ৬৭,৩২১ জন, পরোক্ষ ৮,৫৮,৩৭৮ জন)। মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ সরকারের সময়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড। এছাড়াও সমবায় অধিদপ্তরের ১১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসিক কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্ক, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক ও বাটিকের কাজ, ক্রিস্টালের কাজ, সেলাই, মৌ-চাষ, মাশরুম চাষ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান হয়ে থাকে।

সমবায় অধিদপ্তরের প্রকল্প/কর্মসূচি

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠীর হতদরিদ্র মানুষকে সমবায় সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব প্রকল্প/কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে :

১. সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি;
২. সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)/ Comprehensive Village Development Programme (CVDP);
৩. Family Welfare and Income Generation Activities Through the Rural Cooperatives;
৪. গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রকল্প;
৫. সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প;
৬. বৃহত্তর ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্প;
৭. উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প;
৮. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প;

এসব প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বিআরডিবি'র উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক) এর ২০তম ব্যাচের ৬০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লীর জনগণ ও জনপদের বহুমাত্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করেন যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদার ও প্রাগ্রসর নেতৃত্বে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিআরডিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, BIDS এর ২০১০ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে প্রণীত আইন ও বিধি, গৃহীত নীতি-কৌশল, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ :

প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন : আইন ও বিধি এবং গৃহীত নীতি-কৌশল

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন প্রণয়ন : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৮২ রহিতক্রমে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গত ৭ মার্চ, ২০১৮ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ প্রণয়নপূর্বক গেজেট প্রকাশিত হয়। এর ফলে বিআরডিবি'র কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবিকায়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত সেবার আওতা সম্প্রসারিত এবং মান উন্নত হয়েছে।

এ সময় সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নের স্বার্থে বিআরডিবি প্রণীত বিভিন্ন নীতিমালা/ কৌশলপত্র হল :

(ক) জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক নীতিমালা;
(খ) আবর্তক ঋণ তহবিল ব্যবহার নীতিমালা;
(গ) বিআরডিবি'র কৌশলগত নীতিপত্র;
(ঘ) বিআরডিবি'র আওতাধীন উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির (ইউসিসিএ) লিঃসমূহের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা;
(ঙ) বিআরডিবি'র আওতাধীন ইউসিসিএ লিঃ এর কর্মচারীদের মডেল চাকুরি প্রবিধানমালা/২০১৮।

আত্মনির্ভরশীল সমৃদ্ধ পল্লী বিনির্মাণে বিআরডিবি'র প্রধান কার্যক্রম ও অর্জন :

পল্লী মানব সংগঠন সৃষ্টি

বিআরডিবি সূচনালগ্ন থেকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের 'দ্বি-স্তর' সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সরবরাহ, নেতৃত্বের বিকাশ, সক্ষমতা উন্নয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক শ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন

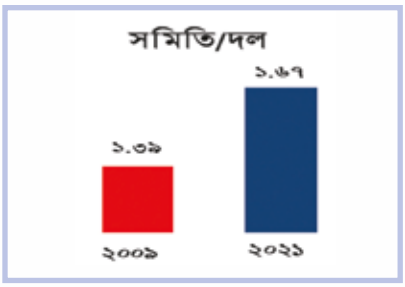

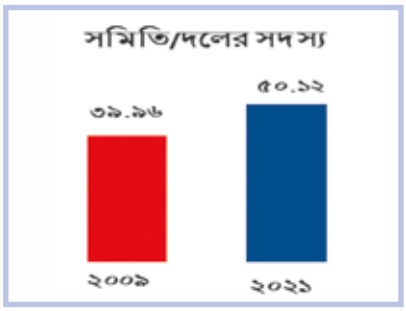

করে আসছে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি বিআরডিবি সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন দল গঠনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম শুরু করে। বিআরডিবি'র আওতায় ২০০৯-'১০ থেকে মে, ২০২১ পর্যন্ত বারো বছরে মোট ২৭,৫১০টি সংগঠন সৃষ্টি করে ১০.১৬ লক্ষ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত সদস্য সংখ্যা ৫০.১২ লক্ষ।

মূলধন গঠন

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মূলধন গঠনে উৎসাহিত করা বিআরডিবি'র একটি অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সদস্যদের মূলধন গঠনের মাধ্যমে বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করার জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়মিত শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়াও সমবায় সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টির লক্ষ্যে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমায় উৎসাহিত করা হয়। বিআরডিবি'র আওতায় ২০০৯-'১০ থেকে মে, ২০২১ পর্যন্ত সদস্যদের শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৯৯.৫৭ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় জমার পরিমাণ ৩১৫.৭২ কোটি টাকা, ১২ বছরে মোট মূলধনের পরিমাণ ৪১৫.২৯ কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জিত মূলধনের পরিমাণ ৭০৩.০৩ কোটি টাকা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

টেকসই ও সুসম উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিআরডিবি পল্লীর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি'র নিজস্ব ৩টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ২৩টি ইউটিইউ এবং উপজেলা পল্লী ভবনের সাথে প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। বিআরডিবি'র আওতায় ২০০৯-'১০ থেকে মে, ২০২১ পর্যন্ত ৫৬,০৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে এবং ৫০,২৯,১১২ জন সুফলভোগীকে দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা

ক) ঋণ সহায়তা

সত্তরের দশকে জামানতের অভাবে যখন পল্লীর প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না তখন আইআরডিপি'র আওতায় দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে তদারকি ঋণ সুবিধা চালু হয়। পরবর্তীতে যা আরও পরিমার্জিত হয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ' নামে পরিচিতি লাভ করে। ২০০৯-'১০ থেকে মে, ২০২১ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সুফলভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ১২,৬৭১.১৭ (বারো হাজার ছয়শত একাত্তর কোটি সতেরো লক্ষ) কোটি টাকা এবং একই সময়ে আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ ১১,৬৮৪.৬১ (এগারো হাজার ছয়শত চুরাশি কোটি একষট্টি লক্ষ) কোটি টাকা। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৭%।

খ) সম্পদ ও উপকরণ সহায়তা

প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা হিসেবে বিআরডিবি কর্তৃক বিতরণকৃত কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, সেচযন্ত্র ইত্যাদি পল্লীর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও অকৃষি খাতে সম্পদ সহায়তা হিসেবে সেলাই মেশিন, মোবাইল সার্ভিসিং টুলবক্স, সেচযন্ত্র মেরামতের টুলবক্স, ইলেক্ট্রিশিয়ান টুলবক্স ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে যা সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ২০০৯-'১০ থেকে মে, ২০২১ পর্যন্ত বিআরডিবি কর্তৃক সুফলভোগীদের মাঝে ১৪৭০.৮০ লক্ষ টাকার কৃষি/অকৃষি উপকরণ/সম্পদ বিতরণ করা হয়েছে।

গ) লিংকেজ সহায়তা

বিআরডিবি উপকারেভোগী সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান নিশ্চিতকরণ, সংরক্ষণ, উৎপাদকের ও ভোক্তার ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির জন্য বিপণন সংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পণ্য সংরক্ষণের জন্য বিআরডিবি'র বিভিন্ন অবলুপ্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১৬৮টি গুদামঘর রয়েছে। গুদামগুলো কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও কারুপল্লী, কারুগৃহ, পল্লী বাজার, উদকনিক সেলস সেন্টার নামে ৪টি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে।

সেচ কার্যক্রম

দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিআরডিবি তৎকালীন সর্বাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি চাষাবাদ পদ্ধতি প্রচলনের জন্য কৃষকদের সংগঠিত করে দেশের বিপুল পরিমাণ এলাকা চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসে। সেচ প্রকল্পসমূহ কর্মসংস্থান ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের আমূল পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮,৩৬০টি গভীর নলকূপ ৪৪,৫২৩টি অগভীর নলকূপ, ১৯,৪০৫টি শক্তি চালিত পাম্প, ২,৭৩,০০০ হস্ত চালিত নলকূপ মোট ৩,৫৫,২৮৮টি সেচ যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। বিবেচ্য সময়ে ৩৩৪টি গভীর নলকূপ মেরামতসহ সেচযন্ত্র মেরামতের টুলবক্স সরবরাহ করা হয়েছে। খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে বিআরডিবি'র সেচ কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

লিংক মডেল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন

স্থানীয় চাহিদার আলোকে পল্লীবাসীদের অংশগ্রহণে উর্ধ্বমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদালোকে সেবা সম্প্রসারণে 'লিংক মডেল' একটি অনন্য মডেল হিসেবে পরিগণিত। সরকারি সেবা প্রদান ও উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বিত আকারে চাহিদা ও পরিকল্পনার আলোকে বাস্তবায়িত হয়। গ্রাম কমিটি হতে চাহিদা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগে যায় এবং এভাবে সেবা সম্প্রসারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি দ্বৈততা বা বাদপড়া এড়ানো সম্ভব হয়। লিংক মডেলের প্রণোদনা হিসেবে পল্লী এলাকায় সরকার, ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগণের অংশীদারিত্বে (যথাক্রমে ৮০%, ৫% ও ১৫%) পল্লী ক্ষুদ্র স্কীম বাস্তবায়ন করা হয়।

পল্লী ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন

বিআরডিবি কর্তৃক ২০০৯-'১০ থেকে মে, ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৩,৯৮৪টি ক্ষুদ্র স্কীম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে রাস্তায় ইটের সলিং, গাইডওয়াল নির্মাণ, কাঠের সাঁকো নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ, গ্রামের সংযোগ রাস্তা নির্মাণ, টিউবওয়েল স্থাপন, শৌচাগার নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সামাজিক সংগঠনে আসবাবপত্র সরবরাহ উল্লেখযোগ্য।

সাম্প্রতিককালে বিআরডিবি কর্তৃক গৃহীত বিশেষ কার্যক্রম

ক) বিআরডিবি'র ক্রাশ প্রোগ্রাম

বিআরডিবি'র ক্রাশ প্রোগ্রাম ২০২০-'২১ এর আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সার্বিক কার্যক্রমের নিবিড় মনিটরিং, খেলাপি ঋণ হ্রাসে বিশেষ তদারকি, সকল রেকর্ডস হালনাগাদকরণ এবং নিরীক্ষা ও পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ) এসএমই ঋণ

নভেল করোনা ভাইরাস (Covid- 19) বৈশ্বিক মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে সরকার কর্তৃক আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে ১৫০ কোটি টাকা করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সুফলভোগীদের উদ্যোক্তা ঋণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ) ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জীবনযাত্রার সহায়ক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি বিআরডিবি, কালিয়াকৈর গাজীপুরের উপকারভোগীদের মাঝে ঋণ ও গাছের চারা বিতরণ করেন।

ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জীবিকায়ন সহায়ক ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২৭ জানুয়ারি, ২০২১ হতে শুরু হয়েছে। হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি পশুপালন, মৎস্য চাষ, কৃষিকাজ, বাঁশ, বেত ও কুটিরশিল্প, সেলাই ও সুচি শিল্পকর্মের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০২১ হতে মে, ২০২১ পর্যন্ত ৭৫ ব্যাচে মোট ৩,১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) করোনা সংকট মোকাবেলায় কর্মচারীদের আর্থিক প্রণোদনা

সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক মহামারি প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে বিআরডিবি'র চলমান কার্যক্রম রাখার স্বার্থে বিআরডিবি'র অনুকূলে ২০১৯-'২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এককালীন ১৫ কোটি টাকা প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এর ফলে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বিআরডিবি'র কর্মীরা করোনাকালীন সংকট কাটিয়ে কাজে মনোনিবেশ করেছেন। এর ফলে মাঠ পর্যায়ে কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভাসানচরে স্থানান্তরিত বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জীবনযাত্রা সহায়ক ও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ আমার বাড়ি আমার খামার (পূর্ব নাম একটি বাড়ি একটি খামার) প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিল জুলাই, ২০০৯ মাসে। দীর্ঘ এক যুগ পরে এটি আগামী ৩০ জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। এর বহু পূর্বে ২০০০ সালে দেশের পল্লী এলাকার প্রতিটি বাড়িকে উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলতে পাইলটিং আকারে শুরু হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন হলো পল্লী এলাকার প্রতিটি বাড়িকে উৎপাদনমুখী খামারে পরিণত করতে হবে। তাঁর অভিপ্রায় বাস্তবায়নে দেশের ৪৮২টি উপজেলার প্রতিটিতে ২০টি গ্রাম সংগঠন তৈরি করে ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। প্রতিটি বাড়িকে খামারে পরিণত করে কৃষিজ উৎপাদনের এক একটি ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। সময়ের পরিসরে প্রকল্পটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে এখন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রাম সংগঠনের আওতায় প্রায় ৫৭ লক্ষ দরিদ্র পরিবার এখন এ প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে।

২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তাঁর যুগান্তসৃষ্টিকারী ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন প্রদান করেন। এ দর্শন ধারণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশলে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। দরিদ্র মানুষকে সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহিত করতে সরকার হতে সমপরিমাণ উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদান প্রদান করে প্রতিটি গ্রাম সংগঠনের জন্য স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন দরিদ্র মানুষের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। তাই প্রকল্প মেয়াদ ও পরিসর বারবার বৃদ্ধি করতে হয়েছে। দরিদ্র সদস্যগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে এ পর্যন্ত সঞ্চয় করেছেন ২ হাজার কোটি টাকার বেশি। সরকারি অনুদান সহায়তায় এখন প্রতিটি গ্রাম সংগঠনের জন্য ৭ থেকে ৯ লক্ষ টাকার স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। সর্বমোট ৭ হাজার ৮ শত কোটি টাকার তহবিল সৃষ্টি হয়েছে, যা দরিদ্র সদস্যগণ স্থায়ীভাবে নিজ বাড়িতে খামার স্থাপনে ব্যবহার করছেন। সদস্যরা উঠান বৈঠকে বসে নিজেরা সমিতির তহবিল হতে ঋণ গ্রহণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র অর্থায়নে একটি বিকল্প মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এ মডেল এখন দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা পাচ্ছে। আফ্রিকার দেশ কঙ্গো প্রজাতন্ত্র এ মডেল সে দেশে বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজ

এ প্রকল্পের অন্যতম সফলতা হলো এর অনলাইন ডাটাবেজ। ১.২০ লক্ষ গ্রাম সংগঠনের প্রায় ৫৭ লক্ষ সদস্যের সকল তথ্য এ অনলাইন ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলে গ্রাম সংগঠনের জন্য তহবিল গঠন, এ তহবিল হতে বিনিয়োগ, অর্থ লেনদেন ইত্যাদি সকল সংক্রান্ত তথ্যাদি এ ডাটাবেজে সংরক্ষিত হচ্ছে। সরকারের এরূপ প্রকল্পে এ ধরনের অনলাইন ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ এ প্রকল্পেই প্রথম শুরু হয়েছে। দেশের যে কোন ব্যক্তি এ ডাটাবেজ হতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এটি অর্থ লেনদেনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

গ্রাম সংগঠনের স্থায়ী তহবিল

প্রকল্পের অন্যতম বিশেষত্ব হলো গ্রাম সংগঠনের জন্য স্থায়ী তহবিল গঠন। যা দেশে প্রথমবারের মতো এ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন অনুসরণে দরিদ্র সদস্যদের অংশগ্রহণে সরকারি সহায়তায় স্থায়ী তহবিল তৈরি হয়েছে যা সংগঠনের সদস্যগণ স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

হস্তশিল্পের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার বড় বাড়ি আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্যরা।

জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত মেলায় আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

অনলাইন এজেন্ট ব্যাংকিং ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ সদস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা, উহার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণ, গ্রাম সংগঠনসমূহকে ঘূর্ণায়মান তহবিল বিতরণ, গড়ে ওঠা তহবিল হতে ঋণ প্রদান ও ঋণের কিস্তি জমা ইত্যাদি আর্থিক কর্মকাণ্ড প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়্যার ও ৩টি বেসরকারি ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারের সাথে ইন্টারফেসিং করে ২০১২ সালে একটি বিশেষ ব্যাংকিং সেবার উদ্ভাবন করা হয় এ প্রকল্পে। যা পরবর্তীতে দেশে এজেন্ট ব্যাংকিং হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এ বিশেষ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব

সরকারের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিচালিত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় দেখা যায় প্রকল্পে যোগদানের পরে সদস্যদের আয় গড়ে ৫১.৫৭% বৃদ্ধি পেয়েছে, ৯০.৮০% সদস্যের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব হলো উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, পারিবারিক দারিদ্র্য হ্রাস এবং বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

প্রকল্পের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ তথা টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। দেশে এই প্রথমবারের মতো কোনো প্রকল্প ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ব্যাংকের ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার এবং বাকি ৪৯% শেয়ারের মালিক আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের গ্রাম সংগঠনগুলো। অর্থাৎ এটি দরিদ্র মানুষের মালিকানার প্রথম ব্যাংক। প্রকল্পের কাজকে ব্যাংক আরো সামনে নিয়ে যাবে। দরিদ্র সদস্যদের সুবিধাজনক আর্থিক সেবা প্রদান করে আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ অব্যাহত থাকবে ব্যাংকের মাধ্যমে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর প্রধান তিনটি কাজ হলো: প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা। বার্ডের মাধ্যমে এ দেশে ১৯৫৯ সাল থেকে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে বিপুল প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ সৃজিত হয়েছে। বার্ড-এর উদ্ভাবনসমূহের ফসল স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বিএডিসি'র সাথে একীভূত থানা সেচ কর্মসূচি, উপজেলা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু উপজেলা কমপ্লেক্স, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) ও সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) এ দেশের পল্লী উন্নয়নে বিপুল অবদান রেখে চলেছে। উন্নয়নের অনুকূল সরকারের নীতি, কৌশল ও সহায়তার ফলে ২০০৯-'২০ সময়ে বার্ড-এর পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান হয়েছে ও বাংলাদেশের হতদরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে দৃশ্যযোগ্য অবদান রেখেছে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন

বিগত ২০০৯-'১০ থেকে ২০১৯-'২০ পর্যন্ত সময়ে প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা এবং কোর্সে অংশ নেওয়া অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বিবেচনায় বার্ডের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নিম্নে এ সংক্রান্ত তথ্য গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

উল্লেখ্য যে, ২০০৯-'১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ পর্যন্ত সময়ে নারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা মোট অংশগ্রহণকারীদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এবং ২০১৮-'১৯ থেকে অদ্যাবধি প্রায় অর্ধেক ছিল।

প্রশিক্ষণের প্রভাব

প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের প্রশিক্ষণ সুবিধাভোগীদের আত্মকর্মসংস্থান, আয় এবং মূলধন/পুঁজি গঠন ইত্যাদি বিষয়ে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

গবেষণা কার্যক্রম

বার্ড তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যার ওপর গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও বিভিন্ন নির্দেশনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ড ২০০৯ হতে ২০২০ পর্যন্ত পল্লীর বিভিন্ন সমস্যা ও কৃষি উন্নয়নের ওপর ১০৩টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। বার্ডের ২০০৯-২০২০ সময়ের গবেষণা পরিচালনার গ্রাফ পাশের চিত্রে দেখানো হলো।

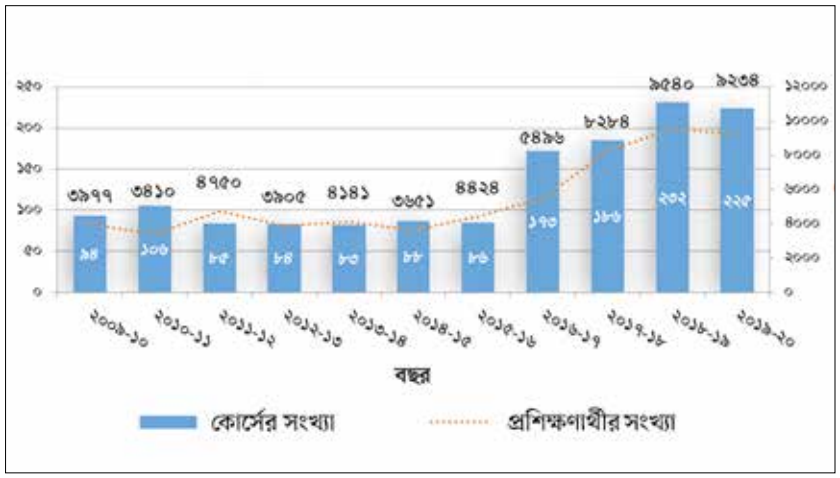

চিত্র : ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৯-২০২০ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

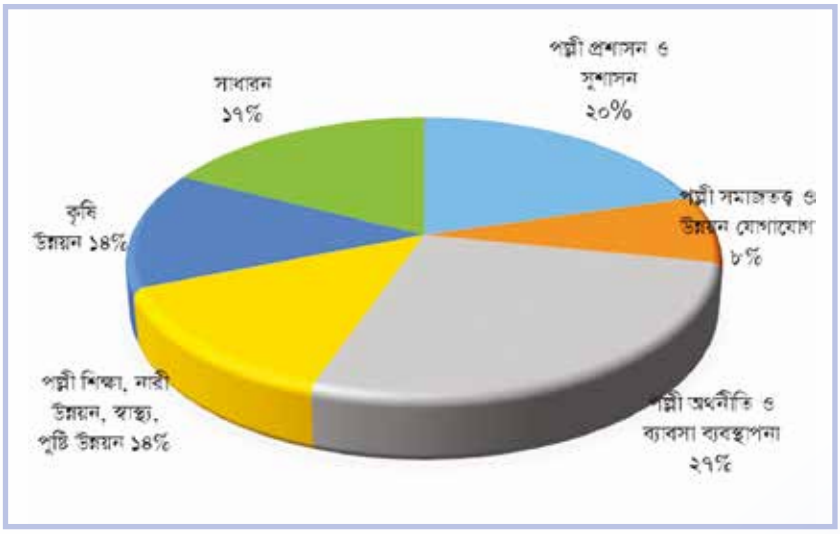

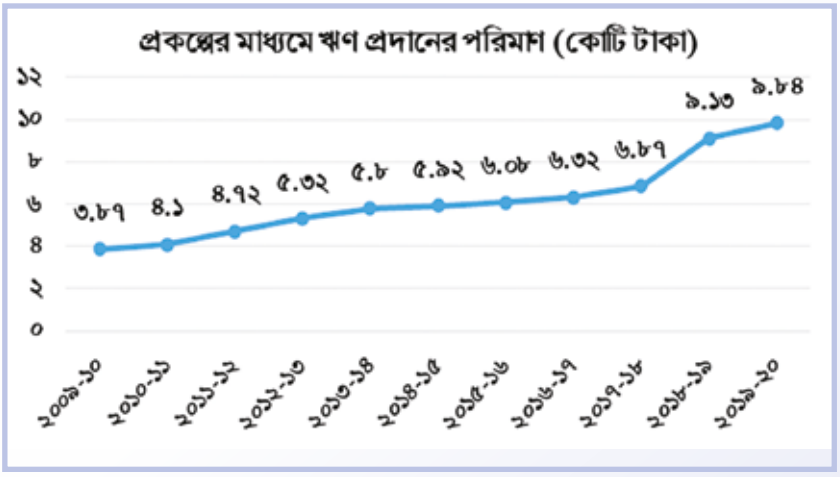

চিত্র : ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত সমবায় সংগঠনের ঋণ

২০০৯ হতে ২০২০ পর্যন্ত পরিচালিত গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং অনেকগুলো গবেষণা দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- Impact of Vulnerable Group Development Activities in Bangladesh শীর্ষক গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সরকার ইতোমধ্যেই ভিজিডি সুফলভোগীগণকে ৩০ কেজি গম/চালের প্যাকেট প্রদান শুরু করেছে। পূর্বের বিতরণ ব্যবস্থায় অস্বচ্ছতা ও অব্যবস্থাপনা এই নতুন উদ্যোগের ফলে দূরীভূত হয়েছে।
- Impact of Maternity Allowance Programme on Poor Lactating Mothers of Bangladesh শীর্ষক গবেষণার সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে সরকার মাতৃত্ব ভাতা বৃদ্ধি করেছে।
- একাডেমির ২টি গবেষণার ওপর ভিত্তি করে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার বৃহৎ পরিসরে দেশব্যাপী উপজেলা পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাগণকে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- বার্ড পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা মোতাবেক আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের গবেষণার সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ৩০-৬০ করা হয়েছে। তাছাড়া, মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করার লক্ষ্যে মাঠ কর্মী নিয়োগের ওপর এই গবেষণায় জোর দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে মাঠ কর্মী নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বার্ডের সম্পন্নকৃত গবেষণা প্রতিবেদন দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বার্ড ম্যান্ডেট অনুযায়ী প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে এবং প্রায়োগিক গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ পলিসি সহায়তা প্রদান করছে। প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিতরণের ফলে বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) এবং বাংলাদেশে প্রথম জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণের মডেল হিসেবে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বর্তমানে দেশব্যাপী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ঋণ বিতরণ, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে (২০০৯-২০২১) বার্ড সরকারি ও উন্নয়ন/গবেষণা সহযোগী সংস্থার সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ২৮টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে, বর্তমানে ৩টি প্রকল্প এবং ১৪টি প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে মে ২০২১ পর্যন্ত গ্রামের জনগণের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও পল্লী উন্নয়নের জন্য সর্বমোট ৬৭.৯৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৬৬,৩২৬ জনের (নারী ৪৩,১১৭ জন ও পুরুষ ২৩,২০৯ জন) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এই কর্মসংস্থানের ফলে ৩,৩২,৯৫৮ জন দারিদ্র্য সীমার ওপর উঠে এসেছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা

বার্ড কমিউনিটিভিত্তিক এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে বৃহদাকার জমিতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজের মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে 'কৃষি

'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, সাথে ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) ভৌত সুবিধাদি প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির (বার্ড) ভৌত সুবিধাদি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করেন।

যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি সফল প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্প এলাকার ৪২ একর ফসলি জমির মালিকদের সমন্বয়ে একটি সমাজভিত্তিক (কমিউনিটি বেজড) এন্টারপ্রাইজ গঠন করা হয়েছে যাতে ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। ৬৮ জন জমির মালিকের মোট ১৪১টি খণ্ড খণ্ড প্লট ডিজিটাল ভূমি জরিপের মাধ্যমে আইল উঠিয়ে দিয়ে বৃহদাকার ৮টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। উক্ত জমিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বোরো মৌসুমে একই জাতের ধান (ব্রি ধান-৭৪) রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টারের মাধ্যমে রোপণ করে চাষ করা হয়েছে। কমিউনিটিভিত্তিক যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে এক একর জমিতে প্রতি মণ ধান উৎপাদনে খরচ ৪৮৭ টাকা যা প্রচলিত শ্রমিকনির্ভর চাষাবাদের (৭১৭ টাকা) তুলনায় মণ প্রতি ২৩০ টাকা কম। কমিউনিটিভিত্তিক যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে একর প্রতি ধান উৎপাদন হয়েছে ৬০ মন, যা প্রচলিত শ্রমিকনির্ভর পদ্ধতিতে একর প্রতি (৫৪ মন) ধান উৎপাদনের চেয়ে ৬ মন বেশি। যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে একর প্রতি নিট লাভ হয়েছে ৩৪,৭০৫ টাকা, যা প্রচলিত শ্রমিকনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতির নিট লাভের (১৯,০৩৮ টাকা) চেয়ে ১৫,৬৬৭ টাকা বেশি। যন্ত্রনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে BCR ২.১৯ এবং প্রচলিত শ্রমিকনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিতে BCR ১.৪৮। এর ফলে বাণিজ্যিক কৃষি ব্যবস্থার সূচনা হয়েছে এবং যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং কৃষকদের নেতৃত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া কর্তৃক আয়োজিত 'আমার গ্রাম-আমার শহর' বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিববৃন্দ।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

স্বাধীনতা-উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত উত্তরাঞ্চলে বিধ্বস্ত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা স্বাধীন বাংলার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ১৯ জুন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া প্রতিষ্ঠা করেন। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া ১৯৯০ আইন দ্বারা একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাঠামোবদ্ধ হয়। একাডেমির মূল দায়িত্ব হচ্ছে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা। স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি যেমন- সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটি বায়োগ্যাস, পানি সাশ্রয়ী চাষাবাদ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা মডেল, পল্লী জৈবসার, ট্রাইকো কম্পোস্ট, দারিদ্র্যবান্ধব বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন মডেল, গ্রামে শহরের সুবিধা সম্প্রসারণে "পল্লী জনপদ প্রকল্প" ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকারের আমলে (জানুয়ারি ২০০৯ হতে মে ২০২১ পর্যন্ত) আরডিএ, বগুড়া'র উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশিক্ষণ

বর্তমান সরকারের আমলে (জানুয়ারি ২০০৯ হতে মে ২০২১ পর্যন্ত) একাডেমি কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট ৪,০৯,৩৫৯ জনকে (প্রায় ৩২ শতাংশ নারী) বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরসহ তাদের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানের

প্রধান প্রধান প্রশিক্ষণের শ্রেণিভিত্তিক চিত্র

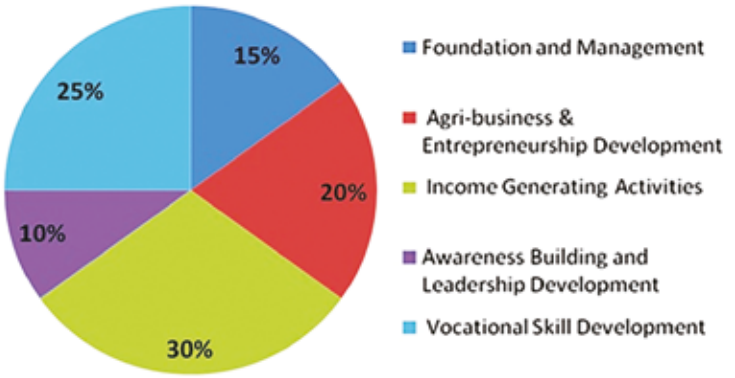

আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক বগুড়ার শেরপুরে ধান কাটা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, বগুড়া-৫ আসনের মাননীয় সাংসদ জনাব মোঃ হাবিবর রহমান, এমপি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

লক্ষ্যে ইতোমধ্যে 'সেল্ফ হেল্প গ্রুপ' মডেলে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আরডিএ কর্তৃক দেশে প্রথমবারের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর সাথে যৌথ উদ্যোগে 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্সের প্রবর্তন করে ৫টি ব্যাচে মোট ৯২ জনকে ডিপ্লোমা প্রদান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

গবেষণা

একাডেমির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মে ২০২১ সাল পর্যন্ত আরডিএ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোট ৫২০টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। গত ১২ বছরে আরডিএ এমডিজি, এসডিজি, ডেল্টা প্ল্যান, বর্তমান সরকারের রূপকল্প ও নির্বাচনি ইশতেহারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করে মোট ১৭০টি গবেষণা পরিচালনা করেছে।

আরডিএ, বগুড়া'র উল্লেখযোগ্য গবেষণা

'আমার গ্রাম আমার শহর'

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর আলোকে দেশের সর্বত্র 'আমার গ্রাম আমার শহর' তথা গ্রামে শহরের নাগরিক সুবিধাদি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে 'বহুমাত্রিক গ্রাম উন্নয়ন উদ্যোগ' বিষয়ক একটি গবেষণা আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণায় গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে অক্ষুণ্ন রেখে নাগরিক সুবিধাদির ১৭টি সেক্টর যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, স্যানিটেশন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান (কৃষি ও অকৃষিখাত); বাজার ব্যবস্থা; নিরাপত্তা ও বিচারব্যবস্থা; সামাজিক নিরাপত্তা; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা; মানবসম্পদ উন্নয়ন; গ্রামীণ শিশু ও নারী উন্নয়ন; গ্রামীণ যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন। গ্রামবাসীর প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে স্বল্প/মধ্য/দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

'সমবায়ভিত্তিক যান্ত্রিক চাষাবাদ'

'কৃষিজমির আইল উঠিয়ে দিয়ে সমবায়ভিত্তিক যান্ত্রিকভাবে চাষাবাদ' শীর্ষক গবেষণার আওতায় বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার চকপাথালিয়া গ্রামে কৃষকগণকে সংগঠিত করে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করে একাডেমি কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারের ভূমিকা রাখে।

প্রায়োগিক গবেষণা

একাডেমি চার দশক ধরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করেছে। একাডেমি বিগত ১২ বছরে ১৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে অবদান রেখেছে। রুরাল পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই মডেল উদ্ভাবনের মাধ্যমে ৪২ হাজার ৩৫০টি পরিবারের মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হয়েছে। উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার আওতায় ১১ হাজার ৯৪০ একর জমি উন্নত সেচের আওতায় আনা হয়েছে। পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির নিম্নগামিতা রোধসহ বিঘা প্রতি ৩০-৪২ শতাংশ সেচের পানি, ১০-২০ শতাংশ বীজ এবং ২৫ শতাংশ ইউরিয়া সার সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। এ প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে ২০% ভাগ ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জমির অপচয় রোধসহ বেড পদ্ধতিতে ফসল চাষের ফলে উৎপাদন উপকরণ সাশ্রয় করে প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত ১১-১৪ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও সেচ কাজে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সহায়ক হিসেবে 'আরডিএ উদ্ভাবিত সৌরশক্তি নির্ভর সেচ ও দ্বি-স্তর বিশিষ্ট কৃষি প্রযুক্তি' দেশের ৩৩টি জেলার ৩৫টি এলাকায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মে ২০২১ পর্যন্ত ২০টি এলাকায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ গবেষণার ফলে প্রতিটি এলাকায় ১৫-২০ একর জমি সেচ প্রদানের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী গ্রামে

নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত দুটি অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর' এবং 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর' মোট ২৩৫.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠার কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। একাডেমি দুটি প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশের পল্লী উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

কমিউনিটিভিত্তিক বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট মডেলের মাধ্যমে ১১২টি গ্রামে পাইপলাইন দিয়ে রন্ধন কাজে বায়োগ্যাস সরবরাহ এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার ও পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার ৮টি চর ইউনিয়নে ১৬ হাজার হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার উন্নয়ন প্রকল্প এবং জামালপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার ৮টি উপজেলার ৩০ হাজার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসকরণে প্রায় ২০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রায়োগিক গবেষণা দুটির আওতায় বগুড়া, জামালপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) আওতায় চর এলাকায় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার অতিদরিদ্র চর পরিবারকে ৩ বেলা খাবারের সংস্থান নিশ্চিতকরণ ও দারিদ্র্য ঝুঁকি কমিয়ে জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন করা হয়েছে। SDC ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে M4C প্রকল্পের আওতায় উত্তরাঞ্চলের ১০টি জেলার চরাঞ্চলে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে উন্নত বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১,২৫,০০০ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষত সিএলপি ও M4C প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা হ্রাস পেয়েছে। এ কার্যক্রম দেশে অব্যাহত রাখতে SDC ও বাংলাদেশ সরকার পুনরায় ১.৮ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

গ্রামাঞ্চলে উন্নত শিক্ষার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে আরডিএ ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ এর জন্য বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবেশে প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১০তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন ও একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদি প্রাণীর জাত উন্নয়ন ও আইসিটিভিত্তিক গবাদি প্রাণী ব্যবস্থাপনা মডেল দেশের উত্তরাঞ্চলসহ চরাঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আরডিএ, বগুড়া পরামর্শ সেবার আওতায় দেশের সেচ ও পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপ এবং শিল্পকারখানার জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এর মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। ভূগর্ভস্থ/ভূউপরিস্থ পানি পরিশোধন পূর্বক বাংলাদেশে প্রথম ওভারহেড ট্যাংক ছাড়াই প্রেসারাইজড পদ্ধতিতে সাভার ট্যানারি শিল্প এলাকায় নিরাপদ খাবার ও ট্যানারি ম্যানের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG Goal 6) অর্জন তথা বাস্তব প্রয়োগের অংশ হিসেবে ভূগর্ভস্থ পানির দক্ষ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে Reduce, Reuse and Recycle ধারণায় জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের মিরপুর স্বপ্ন নগর হাউজিং প্রকল্পের ১,০৪০টি ফ্ল্যাটে পানীয় জল ও গৃহস্থালি কাজে পানি সরবরাহের প্ল্যান্ট স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। রাজউক উত্তরা অ্যাপার্টমেন্ট প্রজেক্ট এলাকায় ৬,৬৩৬টি ফ্ল্যাটে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও পরিশোধন পূর্বক ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনঃভরণ, এসটিপি-এর মাধ্যমে সকল ধরনের বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা এবং পচনশীল সকল ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এনার্জি উৎপাদন ও জৈবসার উৎপাদন প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া'র নিজস্ব অর্থায়নে 'কমিউনিটিভিত্তিক বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগি পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামীণ নারীরা স্বল্প পুঁজিতে বাড়ির কাজের পাশাপাশি দেশি মুরগি পালন করে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং আয়ের পরিমাণ পূর্বের চেয়ে শতকরা প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক মাঠ দিবস পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাপার্ডের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ

'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি' সংক্ষেপে 'বাপার্ড' নামে পরিচিত। ইংরেজিতে- Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development যার সংক্ষিপ্তরূপ BAPARD। প্রথমে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স' নামে এর যাত্রা শুরু হয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স' যাত্রা শুরু করে। দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন করেন এবং পরবর্তীতে ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে কমপ্লেক্সকে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাপার্ড-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাপার্ড জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে নিম্নরূপ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে :

- মোট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ২৫,৯৭১ জনকে, যার মধ্যে পুরুষ ১৩,৫৯৬ জন এবং মহিলা ১২,৩৭৫ জন।
- ১৮,৩৬৬ জন সুফলভোগীকে কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ, কম্পিউটার, সেলাই, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন মেয়াদে হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক ৩,০২৫টি সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে;
- দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে ৭,৬০৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণোত্তর প্রভাব

জুলাই ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ২৮,৫৮২ জন সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে ৪৫% প্রশিক্ষণার্থীর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০% প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা

বাপার্ড এ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত ১১টি প্রায়োগিক গবেষণা সম্পন্ন করেছে :

1. Introducing Thai Koi and Mono Sex Tilapia at Kotalipara
2. Performance of Summer Onions at Kotalipara, Gopalgonj
3. Yield Performances of Vegetable and Spice Crops on Floating Bed
4. Effect of Fertilizers on Growth and Yield of BARI Cheenabadam- 8
5. Study on the Production Performance of Climbing Perch Vietnamese Koi- (Anabas testudineus) in Dewatering Canal at BAPARD Campus, Gopalgonj.
6. Growth Status and Production

Performance of Pabda (Ompok pabda) and Native Magur (Clarias batrachus) in Polyculture System at the Pond of BAPARD Campus, Gopalgonj

7. Study on Production and Economics of Mono Sex Tilapia Culture at Marginal Farmer's Ponds in Gopalgonj District, Bangladesh.
8. Study on Optimization of Stocking Density of Climbing Perch- Koi (Anabas testudineus) at Marginal Farmer's Earthen Ponds in Gopalgonj District, Bangladesh.
9. Biofloc Technology in Aquaculture and its Potentiality: A Review.
10. A Sustainable Solution for Rural Development in Bangladesh.
11. Role of ICT Training on Employment Generation.

প্রায়োগিক গবেষণার প্রভাব

- Introducing Thai Koi and Mono Sex Tilapia at Kotalipara শীর্ষক মাছ চাষের ওপর গবেষণা পরিচালনা করা হয়। মূলত এ গবেষণার মাধ্যমে এ দুটি উন্নত জাতের মাছ কোটালীপাড়ায় বেশ জনপ্রিয় হয় এবং বর্তমানে সকল উপজেলায় ব্যাপক হারে এর চাষ হচ্ছে।
- Yield Performances of Vegetable and Spice Crops on Floating Bed শীর্ষক ভাসমান ধাপে সবজি ও মসলা চাষ বিষয়ক একটি গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণার ফলে কোটালীপাড়ায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাসমান ধাপে সবজি ও মসলা চাষ জনপ্রিয় হয়েছে যা কোটালীপাড়াসহ আশেপাশের এলাকায় ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।
- Performance of Summer Onions at Kotalipara, Gopalgonj শীর্ষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের ওপর আরো একটি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণার ফলে শীতকালের পরিবর্তে গ্রীষ্মকালেও পেঁয়াজ চাষ করা সম্ভব হওয়ায় কার্যক্রমটি এতদঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছে।

বাপার্ডের নবনির্মিত ১০ তলা একাডেমিক ভবন।

গত ২৯ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)-এর ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং মিল্কভিটার চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মেয়াদকালে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, জনমানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ লক্ষ্যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন বিভাগে প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে মিল্কভিটা নতুন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে চলেছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন দুগ্ধ সমৃদ্ধ এলাকায় মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রম দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মিল্কভিটায় দুধ বাজারজাত করায় সমবায়ীগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত মূল্য পেয়ে থাকেন। এতে কৃষকগণের আর্থিক সচ্ছলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি মিল্কভিটার উৎপাদিত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত উন্নতমানের পণ্য দেশের মানুষের প্রাণিজ পুষ্টি চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের সকল বিভাগে মিল্ক ইউনিয়নের আওতাধীন মোট ৬৯টি কেন্দ্রীয় সমিতি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সাংগঠনিকভাবে সম্পৃক্ত করে জনগণকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে। বর্তমানে প্রাথমিক সমিতিতে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি মহিলা সমবায়ীদেরকেও সমিতির সদস্যভুক্ত করা হচ্ছে। এভাবে নারীর আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নে মিল্ক ইউনিয়ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে মিল্কভিটার বিশেষ কার্যক্রম

ক. গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন

মিল্কভিটা বিনামূল্যে সমবায়ী দুগ্ধ খামারিদের গবাদি পশুর চিকিৎসা, ভ্যাকসিন এবং অধিক উৎপাদনশীল গাভির জাত উন্নয়নের জন্য উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে বিনামূল্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করে উন্নত জেনেটিক মেরিট সম্পন্ন সংকর জাতের গাভি উৎপাদনের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

খ. দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারিদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ বিতরণ কার্যক্রম

মিল্ক ইউনিয়ন আওতাধীন প্রাথমিক সমিতির দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারিদের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু লালনপালন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, দুগ্ধ দোহন, গাভির জাত উন্নয়ন, কৃত্রিম প্রজনন এবং উচ্চফলনশীল ঘাস চাষের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিনাসুদে শুধুমাত্র ৫% সার্ভিস চার্জ এর বিনিময়ে সমিতির সদস্যদের মধ্যে গাভি ক্রয়ের জন্য এবং মডেল দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এতে সমবায়ী খামারিগণ সহজেই স্বল্পব্যয়ে গুণগতমানসম্পন্ন অধিক দুগ্ধ উৎপাদনশীল গবাদি পশু পালনে সক্ষম হচ্ছেন।

সাফল্য ও স্বীকৃতি

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্কভিটা) সারা দেশের ভোক্তা -সাধারণের চাহিদাকে সম্মান জানিয়ে এবং মিল্ক ইউনিয়নের গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে প্রতিবছরই গুণগতমানের পুষ্টিসমৃদ্ধ নতুন নতুন দুগ্ধ পণ্য উৎপাদন করে যাচ্ছে, যা মিল্কভিটা পণ্য হিসেবে সারা দেশের ভোক্তা সাধারণের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে। মিল্কভিটা বিগত ২০১১ এবং ২০১৪ সালে পরপর ২ বছর মিলিয়ার্ড ব্রাউন এবং ব্র্যান্ড ফোরাম বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড হিসেবে পুরস্কার লাভ করে।

মিল্কভিটার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে গঠিত সরকার বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে কৃষক পর্যায়ে দুগ্ধ উৎপাদন ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে প্রায় ২,৭৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গবাদি পশুর দানাদার গো-খাদ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের অনুমোদন দেয় যার সুফল আজ সারা দেশের সমবায়ী কৃষক ভোগ করছেন এবং স্বল্পব্যয়ে অধিক দুগ্ধ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

গুঁড়োদুধ কারখানা ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন

বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত সমুদয় দুধ মিল্ক ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগ্রহ করে চাহিদা অনুযায়ী বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্রায় ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে একটি অত্যাধুনিক গুঁড়োদুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম বিভাগে দুধের উৎপাদন এবং চাহিদা অনুযায়ী বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০১৭ সালে প্রায় ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামের পটিয়ায় একটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করার অনুমোদন দেয়। এ কারখানায় প্রতিদিন ২০,০০০ লিটার দুধ প্রক্রিয়াজাত করে চট্টগ্রাম শহরে সরবরাহ করা হবে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেডের মহিষের খামার।

মহিষের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম

দুগ্ধ উৎপাদনের ব্যয় কমানোর পাশাপাশি অধিক দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার ২০১৬ সালে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের জন্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি মহিষ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেয়। ফলে ভারত থেকে বিশুদ্ধ মুররাহ্ জাতের মহিষ আমদানির মাধ্যমে গাভির পাশাপাশি মহিষ পালনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরে এবং মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার টেকেরহাটে মহিষের খামার স্থাপন করা হয়েছে। এখান থেকে উন্নতজাতের মহিষের বকনা বাচ্চা সমবায়ীদের মাঝে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অধিক উৎপাদনশীল গাভির জাত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ

দেশে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ সরকারি অনুদানের মাধ্যমে প্রায় ৩৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার চরাঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে দুগ্ধবতী গাভির জাত উন্নয়ন এবং দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় মিল্কভিটা কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ৬টি প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়েছে। আশা করা যায় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, প্রতিটি মানুষের প্রাণিজ পুষ্টির চাহিদা মিটবে এবং গুঁড়োদুধ আমদানি না করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার-এর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-র আওতায় 'Action Research on Small Farmers and Landless Laborers Development Project (SFDP)' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মূলত এ প্রকল্পটি শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বে সর্বপ্রথম দরিদ্র ও দরিদ্রতর মানুষকে সংগঠিত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সূচনা করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশে তথা বিশ্বে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ হচ্ছেন বাংলাদেশের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রকল্পটির কার্যক্রম ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু হলেও পরবর্তী সরকারসমূহের উদাসীনতায় সরকারি খাত থেকে বিনিয়োগের জন্য তহবিল না পাওয়া যাওয়ায় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় প্রকল্পটি কয়েক পর্যায়ে বিভিন্ন নামে ২০০৫ পর্যন্ত ধুঁকে ধুঁকে টিকে থাকে। পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনার প্রথম সরকারের শেষ দিকে প্রকল্পটি ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দীর্ঘ ২৮ বছর প্রকল্প ও কর্মসূচি আকারে চলার পর ২৭ জুলাই ২০০৫-এ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' সৃষ্টি হয়।

ফাউন্ডেশনের অগ্রগতি ও সাফল্যের প্রভাব

ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডের ফলে কর্ম এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে মোট অন্তর্ভুক্ত ৬০% সদস্যের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

উপকারভোগী সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন ও আয় বৃদ্ধি

বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে ফাউন্ডেশনের আওতায় গঠিত ৬,১১৫ টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্রের ১,৯৫,৪৮৯ জন সুফলভোগী সদস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ৯৯.১২ কোটি টাকা পুঁজি গঠনে সক্ষম হয়েছেন। এতে প্রত্যেক সদস্য গড়ে ৫,০৭০.৩৬ টাকা নিজস্ব সঞ্চয় গঠন করে তাদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছেন।

জামানতবিহীন ঋণের অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি

গ্রামভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় এ সময়ে সংগঠিত ১,৯৫,৪৮৯টি পরিবারের (প্রতি পরিবার হতে একজন করে) ১,৯৫,৪৮৯ জন সুফলভোগীর উৎপাদন, আত্মকর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে এ মেয়াদে ১,২৫০.৭১ কোটি টাকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ৩টি সরকারের সময়ে ২০০৯ হতে মে, ২০২১ পর্যন্ত একনজরে ফাউন্ডেশনের অগ্রগতির চিত্র :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	সরকারের ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত অগ্রগতি	মে ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	জেলা সম্প্রসারণ	৮টি	২৮টি	৩৬টি
২	উপজেলা সম্প্রসারণ	৫৪টি	১১৯টি	১৭৩টি
৩	উপজেলা কার্যালয় বৃদ্ধি	৫৪টি	১২০টি	১৭৪টি
৪	আঞ্চলিক অফিস স্থাপন		২২টি	২২টি
৫	আবর্তক ঋণ তহবিল প্রাপ্তি	১০.০০ কোটি টাকা	১৩২.১৮ কোটি টাকা	১৪২.১৮ কোটি টাকা
৬	কেন্দ্র গঠন	৭৭৯টি	৬,১১৫টি	৬,৮৯৪টি
৭	সদস্য ভুক্তি	২০,৬৯৪ জন	১,৯৫,৪৮৯ জন	২,১৬,১৮৩ জন
৮	সদস্য স্থিতি	২০,১৯৪ জন	৯৬,২৫৮ জন	১,১৬,৪৫২ জন
৯	পুঁজি গঠন (সঞ্চয়)	২.০৩ কোটি টাকা	৯৯.১২ কোটি টাকা	১০১.১৫ কোটি টাকা
১০	পুঁজি স্থিতি	১.৯০ কোটি টাকা	৩৪.২৫ কোটি টাকা	৩৬.১৫ কোটি টাকা
১১	ঋণ বিতরণ (সার্ভিস চার্জসহ)	২২.৪৩ কোটি টাকা	১,২৫০.৭১ কোটি টাকা	১,২৭৩.১৪ কোটি টাকা
১২	ঋণ আদায় (সার্ভিস চার্জসহ)	১৩.৬০ কোটি টাকা	১,১৬৬.০০ কোটি টাকা	১,১৭৯.৬০ কোটি টাকা
১৩	বিনিয়োগ স্থিতি (সার্ভিস চার্জসহ)	৮.৮৩ কোটি টাকা	১৬৫.০৩ কোটি টাকা	১৭৩.৮৬ কোটি টাকা
১৪	সার্ভিস চার্জ আদায়	১.৫০ কোটি টাকা	১০৬.৩৫ কোটি টাকা	১০৭.৮৫ কোটি টাকা
১৫	ঋণ আদায়ের হার	৯৫%	৯৭%	৯৭%
১৬	সুফলভোগী প্রশিক্ষণ		৩৭,৮৫৭ জন	৩৭,৮৫৭ জন

২০০৯ থেকে মে,২০২১ পর্যন্ত সময়ে ফাউন্ডেশনের সম্পাদিত কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন

'জামানতবিহীন' ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে গড়ে প্রত্যেক সদস্য ৬৪,০০০ টাকা ঋণ সহায়তা পেয়েছেন। ঋণের অর্থ যথাযথ খাতে ব্যবহার করে উপকারভোগীর মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি

প্রতিটি সমিতি/কেন্দ্রের সভাপতি, ম্যানেজার এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে এ মেয়াদে ৩৭,৮৫৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীগণ প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে অবদান রাখতে পেরেছেন। প্রতিটি কেন্দ্রের সদস্যদের মধ্য হতে গড়ে প্রায় ৫ জন সৃজনশীল ও উন্নয়ন প্রত্যাশী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামের মানবসম্পদকে দক্ষরূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এতে দক্ষতার সাথে সুফলভোগীগণকে তাদের ঋণের অর্থ ব্যবহার করতে দেখা গেছে এবং তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপকারভোগী সদস্যদের দরিদ্রতা হ্রাস

অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকগণ প্রকল্প সহায়তা পেয়ে সংসারের অভাব মিটাতে পারছেন, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে পড়ালেখা করাতে পারছেন, পরিবার ছোট রাখা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি কার্যক্রমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে উন্নত জীবনযাপন করতে পারছেন, উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে এবং পরিবেশ উন্নয়নসহ বহুবিধ সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হতে দেখা গেছে। ফলে প্রতীয়মান হয় যে ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার ফলে উপকারভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন

ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের ৯৪% নারী। বর্তমান সরকারের মেয়াদে মোট ১,৯৫,৪৮৯ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে ১,৮৩,৭৬০ জনই নারী। ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১,২৫০.৭১ কোটি টাকা যার মধ্যে ১,১৭৫.৬৭ কোটি টাকা নারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফলে নারীদের উৎপাদন আত্মকর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি যৌতুক প্রথা ও বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীগণ অধিক সচেতন হয়েছেন।

বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে ২০০৯ থেকে মে, ২০২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত ১৩২.১৮ কোটি টাকা এবং পূর্ববর্তী সরকারের সময়ে ১০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১৪২.১৮ কোটি টাকা সরকারের কাছ থেকে বিনিয়োগ তহবিল পাওয়া গেলেও বিনিয়োগকৃত তহবিল হতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে ও সদস্য সঞ্চয়ের আংশিক অর্থ বিনিয়োগসহ বর্তমানে ফাউন্ডেশনের ১৭৩ উপজেলার মাঠপর্যায়ে সর্বমোট ১৭৪ কোটি বিনিয়োগ স্থিতির টাকা ঘূর্ণায়মান আকারে মাঠপর্যায়ে বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন'-এর পরিচালনা পর্ষদের ৪৫তম সভায় সভাপতিত্ব করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ২০০৯ সাল থেকে ৩টি সরকারের সময়ে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কর্মএলাকা ৫৪টি উপজেলা থেকে ১৭৩টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এসময়ে কর্মরত জনবল ২১২ থেকে ৭০৯ এ বৃদ্ধি পেয়েছে। পদ সৃষ্টির মাধ্যমে পদ সংখ্যা ৪৬৪ থেকে ১,১৩২-এ উন্নীত হয়েছে। ২৫০ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। সরকারি পে-কমিশনের অনুসরণে ২ বার ফাউন্ডেশনে কর্মরতদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের মাসিক বেতন-ভাতা ও পরিচালন ব্যয় মাত্র ১৩ লাখ টাকা থেকে প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি ফাউন্ডেশনের সার্ভিস চার্জ ও বিবিধ আয়ের পরিমাণ ২৩ লাখ টাকা থেকে কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাসে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা। এ সকল আয় থেকে ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও সকল ধরনের পরিচালন ব্যয় পরিশোধ করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণের সিলিং ১০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং নতুনভাবে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কোভিড-১৯ প্রণোদনা তহবিলের আওতায় মাত্র ৪% সার্ভিস চার্জের বরাদ্দকৃত ১০০ কোটি টাকার মধ্যে ৫০ কোটি টাকা এ অর্থ বছরের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে বিনিয়োগ সম্পন্ন হবে। ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি এবং ফাউন্ডেশনের অসাধু কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট ও ফৌজদারি মামলা এবং অসাধু কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা দায়ের করে ৩২ জনকে মামলার রায়ের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনা হয়েছে। মৃত সদস্যদের ঋণ মওকুফ করা হয়েছে ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকনির্দেশনা অনুসরে ফাউন্ডেশনের ১৭৩টি উপজেলার সকল অনলাইন কার্যক্রমে যুক্ত করে কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং দ্রুত কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আইসিটি শাখা দক্ষ জনবলসহ স্থাপন করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি লেনদেনের অনলাইন মনিটরিংসহ ই-ফাইলিং ব্যবস্থা, ই-মেইল ব্যবস্থা ও ওয়েব পেজ চালু করে সকল কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। একইসময়ে ফাউন্ডেশনের কর্মচারীদের জন্য প্রবিধানমালা অনুযায়ী নীতিমালা প্রণয়ন করে গ্র্যাচুইটি ফান্ড, সিপিএফ ও কল্যাণ তহবিল, ঝুঁকি তহবিল, মটর সাইকেল, বাইসাইকেল তহবিল চালু করা হয়েছে। এসব তহবিলের নীতিমালা অনুযায়ী কর্মচারীদের ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়নবান্ধব নীতি, দিকনির্দেশনা ও প্রকল্প সহযোগিতা প্রদানের কারণেই এসব সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পিডিবিএফ-এর এগিয়ে চলার একযুগ পূর্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ও স্টল পরিদর্শন।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে স্বশাসিত, সুদৃঢ়, আর্থিক স্বনির্ভর, অমুনাফাকাঙ্ক্ষী, নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বিআরডিবি কর্তৃক পরিচালিত আরডি-১২ প্রকল্প থেকে ১৯৯৯ সালে মহান জাতীয় সংসদে পাসকৃত ২৩নং আইনের মাধ্যমে পিডিবিএফ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত মানুষকে দল ও সমিতি গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়/আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা গড়ে তোলা ও তাদের ভবিষ্যৎ পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সচেতনতা সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে উৎসাহী ও প্রশিক্ষিত করা, সংগঠিত জনগোষ্ঠীকে ঋণ সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তাকরণ, পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, পল্লী অঞ্চলে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম চালুকরণ, সোলার হোম সিস্টেম এবং সোলার স্ট্রিট লাইট কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য সরকারের রূপকল্পের পরিপূরক হিসেবে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

পিডিবিএফ দেশের প্রত্যন্ত এলাকাসহ ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালনের পাশাপাশি অকৃষিপণ্য উৎপাদনসহ দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান সরকারের সময়ে জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত পিডিবিএফ-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ :

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

- পিডিবিএফ মোট ৩,১৮,৫০১ জনকে নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক উন্নয়ন, দক্ষতা উন্নয়ন ও প্যারাটেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।
- প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে যার মধ্যে ৯৬% মহিলা, যাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন সম্ভব হয়েছে।
- আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ফলে পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদের ঋণের অর্থ সঠিক খাতে ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদের মধ্য থেকে মোট ৮৪৫ জন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন। এসব নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজসহ তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

পিডিবিএফ দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ৩০,৭২৯টি সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ খাতে

১০,৮৮,৩১২ জন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ খাতে ৪১,৯৫০ জন এবং নারী উদ্যোক্তা ঋণ খাতে ৪০,৮৩৯ জন উপকারভোগীর মাঝে চলতি অর্থবছরের জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১,৭৩৮ কোটি ৫৫ লক্ষ (ক্ষুদ্র ঋণ ১০১৩.০৬ কোটি; ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ ৫১৮.৬৭ কোটি; নারী উদ্যোক্তা ঋণ ২০৬.৮২ কোটি) টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। সদস্যদের পুঁজি গঠনের পরিমাণ ৯৪৭.৩২ কোটি টাকা (সাধারণ সঞ্চয় ৩৭০.৭১ কোটি, সোনালি সঞ্চয় ২৭৬.২০ কোটি, মেয়াদি সঞ্চয় ১৩৭.০২ কোটি, অন্যান্য সঞ্চয় ১৬৩.৩৬ কোটি)। সুফলভোগী সদস্যগণ গৃহীত ঋণের দ্বারা আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প

জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত পিডিবিএফ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে এবং ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ

প্রকল্পটি জুলাই, ২০১২ থেকে জুন, ২০১৮ মেয়াদে ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় মোট ৬,৩১৪টি সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে মোট ২,০৯,৭৯৯ জন সুফলভোগী সদস্যের মধ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৮০,৪৫,৯২,০০০ টাকা সুফলভোগী সদস্যদের আমানত সৃষ্টি/পুঁজি গঠন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ৮০ হাজার ৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে সামাজিক উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ, ৮০,৭২৫ জন সুফলভোগী সদস্যকে কৃষি, প্রাণীসম্পদ ও মৎস্য বিষয়ের ওপর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ৩০০ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্যারাটেকনিশিয়ান প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্পভুক্ত ১,২৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের সুফলভোগী সদস্যদের মধ্যে প্রায় শতভাগ নারী সদস্য।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন এর আইসিটি কার্যক্রম ও ই-সেবা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

প্রকল্পটি মার্চ ২০১৪-মার্চ ২০১৭ মেয়াদে ৫৭টি জেলার ৩৫০টি উপজেলায় মোট ১,৮৮০ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর মনিটরিং, ই-সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিদ্যুৎবিহীন প্রত্যন্ত এবং চর এলাকায় সৌর শক্তির উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পটি মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১ মেয়াদে ৩৩.০৮ কোটি টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২টি জেলার ৩টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অসুবিধাগ্রস্ত ও বিদ্যুৎ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নিকট নবায়নযোগ্য শক্তির (সৌর শক্তি) মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৯,২৭৯টি পরিবারের মধ্যে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

'প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ' শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১ মেয়াদে ৭০.০৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৯টি জেলার ৫০টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর আওতায় ১৫ হাজার জন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, ঋণ সহযোগিতার মাধ্যমে শস্য সংগ্রহের সময় মূল্য অস্থিতিশীলতাজনিত ক্ষতি হ্রাস, কৃষকদের জীবিকায়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলা করা হচ্ছে। শস্য সংগ্রহ উত্তর প্রযুক্তিগত ও প্রক্রিয়াকরণ সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামের প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে তাদের নিজ বাড়িতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিসরে শস্য সংরক্ষণ করে সুবিধামতো সময়ে উক্ত গুদামজাতকৃত শস্য বিক্রয় করে অধিক আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে এ প্রকল্পের মাধ্যমে।

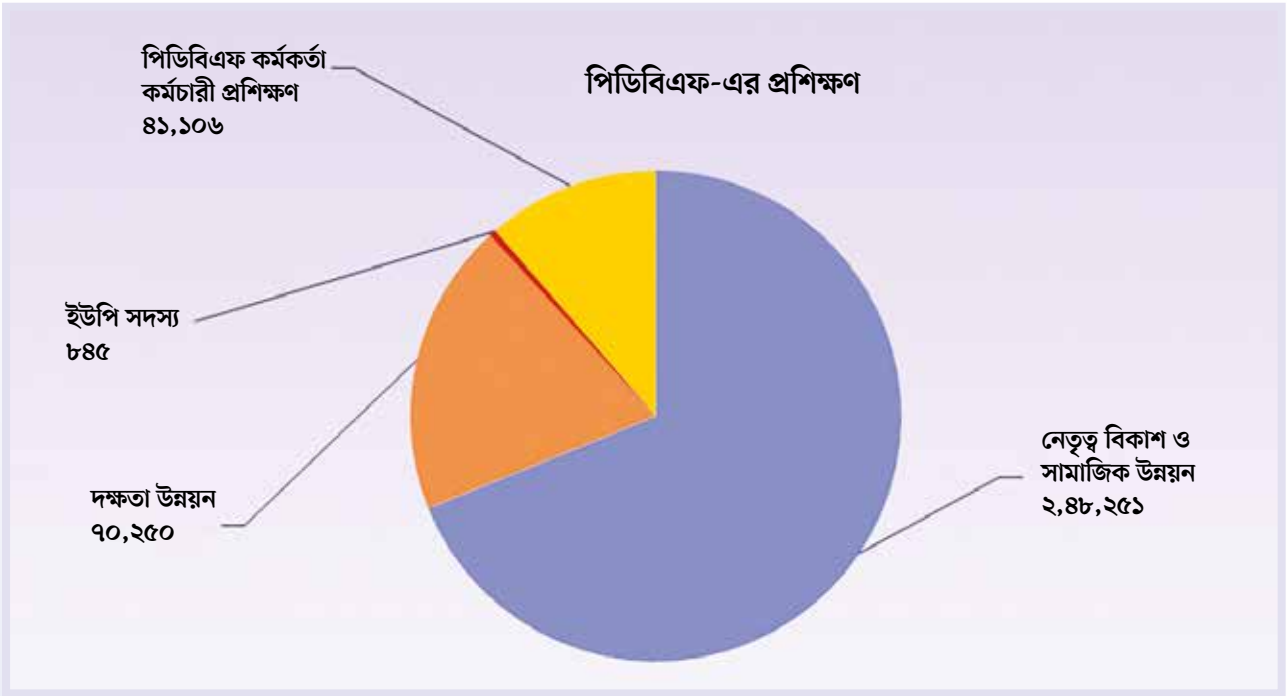

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমবায়ী কৃষকদের পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ ও দণ্ডসুদ মওকুফ বাবদ ভর্তুকির চেক প্রদান করেন।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সমবায় সমিতি আইন ও সমবায় সমিতি বিধিমালা অনুযায়ী নিবন্ধিত ও পরিচালিত একটি জাতীয় সমবায় সমিতি। অবিভক্ত বাংলায় সমবায় সমিতি ও কৃষক পর্যায়ে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে ১৯২২ সালে বেঙ্গল প্রোভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় যার সদর দপ্তর ছিল কলকাতায়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সমবায়ী কৃষকদের কৃষিঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে 'ইস্ট পাকিস্তান প্রোভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর উপ-আইন সংশোধনের মাধ্যমে এই ব্যাংকের নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ'। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর আর্থিক সংকট ও মাঠপর্যায়ে অনাদায়ী কৃষিঋণের কথা বিবেচনা করে এই ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগকৃত মাঠপর্যায়ে অনাদায়ী কৃষিঋণের সুদ ও দণ্ডসুদ বাবদ ৯,৮৭১.২৬ লক্ষ টাকা ভর্তুকি প্রদানের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বর্তমান সরকারের আর্থিক সহায়তার ফলে এবং সমবায় খাতের উন্নয়নে সরকারি নীতি গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর কার্যক্রমেও বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে-

- ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ব্যাংকিং সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে সকল হিসাব সংরক্ষণ ও কার্যক্রম পরিচালনা;
- স্বল্পমেয়াদি শস্য ঋণ বিতরণের পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে মধ্যম মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণ;
- বিভিন্ন সমবায় সমিতির সদস্যদের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মৎস্য চাষ, গবাদি পশুপালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি খাতে ঋণ বিতরণ;
- গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের হস্ত শিল্প, কুটিরশিল্প, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি খাতে ঋণ বিতরণ;
- স্বল্প বেতনভোগী সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সন্তানের উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা, সন্তানের বিবাহ ইত্যাদি খাতে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পার্সোনাল ঋণ বিতরণ;
- স্বল্প আয়ের মানুষের গৃহ সামগ্রী ক্রয় ও গৃহ সাজসজ্জা বাবদ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কনজুমার্স ঋণ বিতরণ;
- স্বর্ণ/স্বর্ণালংকার বন্ধকি ব্যবসা পরিচালনা;
- ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বিতরণ;

বিগত ১০ বছরে ব্যাংকের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

ঋণের প্রকার	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকার অঙ্কে)	সুবিধাভোগীর সংখ্যা
কৃষিঋণ	৪,০৮৯.৩৮	১৬,৩৬০ জন
প্রকল্প ঋণ	৩,২০৭.৪২	৭,৮৪৭ জন
প্রকল্প ঋণ (মহিলা)	৮০৯.২০	১,০১৫ জন
পার্সোনাল ঋণ	১১,১৫৫.৫৫	৪,৯৯২ জন
কনজুমার্স ঋণ	৪,৭২৯.৮০	২,৪৮০ জন
স্বর্ণ বন্ধকি ঋণ	৩০,৯৩৫.৩৫	৩৩,১৩৫ জন
মোট	**৫৪,৯২৬.৭০**	**৬৫,৮২৯ জন**

- ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্থা (ICA)-এর সদস্য পদ গ্রহণ;
- আন্তর্জাতিক সমবায় ব্যাংকিং অ্যাসোসিয়েশন (ICBA)-এর সদস্য পদ গ্রহণ এবং পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক পদে নির্বাচন;
- ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শহরে ব্যাংকের নিজস্ব জমিতে ১০ তলা বিশিষ্ট কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ সমাপ্তকরণ;
- সমগ্র বাংলাদেশের সকল সমবায় সমিতি ও সমবায়ী সদস্যদের পর্যায়ক্রমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে Digital Financial Service এর আওতায় "বিনিময়" নামক Digital Wallet চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- সমগ্র বাংলাদেশের সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে e- commerce platform চালুকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ১৮টি জেলা শহরে ব্যাংকের বুথ/সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদের মালিকানা বিভাজনে 'সমবায় মালিকানার দ্বিতীয় খাত' হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৯২ হাজার ২০টি সমবায় সমিতি ও ১ কোটি ১৫ লক্ষ ব্যক্তি সদস্য রয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪ কোটি মানুষ সমবায় খাতে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের এই বিশাল জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নতি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক বনায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমবায় ও সমবায়ী সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশ সরকার সমবায় ব্যাংককে পুনর্গঠনের মাধ্যমে "বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক" হিসেবে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমানে আইন কমিশনের সহায়তায় ব্যাংকটির সংস্কার ও আধুনিকায়ন করে 'বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক' হিসেবে পুনর্গঠনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মোঃ রেজাউল আহসান : সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন।

মোঃ মিজানুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির নির্দেশানুযায়ী এ বিভাগ ও এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য একটি সমন্বিত সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যা এ বিভাগের ওয়েবসাইট-এ বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কর্নারে আপলোড করা হয়েছে।

১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবসে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান-এর নেতৃত্বে কর্মকর্তাগণ ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এছাড়া এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কেক কাটা, শত প্রদীপ প্রজ্বলন, জাতির পিতার বিভিন্ন বক্তব্য/বাণী সংবলিত ফেস্টুন/ড্রপ ব্যানার/ পোস্টার/ পপস্ট্যান্ড স্থাপনসহ আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন কার্যক্রমের শুভ সূচনা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক 'বঙ্গবন্ধু ও সমবায়' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-তে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পল্লী ভবনে 'বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি' ও 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' স্থাপন করা হয়।

- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লায় 'বঙ্গবন্ধুর সামগ্রিক জীবন' শীর্ষক ও 'বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপনে জাতির পিতার ভূমিকা' শীর্ষক দুইটি সেমিনার আয়োজন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু : পল্লী ভাবনা' শীর্ষক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ এবং 'দারিদ্র্য হ্রাসকরণে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা : বর্তমান চিত্র ও সাফল্য গাথা' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া কুমিল্লা জেলার পাহাড়ি এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে সুদমুক্ত ঋণ, ২৩ মেট্রিক টন ধানের বীজ, ২২টি ধান কাটার মেশিন, ৭টি ধানের চারা রোপণ করার যন্ত্র, ২০ হাজার গাছের চারা, ২ লক্ষ ২৫ হাজার মাছের পোনা এবং ৪০ হাজার হাঁসের বাচ্চা মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বিতরণ করা হয়।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেমিনার, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্যুভেনির গ্রন্থ, স্মরণিকা ও দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া ৩৩ হাজার ফলদ ও নিম গাছের চারা এবং ১ লক্ষ মাছের পোনা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়।
- বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ এ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দরিদ্র ও দুস্থ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ৭০টি সেলাই মেশিন এবং চাষিদের মাঝে ১ লক্ষ মাছের পোনা ও ১০ হাজার ফলদ ও বনজ বৃক্ষের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- এছাড়া বাপার্ড কর্তৃক কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়ার দুটি এতিমখানায় সুপেয় পানির প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।
- আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের

মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রায় ৮ লক্ষ দরিদ্র জনগণকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে তাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যদের প্রত্যেককে ৩টি করে গাছের চারা রোপণে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬৪,০৬,০১১টি বনজ ও ফলজ চারা রোপণ করা হয়।

- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা) কর্তৃক সিরাজগঞ্জস্থ বাঘাবাড়িঘাটে পরিচালিত স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে পাস্তুরিত চকলেট দুধ বিতরণ করা হয়।
- ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে সীমিত পর্যায়ে সমাবেশ অনুষ্ঠান এবং সেরা ৩ জন সদস্যকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লেখযোগ্য উক্তি প্রচার/প্রদর্শন করা হয়।
- বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর কর্মজীবন নিয়ে আলেখ্য ভিডিও প্রদর্শন করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার ওপর ভিত্তি করে ৭ নভেম্বর ২০২০ জাতীয় সমবায় দিবস ২০২০ পালন করা হয়।
- জাতীয় কর্মসূচি অনুসারে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন করা হয় এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন' শীর্ষক (ভার্চুয়াল) আলোচনা সভা ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতীয় কর্মসূচি অনুসরণে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন (২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১)/জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উদযাপন (১৭ মার্চ, ২০২১)/স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন (২৬ মার্চ ২০২১)।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা : উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ' শীর্ষক বিশেষ প্রকাশনা প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এছাড়া মুজিব বর্ষের মেয়াদকালে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১-এর মধ্যে নিম্নোক্ত অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিশেষ প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন।
- বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ; শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর; পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর ও পল্লী জনপদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সুবিধাজনক সময়ে শুভ উদ্বোধন।
- কমপক্ষে ১০০টি সফল মহিলা সমবায় সমিতির সাফল্য নিয়ে "নারীর ক্ষমতায়নে শেখ হাসিনা সরকার : প্রসঙ্গ সমবায়"-শীর্ষক সাফল্য গাথা প্রকাশ করা।
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিসহ ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ও সমবায় শীর্ষক ১১টি সেমিনার আয়োজন।
- সমবায়ের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও কার্যক্রমের শিকড় সন্ধানী তথ্য, উপাত্ত, অডিও-ভিডিও অনুসন্ধানপূর্বক গবেষণা সম্পাদন করা।
- সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বঙ্গবন্ধু মডেল ভিলেজ পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।
- বিআরডিবি'র ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে অংশীজনদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন।
- জাতির পিতার জীবনের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির অবদান, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে পল্লী উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ, বিআরডিবি'র বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য সংবলিত স্মরণিকা প্রকাশ।
- বার্ড কর্তৃক পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত নানা প্রবন্ধমূলক লেখনির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা বিষয়ক একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ করা।
- বার্ড কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্কুল অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য প্রণীত ধারণাপত্রের ওপর স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, পউসবি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বার্ডের প্রাক্তন অনুষদ সদস্যদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী একটি সেমিনার আয়োজন এবং চূড়ান্ত ধারণাপত্র প্রণয়নপূর্বক বার্ডে বঙ্গবন্ধু স্কুল অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।
- বার্ড কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্কুল অব রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান থেকে বঙ্গবন্ধুর কর্ম ও জীবন দর্শনের আলোকে পল্লী উন্নয়নের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান এবং বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রবর্তনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ওপর নিবিড়ভাবে গবেষণা পরিচালনা করা।
- জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩টি গ্রামকে দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষ্যে আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক একটি মডেল উদ্ভাবন ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা থেকে নির্বাচিত অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু ও পল্লী উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা।
- জাতির পিতার স্বপ্নের দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়ার অর্জনভিত্তিক একটি পুস্তক প্রকাশনা।
- দারিদ্র্য হ্রাসকরণের জন্য গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়ায় ২টি গ্রামকে প্রাথমিকভাবে বাছাইপূর্বক কর্মসূচি গ্রহণ।
- 'বঙ্গবন্ধু'র সমবায় ভাবনা ও মিল্কভিটার সাফল্য' বিষয়ক সেমিনার আয়োজন।
- বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন-'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ' গড়তে পিডিবিএফ কর্তৃক নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে মিল রেখে যথাসময়ে জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানমালার সমাপ্তি কার্যক্রম গ্রহণ করা।

মোঃ মিজানুর রহমান : উপসচিব (প্রশাসন-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ ও কর্মপরিকল্পনা

প্রেক্ষিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন।

মোঃ রেজাউল আহসান

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরন্তর ও সুপরিকল্পিত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সামগ্রিক উন্নয়নমুখী কর্মধারার সুনিপুণ লক্ষ্য অর্জনে বেশকিছু মাইলস্টোন নীতিকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে; যার মধ্যে বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় নীতি পরিকল্পনার সাথে সাথে আন্তর্জাতিক কৌশলপত্র 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (SDG- 2030)' বর্তমান উন্নয়নমুখী সরকারের কৌশলগত অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) কর্তৃক ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ অনুমোদিত 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ : বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১' এর অধ্যায়-৪ এ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। উল্লিখিত কৌশলপত্র পরিকল্পনার ভিত্তিতে অনাগত বছরসমূহে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মসুযোগ, ব্যাপ্তি ও সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ অবশ্যই

আলোচনা ও পর্যালোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতীত সাফল্য, নিবেদিত জনসম্পদ, অভিজ্ঞতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিবেচনায় বিদ্যমান নীতিকৌশল পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের চলমান ও সম্ভাব্য কার্যক্রমের মধ্যে পল্লী এলাকায় দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা; পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা পরিচালনা করা; ক্ষুদ্র ও কৃষিঋণ বিতরণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয় গঠন, সমবায় সমিতি গঠন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, সমবায় ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও মার্কেটিং কার্যক্রম, সমবায় চাষাবাদ ও দুগ্ধ সমবায়সহ বিভিন্ন সমবায় পদ্ধতিতে উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী এলাকার মানুষের আয় বৃদ্ধি করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন কৌশলপত্রের সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও উৎকর্ষ অবশ্যই পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে।

রূপকল্প ২০৪১ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশ বর্তমানে একটি মধ্যম আয়ের দেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন এক ঐতিহাসিক ঘটনা যা সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে ২০৪১ সালকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়েছে সরকার। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা 'রূপকল্প ২০৪১'। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে 'রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ণ : বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১'।

এই প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের সামষ্টিক ও টেকসই উন্নয়নের নিবিড় বার্তা। সামষ্টিক ও টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ পল্লী বাংলার উন্নয়ন। এ উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে একদিকে যেমন ০ (শূন্য) দারিদ্র্যের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, অন্যদিকে তা অর্জনে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সেবাভুক্তি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পল্লী পণ্যের বহুমুখীকরণ, সুসম আঞ্চলিক উন্নয়ন, ঝুঁকি হ্রাস ইত্যাদি কৌশলের পরিকল্পিত সন্নিবেশন রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর চতুর্থ অধ্যায়ের শূন্য দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে ২০৩১ সালের মধ্যে অতিদারিদ্র্য দূরীকরণ, দারিদ্র্যের হার সম্ভাব্য সর্বনিম্ন রাখা এবং আয়বৈষম্য বৃদ্ধির গতি রোধ করার সাথে বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে নিভৃত পল্লীতে 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের আলোকবর্তিকা হিসেবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে কার্যকর ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ এ বেশ কয়েকটি অভীষ্ট এবং তার সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কর্মব্যাপ্তির আওতাভুক্ত। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সাথে সম্পর্কিত অভীষ্ট ও লক্ষমাত্রাসমূহ-

অভীষ্ট ১ : সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

- চরম দারিদ্র্যের সম্পূর্ণ অবসান
- জাতীয় সংজ্ঞানুযায়ী যেকোনো ধরনের দারিদ্র্য ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকে কমিয়ে আনা
- উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা
- দরিদ্র ও অরক্ষিতদের (সংকটাপন্ন) অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ঝুঁকি হ্রাস

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের কর্মকৌশল

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আয়বর্ধক ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সমূহকে নিম্নরূপে বিবেচনা করা যেতে পারে :

১. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যুগোপযোগী মডেলের প্রয়োজনীয়তা

দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন, সংযোগ, বিপণনসহ সামগ্রিক উন্নয়নে পল্লীর পশ্চাদপদতা, বহুমাত্রিকতা ও সুযোগ বিবেচনায় যুগোপযোগী ও সমন্বিত মডেল এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে এ পর্যন্ত স্বীকৃত মডেলসমূহের মধ্যে ১৯৫৩ সালের ভি-এইড, ষাট-এর দশকের কুমিল্লা মডেল এবং এরই ধারাবাহিকতায় আইআরডিপি (দ্বি-স্তর সমবায়), স্বনির্ভর বাংলাদেশ, ক্ষুদ্র ঋণ, লিংক মডেল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত মডেলসমূহের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রম নিঃসন্দেহে দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। তথাপি একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং রূপকল্প ২০৪১ এর প্রেক্ষাপটে টেকসই পল্লী উন্নয়নের স্বার্থে একটি সমন্বিত ও যুগোপযোগী পল্লী উন্নয়ন মডেলের প্রয়োজনীয়তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সাথে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে সংযুক্ত করে যৌথ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া এর মাধ্যমে এরূপ গবেষণা পরিচালিত হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর গবেষণা খাতে বরাদ্দের সীমা যথোপযুক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২. পল্লী উন্নয়নে মাস্টারপ্ল্যান

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন উদ্যোগসমূহ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। উন্নয়নের ক্রমবিবর্তনে আজও পল্লীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ জীবনমান উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রম রয়েছে, তেমনি জীবিকার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন প্রভৃতি বহুমাত্রিক উদ্যোগ রয়েছে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

পল্লী অঞ্চল বিবেচনায় বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর-ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে ইউনিয়নভিত্তিক 'বঙ্গবন্ধু আত্মনির্ভরশীল, সমৃদ্ধ পল্লী উন্নয়ন মাস্টারপ্ল্যান' প্রণয়নের উদ্যোগ ইতোমধ্যে হাতে নেওয়া হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় মাঠ পর্যায়ে পল্লী উন্নয়নের ম্যান্ডেট প্রাপ্ত সংস্থা বিআরডিবি'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে উক্ত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন একটি কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৩. পল্লী উন্নয়নে ডাটাবেজ

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নে বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলেও এর তথ্য বিন্যাস ও

সংরক্ষণ ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তি নির্ভর নয়। রূপকল্প ২০৪১ এর প্রেক্ষাপটে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ডাটাবেজ প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ডাটাবেজ প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে পারে যেখানে আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের ডাটা ইনপুট ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

৪. পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়

বর্তমান বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা পল্লী উন্নয়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সামাজিক উদ্যোগেও পল্লীতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সংস্থা বহুমুখী সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সকল সেবা বা উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের সমন্বয় ব্যবস্থা আরো সুসংহত করা যেতে পারে।

বিআরডিবি ও জাইকা এর যৌথ গবেষণায় উদ্ভাবিত এবং বিআরডিবি'র অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী উন্নয়নের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে 'লিংক মডেল' পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করছে। ২০৪১ এর উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে লিংক মডেল কার্যক্রম সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী আরো সুবিন্যস্ত আকারে বাস্তবায়ন করা গেলে তৃণমূল পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন সহজতর হবে।

৫. প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পল্লী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সহযোগিতা উন্নয়ন

স্থানীয় সরকারের বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একই মন্ত্রণালয়ের অধীন বিধায় নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বা বাস্তবায়নের তৃণমূল পর্যায়ে আওতাধীন দপ্তর সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতা আরো জোরদার করার সুযোগ রয়েছে। কার্যপরিধি, গুরুত্ব, কর্মপদ্ধতি, সাংগঠনিক বিন্যাস ইত্যাদি বিবেচনায় উক্ত দুটি ধারা একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক। পল্লী উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ ধারা অনুসারে কর্মসম্পাদন করে থাকে। সমন্বিত পল্লী উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং বিভাগদ্বয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় আরো জোরদার করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে প্রান্তিক পর্যায়ে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৬. সর্বজনীন জীবিকায়নের কর্মসূচি

সময়ের বিবর্তনে এদেশের পল্লীর জীবিকায়নে বিপুল বৈচিত্র্যের সমাহার ঘটেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি জীবিকায়নসমূহ যেমন প্রযুক্তির ছোঁয়ায় উৎকর্ষ লাভ করেছে, তেমনি নিত্যনূতন জীবিকায়ন উদ্ভাবনে পল্লী জীবনযাত্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

উন্নত বাংলাদেশে উন্নত পল্লী গড়তে জীবিকায়নের বহুমাত্রিকতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় পল্লীর জীবিকায়ন ম্যাপিং এর মাধ্যমে সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক 'বাংলাদেশ জীবিকায়ন তথ্যকোষ' প্রণয়ন করা এবং একই সাথে জীবিকায়ন ডাটাবেজ প্রণয়ন করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের প্রণোদনা হিসেবে ইতোমধ্যে বেশকিছু জীবিকায়নভিত্তিক পল্লী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যা ভবিষতে আরো সম্প্রসারিত আকারে বাস্তবায়ন করা হলে পল্লী জীবিকায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৭. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের গুরুত্ব অনুধাবন

রূপকল্প ২০৪১ এর উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম পূর্বশর্ত দারিদ্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল উন্নত পল্লী। দেশের মোট জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ এখনো পল্লীতে বাস। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবিকা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মানবসম্পদ, নেতৃত্ব, নেটওয়ার্ক, মানব সংগঠন প্রভৃতি সূচকের উন্নয়নের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা যেতে পারে। সরকারের নীতি পরিকল্পনায় এ বিষয়গুলোর প্রতিফলনের পাশাপাশি এ সকল খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

৮. পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে প্রযুক্তির ব্যবহার

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে প্রযুক্তির গুরুত্বকে অনুধাবন ও তার যথোপযুক্ত প্রয়োগ পল্লী উন্নয়নে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিটি স্তরে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ একান্ত অপরিহার্য। কৃষির যান্ত্রিকীকরণ হতে শুরু করে, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ব্যবস্থাপনা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল আধুনিক ও উন্নত পল্লী বিনির্মাণ সম্ভব। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পল্লী উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে আরো ফলপ্রসূ গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল উপর্যুক্ত আর্থিক সহায়তাসহ বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। একই সাথে পল্লীতে তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা সম্প্রসারণ ও এর গঠনমূলক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যাগ নেওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য।

৯. পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন

পল্লী অর্থনীতির উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু পল্লীর উদ্যোক্তাগণ প্রায়শই বিভিন্ন কারণে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারে না। দক্ষতা বা প্রশিক্ষণ সুযোগের অভাব, তহবিল স্বল্পতা, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, বিপণন সংযোগ না থাকা প্রভৃতি বিষয় পল্লী উদ্যোক্তা বিকাশের অন্তরায়। এ বিষয়ে কিছু সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগ থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। সম্প্রতি কোভিড-১৯ পরবর্তী আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে সরকারি উদ্যোগে এসএমই ঋণ বিতরণের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

১০. মহাজনি ব্যবসার দৌরাত্ম্য

পল্লী অর্থনীতির প্রধান নিয়ামক হচ্ছে তহবিল প্রবাহ ও ব্যবস্থাপনা। উৎপাদন, বিনিয়োগ এবং বিপণন হতে জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পল্লী অঞ্চলে তহবিল প্রবাহের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় সাধারণভাবে পল্লী অঞ্চলের তহবিল প্রবাহের সুযোগ নিতান্তই সীমিত। আর এই সীমিত তহবিল ও অফুরন্ত চাহিদার সুযোগ নেয় এক শ্রেণীর মহাজন ব্যবসায়ী। এজন্য পল্লী অঞ্চলে ঋণসেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে হবে। এদের ব্যবস্থাপনা উন্নত ও তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক করা, আর্থিক সক্ষমতা উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল কাঠামো নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১১. করোনাকালীন নিরাপত্তা বেষ্টনী

চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। প্রয়োজন মেটাতে কেউ কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে

পড়েছে। পল্লী অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এ সকল মানষের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য সহায়তা প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, পল্লীতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ও আওতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পল্লী জনগণের অর্থনৈতিক সক্ষমতা উন্নয়ন ও দারিদ্র্যের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় বিআরডিবি'র মাধ্যমে করোনাকালীন 'জীবিকায়ন ভাতা', 'দারিদ্র্য ভাতা' ও 'সমবায়ী কৃষক ভাতা' চালু করা যেতে পারে।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার কৌশলসমূহ

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের লক্ষ্য (Goals) :

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের লক্ষ্য হলো গ্রামীণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি টেকসই ও ত্বরান্বিত করা। এ লক্ষ্যের সাথে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যগুলোর সমন্বয়ের জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) মেয়াদে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী পল্লী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস করা, অসমতা হ্রাস করা, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পল্লী জনগণের আয় বৃদ্ধি করা ইত্যাদি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সামগ্রিক উদ্দেশ্য ও কৌশল

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে এ বিভাগের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে :

ক) পল্লীর জনগণের কর্মসংস্থান ও আয়ের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা;

খ) পল্লী এলাকায়, বিশেষ করে অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য কমিয়ে আনা;

গ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুসম উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মূলধন গঠনের জন্য সমবায় কার্যক্রম জোরদারকরণ;

ঙ) কৃষিজাত ও অকৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য মার্কেট-লিংকেজ (Market linkage) তৈরি।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে নির্ধারিত অগ্রাধিকার কর্মকৌশলের মধ্যে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

ক্র. নং	অগ্রাধিকার কৌশল	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ভূমিকা
১	পল্লী জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন	মানবসম্পদ উন্নয়ন, অংশীজনের মধ্যে যোগাযোগ, নেতৃত্বের বিকাশ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন	পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন
২	মূলধন সেবা সম্প্রসারণ	স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণ, উদ্যোক্তা ঋণ, লিংকেজ সুবিধা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন	পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন। চলমান ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি সম্প্রসারিত আকারে উদ্যোক্তা ঋণ ও বিনিয়োগ ঋণ বাস্তবায়ন
৩	পল্লী জীবিকায়ন ম্যাপিং	জীবিকায়ন ম্যাপিং, জীবিকায়ন অভিধান প্রকাশ, জীবিকায়ন ডাটাবেজ	পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং
৪	জীবিকাভিত্তিক পল্লী প্রতিষ্ঠা	বিআরডিবি কর্তৃক পাইলট আকারে স্থাপিত পণ্যভিত্তিক পল্লীর অভিজ্ঞতার আলোকে সারা দেশে ১২৮ টি নতুন পণ্যভিত্তিক পল্লী প্রতিষ্ঠা। প্রশিক্ষণ-ঋণ-উৎপাদন-বিপণন সংযোগ।	পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং
৫	পল্লী পণ্যের বিপণন সংযোগ ও পল্লী ই-কমার্স	পল্লী এলাকায় উপকারভোগী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বিপণনে ব্র্যান্ডিং, সমবায় ভিত্তিক বিপণন, বিআরডিবি'র মাধ্যমে পল্লী পণ্য মেলা আয়োজন ও অনলাইন বিপণন	পৃষ্ঠপোষকতা, বিভিন্ন সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়, প্রণোদনা ও মনিটরিং
৬	পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ	পল্লী উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ইনপুট সহ সামগ্রিক ডাটাবেজ প্রণয়ন	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক ডাটাবেজ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিআরডিবি'র নেতৃত্বে আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের ডাটা প্রদান ও ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা করা
৭	পল্লী এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি	বাছাইকৃত পল্লী উন্নয়ন সমিতি/সমবায় সমিতিকে তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রদান	পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং

৮	নারীর ক্ষমতায়ন	প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা, আয় উৎসারী কর্মকাণ্ড, বিপণন সংযোগ, নেতৃত্ব সৃষ্টি, নারীর মর্যাদা উন্নয়ন কার্যক্রম	অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে সমন্বয়, কার্যক্রম আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
৯	পল্লী সংরক্ষণাগার সুবিধা	বিদ্যমান সংরক্ষণাগার সংস্কার ও উন্নয়ন, সমিতি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, সাময়িক সংরক্ষণ সুবিধা	পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং
১০	সামাজিক নিরাপত্তা	বিদ্যমান ক্ষুদ্র ঋণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রসার। বিআরডিবি'র মাধ্যমে করোনাকালীন 'জীবিকায়ন ভাতা', 'দারিদ্র্য ভাতা' ও 'সমবায়ী কৃষক ভাতা' চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা	সরকারি কৌশলপত্রে অন্তর্ভুক্তি, পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি ও বাস্তবায়ন সহায়তা, মনিটরিং ও মূল্যায়ন।
১১	সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়ন	সামাজিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর কর্মস্পৃহা সৃজনের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা আয়োজন, সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন	পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং
১২	পল্লী আবাসন	স্বল্পমূল্যের বহুতল ভবন নির্মাণ, শ্রেণিভিত্তিক স্বল্পমূল্যে বরাদ্দ	পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং
১৩	পল্লী ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন	অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত পল্লী ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ কাজের সম্প্রসারণ	বিআরডিবি'র প্রকল্প ও মূল কার্যক্রম হিসেবে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও মনিটরিং করবে
১৪	পল্লী ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ উন্নয়ন	প্রশিক্ষণ, বিনিয়োগ তহবিল, প্রযুক্তি সহায়তা, কাঁচামাল, লিংকেজ সহায়তা, বিপণন সংযোগ	মাঠ পর্যায়ে যোগ্য উপকারভোগী/সমিতির মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা হবে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা প্রদান ও মনিটরিং করবে
১৫	পল্লী শক্তি উন্নয়ন	সৌরশক্তির প্রসার, বায়োগ্যাস, সমিতিভিত্তিক উদ্যোগ	পৃষ্ঠপোষকতা, নীতি সহায়তা এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ও মনিটরিং
১৬	কৃষি যান্ত্রিকীকরণ	অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কৃষক সমিতিতে উপযুক্ত কৃষিযন্ত্র সরবরাহ, যৌথ বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণ	অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার সাথে সমন্বয়, কার্যক্রম আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান
১৭	জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	সামাজিক আন্দোলন, দুর্যোগ মোকাবিলা সক্ষমতা উন্নয়ন, দূষণ রোধ, পল্লী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহযোগিতা নিয়ে আওতাধীন সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে

এ সকল কর্মকৌশল বাস্তবায়নে নিজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সমন্বয় করা হবে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আওতাধীন সংস্থাসমূহের প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়টি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

উপসংহার

রূপকল্প ২০৪১ এর আলোকে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বনির্ভর ও উন্নত পল্লী সৃজন। উন্নত পল্লী গড়ার পরিক্রমায় চিহ্নিত চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সকল অংশীজনের সহযোগিতা, অংশগ্রহণ ও উদ্যোগী ভূমিকা একান্ত প্রয়োজন। এ পথযাত্রায় জাতীয় পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যন্ত সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সাথে পল্লী এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও পল্লী উন্নয়নে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে দায়িত্বপ্রাপ্ত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিকল্পিত ও সমৃদ্ধ পল্লী বিনির্মাণের নীতিকৌশল প্রণয়ন করা হবে। পরিকল্পিত ও উন্নত পল্লীসমূহের সম্মিলনে অর্জিত হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

মোঃ রেজাউল আহসান : সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বাংলাদেশ, সমবায় এবং বঙ্গবন্ধু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে যশোর সদর আসনের সংসদ সদস্য প্রয়াত এম রওশন আলীকে সমবায় চেক প্রদান করেন।

মোঃ আমিনুল ইসলাম

মানুষ আদিকাল থেকেই মূলত যূথবদ্ধ প্রাণী। একতাই বল- এই নীতি অবলম্বন করে সে প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীকে বশে এনেছে এবং প্রকৃতির ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে। সেই সমবেত প্রচেষ্টার সংগঠিত আধুনিক রূপ হচ্ছে সমবায়। 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' এটাই হচ্ছে সমবায়ের মূলমন্ত্র। সমবায়ের বর্তমান রূপের উৎস সন্ধান করতে গেলে একথা স্বীকার করতেই হয়ে যে শিল্পবিপ্লবের জয়ধ্বনি-উচ্চকিত ইংল্যান্ডে রচডেলের তাঁতিরা সমবায় সমিতিকে আধুনিক রূপ প্রদান করেছিলেন এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। মূলত শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যই এই সমবেত উন্নয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশরা এদেশে ১৯০৪ সালে সমবায় প্রথার চালু করে মূলত জমিদার-মহাজনদের শোষণ থেকে সাধারণ কৃষকদের বাঁচানোর লক্ষ্যে। ব্রিটিশদের পথনির্দেশনায় ১৯০৬ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯০৯ সালে খুলনায় রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯১৪ সালে বগুড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ধরনের ব্যাংক এখনও রয়েছে প্রায় শ'খানেক। এই ব্যাংকগুলো আওতাধীন কৃষক সমবায় সমিতিগুলোকে স্বল্পসুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দিত। কালক্রমে সমবায় সমিতির প্রকারভেদ বৃদ্ধি পায়। জেলে, তাঁতি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, বিত্তহীন মানুষ এবং নারীরা সমবায় সমিতি গঠনে এগিয়ে আসেন। বর্তমানে দেশে মোট ৩৫ প্রকারের সমবায় সমিতি আছে যার মোট সংখ্যা ১,৯২,০২০। দেশে মোট সমবায়ীর সংখ্যা ১,১৫,০৯,৮২৫ জন। সমবায়ের মাধ্যমে

প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে ৯,২৫,৬৯৯ জন মানুষের। জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ সমবায়ের সাথে জড়িত। দেশের অর্থনীতিতে সমবায় সেক্টরের ভূমিকা আলাদাভাবে পরিমাপ করা হয় না। তবে টিআইবি-এর গবেষণালব্ধ তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের জিডিপি-তে সমবায় সেক্টরের অবদান ১.৮৮%। কিন্তু বাস্তবে সমবায় সেক্টরের অবদান কয়েকগুণ বেশি। কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, বস্ত্রখাত, দুগ্ধ উৎপাদন, চামড়াজাত শিল্প, মৃৎশিল্প, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি সেক্টরে অর্থনৈতিক অবদানের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমবায়ের সহযোগী ভূমিকা রয়েছে। বাংলোদেশে কৃষির যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন, তার পেছনেও দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় সমিতির ভূমিকা অগ্রগণ্য। কিন্তু এসব অবদান যথাযথভাবে পরিমাপ করা যায়নি বলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমবায়ের অবস্থান আজও পূর্ণ মাত্রায় উপস্থাপিত হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন এবং সমবায়

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আখ্যায়িত 'দুঃখ জয়ের নবীনমন্ত্র সমবায়'-কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি ও সমবায় বিষয়ক মন্ত্রী থাকাকালেই সমবায়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর পড়ে তাঁর। সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৭০ সালের নভেম্বরে প্রদত্ত বেতার টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দিতে হবে। কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাঁতিদের ন্যায্যমূল্যে সুতা ও রং সরবরাহ করতে হবে। তাদের জন্যে অবশ্যই বাজারজাতকরণ ও ঋণদানের সুবিধা করে দিতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতির শিল্প গড়ে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে এসব শিল্পকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যার ফলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিভিন্ন প্রকার শিল্প সুযোগ পৌঁছায় এবং গ্রামীণ মানুষের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।' বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু দুটি মহৎ কাজ করেন: সমবায়-সংগীত রচয়িতা বিদ্রোহী কবিকে ভারত থেকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে জাতীয় কবির সম্মানে সযত্নে রাখার ব্যবস্থা এবং সমবায়কে পিছিয়ে থাকা সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে গ্রহণ। তিনি সমবায়ের আর্থসামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্রের উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালিসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, "আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের এবং তাদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহিদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।"

আর্থসামাজিক উন্নয়নের সাথে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে সমবায়ের কার্যকর ভূমিকা

মানবসমাজ চলমান রয়েছে আমরা যাদের বলি 'সাধারণ জনগণ', মূলত তাদের কর্মপ্রবাহের শক্তিমন্ত্রে। যারা খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করেন, তারাই সচল রেখেছেন জীবনের গতি; তাদের কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে সমাজ-সংসার-সভ্যতা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঐকতান' নামক কবিতায় বিষয়টি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন :

'চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল-
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার'।
.....
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি'।

সমবায় অধিদপ্তর মূলত এসব 'সাধারণ মানুষ'-দের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পন্থা হিসেবে সমবায়কে গ্রহণ করে আসছে। আমরা সেসবের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করতে চাই।

১. কৃষকদের ঋণ সরবরাহ ও শোষণ হতে মুক্তির সূচনা

ব্রিটিশ আমলে জমিদারি প্রথা চালু করায় সাধারণ কৃষক-জেলে-তাঁতিদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে যা সেই সময়ে রচিত উপন্যাস-নাটক-কবিতা-গানে বাণীবদ্ধ হয়ে আছে আজও। মেহনতি মানুষের কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সুবিখ্যাত ' ওঠ রে চাষি জগদ্বাসী, ধর কষে লাঙল' গানে সেই অবস্থার ছবি তুলে ধরেছিলেন জীবন্তভাবে যার কয়েকটি লাইন এমন,

'ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায়-বা সেই গান গেল ভাই, কোথায় সে-কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল।।
আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাই কো আমার হাত।'

কিন্তু ব্রিটিশরা নিজেদের সভ্য জাতি বলে দাবি করে এবং এদেশের সাধারণ মানুষ সবাই ক্ষুধায়-রোগে-শোকে-বঞ্চনায় ব্যাপকভাবে সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে তাদের শাসন টিকিয়ে রাখাও কঠিনতর হয়ে যাবে ভেবে তারা কৃষক-জেলে-তাঁতি প্রভৃতি সাধারণ মানুষদের বাঁচাতে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার একটি হচ্ছে সমবায় ব্যাংকিং। ব্রিটিশরা ১৯০৪ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সমবায় পদ্ধতি চালু করে। বর্তমান বাংলাদেশে ১৯০৬ সালে সমবায় ব্যাংকিং চালু করা হয়। সেগুলোর নাম ছিল এলাকাভিত্তিক সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক। ১৯০৬ সালে ঢাকা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯০৯ সালে খুলনায় রাড়ুলী সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক, ১৯১৪ সালে বগুড়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে প্রায় শ'খানেক কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ব্যাংক আওতাধীন কৃষক সমবায় সমিতিগুলোকে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দিত। এতে করে কৃষকগণ জমিদার-মহাজনদের চক্রবৃদ্ধি অতিসুদের শোষণ থেকে নিজেদের কিছুটা হলেও রক্ষা করার বিকল্প পথ পায়। সময়ের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হলো সমবায় ব্যাংকিং একটি যুগান্তকারী ঘটনা ছিল কিন্তু নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে পরবর্তীতে সেই সোনালি সাফল্য অনেকখানি ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও ঋণ সরবরাহ

অব্যাহত আছে। সমবায় ব্যাংকের পাশাপাশি কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকগুলো কৃষকদের ঋণ সরবরাহ করে আসছে। এক্ষেত্রে সমবায় ব্যাংকগুলোর পাইওনিয়ারিং ভূমিকা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না।

২. তৃণমূলে গণতন্ত্রায়ন ও সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়ন

সাধারণ মানুষ তখনই ক্ষমতার উৎস যখন তারা সচেতনভাবে একতাবদ্ধ। এ কাজটি মূলত গণতন্ত্রের। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা চলে যেতে বাধ্য হওয়ার পরই কেবল উপমহাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সেটাও অচিরে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু সমবায় মানুষকে তৃণমূল স্তরেই গণতন্ত্রের স্বাদ ও সাফল্য দিয়ে এসেছে ব্রিটিশ আমল থেকেই। সমবায় সমিতি পরিচালিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং সেই পরিচালনার কাজটিও হয় নিজেদের সুলিখিত ও বিধিবদ্ধ সংবিধান বা উপ-আইন অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি সমবায় সমিতি হচ্ছে এক একটি ক্ষুদ্র গণতন্ত্র বা Mini Democracy। এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের তৃণমূলায়ন। এটা হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র (Quality Democracy)। সাধারণ মানুষের, পিছিয়ে পড়া মানুষের সুপ্ত ও অব্যবহৃত ক্ষমতার উদ্বোধন ঘটে সমবায় সমিতির মাধ্যমে। তারা আপনা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমবেত হয়ে নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজেদের দ্বারা নিজেদের নেতৃত্বে নিজেদের সম্মিলিত ও ব্যক্তিগত ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটায়। ভূপেন হাজারিকার গাওয়া একটি বিখ্যাত গানে বৃহত্তর সমাজের মানুষের অবস্থা তুলে ধরে বলা হয়েছে, "ব্যক্তি যদি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্বরহিত/তবে শিথিল সমাজকে ভাঙ্গো না কেন!" সমবায় হচ্ছে ব্যক্তিকে তার আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থপরতার খোয়াড় থেকে বের করে আনার এবং ব্যক্তিত্বরহিত সমষ্টিকে প্রবল ব্যক্তিত্বে জাগিয়ে তোলার মোক্ষম মন্ত্র। সমবায় সমিতিই হচ্ছে 'জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরের খাদ্যবিহীন নাগরিকের নেতৃবিহীনতার মৌনতা' ভাঙার অব্যর্থ অস্ত্র। সমবায়ই সফলভাবে শেখাতে পারে: 'আমরা দুর্বল নই, আমরা পারি'। বাংলাদেশে সমবায়ের অতীত ও বর্তমান ভূমিকার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হলো সমবায়ের এই মানবশক্তির উদ্বোধন ও গ্রামবাংলার আনাচকানাচের গণতন্ত্রায়নের বিষয়টি সোনালি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে বলে আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ দৃঢ় বিশ্বাস।

৩. কৃষি সমবায়

স্বাধীনতার আগে ও পরে এদেশের কৃষিখাতের উন্নয়নে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমরা ওপরে কৃষকদের উন্নয়নে সমবায় ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভূমিকা তুলে ধরেছি। দারিদ্রপীড়িত, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। এক্ষেত্রে আখতার হামিদ খান এর দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির অবদানের কথা না বললেই নয়। এই মহান ব্যক্তির মহৎ উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। কৃষিকাজ বলতে জমিতে ফসল ফলানো, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু পালন, মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন এসব কিছুর সমষ্টিকে বুঝায়। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালন করে আসছে সমবায়। ব্রিটিশ আমলে যখন কৃষকরা মহাজন-জমিদারদের চক্রবৃদ্ধি সুদসংবলিত ঋণের কবলে পড়ে জর্জরিত, তখন সমবায় ব্যাংকগুলোই কৃষকদের পাশে সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ বাংলাদেশ যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তার সবখানি কৃতিত্ব কৃষি বিভাগের একার নয়; এর মূলে আছে সমবায়। কিন্তু সমবায়ের এই সহযোগী ভূমিকার মূল্যায়ন নেই, সমবায়ের অবদানের পরিমাপ নেই। ফলে স্বীকৃতিও নেই। এটা সমবায় বিভাগের একটা দুর্ভাগ্য। কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে : কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি (৫২,৩২৬টি), কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক (৭৫টি), কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি (৬৫টি), ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি (১০,০৬৩টি), উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় অ্যাসোসিয়েশন (৪৮৮টি) ও প্রাথমিক জমি বন্ধকি ব্যাংক (৬৮টি)। বর্তমানে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৭২,৪৬০টি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক কর্তৃক এসব কৃষি সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৪. বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ইষ্ট পাকিস্তান প্রোভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে উক্ত ব্যাংকটিকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং এটি একটি জাতীয় সমবায় সমিতি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রধানত কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, সদস্যদের ও অসদস্য সকলের কাছ থেকে সকল প্রকার আমানত গ্রহণ এবং আমানতের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সমপরিমাণ হারে সুদ প্রদান করে থাকে। সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় আখচাষি সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি এবং সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে এ ব্যাংকটির কৃষিঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৭১, শেয়ার মূলধন ৭৩০.৫২ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৩,২৫৬.৩০ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ১৯,২১৯.০৫ লক্ষ টাকা। সমিতিটি ২০১৯-'২০ অর্থবছরে ২১.৬২ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। মোট সম্পদের পরিমাণ ১৪০.২৮ কোটি টাকা। ২০১৯-'২০ অর্থবছরে সমবায় ব্যাংক ঋণ বিতরণ করেছে ৫,১২৮.৩৮ লক্ষ টাকা এবং ঋণ আদায় করেছে ৭,০৭৭.১৪ লক্ষ টাকা। সরকার চেষ্টা করছে ব্যাংকটিকে তার সফল ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে। সমবায় বিভাগের কর্মী হিসেবে আমরা আশাবাদী হতে চাই।

৫. বাজারজাতকরণ সমবায়

কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি ইত্যাদি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে দেশে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৬৩৯টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ২৭,৯৭৪ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৭৮১.৭৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৫৯৫.৫৬ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৭৮.২৮ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ১৬৭.২৮ লক্ষ টাকা। সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে, অনেক দূর যেতে হবে। সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাটি এখন প্রকট। বিশেষত উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতিগুলো এ সমস্যায় ভুগছে সবচেয়ে বেশি। এটি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দেরও অবগতিতে আছে। সমবায় অধিদপ্তর এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তাভাবনা করে আসছে এবং ই-মার্কেটিং, উপজেলা স্তরে সমবায় বাজার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

৬. বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ

কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রদান ও পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে সদস্য সমিতিসমূহকে সমৃদ্ধিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৭টি, শেয়ার মূলধন ৪৬.৬১ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৬.৬৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ০.৩৪ লক্ষ টাকা। এই সমিতিগুলো প্রত্যাশিত

ভূমিকা পালন করতে পারছে না নানাবিধ সীমাবদ্ধতার কারণে। কিন্তু এ ধরনের সমবায় সমিতি যত বেশি সফল হবে, উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে সমবায় তত বেশি কার্যকর হবে। সমবায় অধিদপ্তরের সহকর্মীদের এ দিকটির প্রতি আরও বেশি গভীর ও দূরগামী দৃষ্টি দিতে হবে।

৭. শিল্প সমবায়

আমরা একসময় বস্ত্রশিল্পে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম। আমাদের তাঁতিদের তৈরি মসলিনের খ্যাতি ছিল জগৎজোড়া। রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতায় ঢাকাই শাড়ির কথা আছে : 'ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া/পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর।' নজরুলের একটি বিখ্যাত প্রেমের গানের প্রথম দু'লাইন এরকম : 'আমি ময়নামতীর শাড়ি দেবো চলো আমার বাড়ি/ওগো ভিন্ গেরামের নারী।' বস্ত্রশিল্পে আমাদের স্বনির্ভরতার পিছনে ছিলেন তাঁতি সম্প্রদায় এবং তাদের সংগঠিত করেছিল তাঁতি সমবায় সমিতিগুলো। দুঃখের বিষয় হলো নানবিধ কারণে বস্ত্রশিল্পের এখন দুর্দিন; দুর্দিন তাঁতি সমবায় সমিতিগুলোরও। দেশ ও জাতিকে অনেক দিয়ে তাঁতি সমবায় সমিতিগুলো এখন হাড্ডিসার। এসব সমিতিকে আবার জাগিয়ে ও পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারলে দেশেরই লাভ হবে। কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক তাঁতি সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সুতা পাকানো সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় হস্তশিল্প সমবায় ফেডারেশন ও প্রাথমিক মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদি শিল্প সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে দেশে এ প্রকারের মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩,২১০টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২৯,৬৩৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১,৩৬৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১১,৭০০.৪৮ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ৪টি জাতীয় সমবায় সমিতি (বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড, বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিমিটেড, দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিমিটেড, সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিমিটেড) এসব কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

ক. বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ

সমবায়ী তাঁতিদের জন্য বিদেশ থেকে রং, রাসায়নিক দ্রব্য, সুতা ও তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানিসহ তাঁতিদের ঋণ প্রকল্প ও স্থানীয় মিলের সুতা বিতরণ করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫২। সমিতির শেয়ার মূলধন ৪২.৮১ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১৭১.৮৩ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ০.০৬ লক্ষ টাকা।

খ. বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিঃ

পাট এক সময় ছিল 'সোনালি আঁশ'; তখন পাটকল সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো ছিল পাটকল শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম। আজ সেসব কেবল সোনালি স্মৃতি। পাটকলগুলো এখন ভাঙা জমিদার বাড়ি; পাটকল শ্রমিকেরা নিঃস্ব প্রায় মানবপ্রজাতি। পাটচাষিদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদানকল্পে একটি পূর্ণাঙ্গ পাটকল স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা (লিঃ) একটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি হিসেবে ১৯৪৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৪৫। সমিতির শেয়ার মূলধন ৩.৭৩ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১৬১.৭০ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২.৩৬ লক্ষ টাকা।

গ. দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিঃ

পাট উৎপাদনকারীদের অধিক পাট উৎপাদনের উৎসাহ প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের জন্য সমবায় পাটকল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লিঃ। পরবর্তীতে বিগত ১৭/০৫/৮৬ খ্রি. তারিখে এর নাম আংশিক সংশোধনপূর্বক দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিঃ নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৭৫। সমিতির শেয়ার মূলধন ২২.৫২ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৫.৫৬ লক্ষ টাকা।

ঘ. সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিঃ

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আমলে কতিপয় তন্তুবায় বহুমুখী সমবায় সমিতি এবং কিছু ব্যক্তি সদস্যদের সমন্বয়ে তাঁতিদের প্রস্তুতকৃত কাপড় আধুনিক পদ্ধতিতে ডাইং ও ক্যালেন্ডার করার প্রয়াসে এক বা একাধিক ক্যালেন্ডারিং ফ্যাক্টরি করার জন্য ১৯৫১ সালের ১০ জুন তারিখে ইস্ট পাকিস্তান কো-অপারেটিভ কটন স্পিনিং মিলস্ লিঃ নামে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ উপ আইন সংশোধনের মাধ্যমে সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিঃ নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,৩৬০টি, শেয়ার মূলধন ৪.১৩ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৯৫.৩৩ লক্ষ টাকা।

ঙ. মৃৎশিল্প উন্নয়নে সমবায়

আমাদের অর্থনীতিতে, আমাদের সভ্যতায়, আমাদের সংস্কৃতিতে, আমাদের সাহিত্যে সবখানেই মৃৎশিল্পের অবদান ও সোনালি ছাপ বিদ্যমান। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, ময়নামতির শালবন বৌদ্ধবিহার, উয়ারী বটেশ্বর, যেখানেই আমরা চোখ রাখি, সেখানেই মাটির টেরাকোটার অমর নিদর্শন আজও দেখতে পাই। এদেশ তো বলা যায় কামার-কুমার-কৃষকদের হাতে তৈরি। একসময় ঘরে ঘরে মাটির বাসনকোসন ব্যবহৃত হতো। এমনকি পূজোর মূর্তিগুলোও বৃহত্তর অর্থে মৃৎশিল্পের অন্তর্গত। মৃৎশিল্পীদের নিয়ে সেই বহুদিন আগে থেকেই একাধিক নামকরা সমবায় সমিতি রয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। মৃৎশিল্পের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে কুমিল্লার বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। এ সমিতির সঙ্গে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মচেতনা ও দেশপ্রেমের এক অনুপম স্মৃতি জড়িত রয়েছে। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকহানাদার বাহিনী সমিতির অফিস ও উৎপাদন কেন্দ্র পুড়িয়ে দেয়। এতে করে সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুমিল্লায় আসলে তাঁকে মৃৎশিল্পের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর থেকে সমিতিকে এককালীন ৭৫,০০০ টাকা অনুদান প্রদান করেন। সাথে স্বল্পমূল্যে ২০০ সিএফটি কাঠ এবং প্রয়োজনীয় টিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর মাধ্যমে সমিতির আবার পুনর্জন্ম হয়।

৮. মৎস্য সমবায়

মাছে-ভাতে বাঙালি প্রবাদটি বাঙালি জাতির সমবয়সি। মাছ হচ্ছে পৃথিবীর সেরা প্রাণিজ প্রোটিন যার কোনো নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। একসময় বাংলায় জেলে সম্প্রদায়ের অবস্থা খুবই মজবুত ছিল। তারাই আদি বাঙালি। বরেন্দ্র অঞ্চলের জেলে সম্প্রদায় যারা কৈবর্ত নামে পরিচিত ছিলেন একসময় পালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার আয়ু ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। সেই বিদ্রোহের নাম কৈবর্ত বিদ্রোহ। আজও বরেন্দ্র অঞ্চলের নওগাঁ জেলায় দিবর দিঘি ও দিব্বকস্তম্ভ সেই বিজয়ের স্মৃতিসৌধ হয়ে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম', 'পদ্মা নদীর মাঝি' প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাসে মৎস্যজীবীদের সুখ-দুঃখ ছবি হয়ে রয়েছে। কিন্তু আজ

২ নভেম্বর ২০১৯ সালে ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত জাতীয় সমবায় দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ বিতরণ করেন।

দেশের নদনদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। তার সাথে বাড়ছে ওয়াটার লর্ড-গণের শোষণ। ফলে বিচ্ছিন্নভাবে মৎস্যজীবীদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ হচ্ছে সমবায়। সে কাজটি করে যাচ্ছে সমবায় অধিদপ্তর। দেশের পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। সকল প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে জাতীয়, কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতির সর্বমোট সংখ্যা ১০,০৩০টি (প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা ৯,৯৫৫টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৪টি, জাতীয় সমবায় সমিতি ১টি), ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,৯০,৫২৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২,৪৯৭.৮৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫,৬৪১.১৭ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ১,৬১৪.১৭ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ সমবায় আইনে নিবন্ধিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বৃহত্তর অংশ মৎস্যজীবী। মাছ হচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রোটিন চাহিদা মিটানোর প্রধান উৎস এবং দেশের অর্থনীতিতে এর এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ও ন্যায্যমূল্যে সদস্যদের মাঝে বিতরণ, সদস্যদের কল্যাণে মৎস্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং জলমহাল অধিগ্রহণ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৪ সালের ১২ মার্চ দেশের মৎস্যজীবী সমবায়সমূহের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধন ১৩.৬৬ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২০৫.৮৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৪.১৭ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ৭৭৩.৬০ লক্ষ টাকা।

৯. মহিলা সমবায় সমিতি

সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধত্ব, ধর্মীয় গোঁড়ামিজনিত বাঁধানিষেধের বেড়াজাল, অশিক্ষা, হীনম্মন্যতা প্রভৃতি নারীদের চার দেওয়ালে বন্দি করে মানবেতর জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। নারীর তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার ছিল না। সম্পদের মালিকানা পুরোটাই ছিল পুরুষের হাতে। শিক্ষার অধিকার ছিল শুধুই পুরুষের। পারিবারিক চৌহদ্দির/ঘরের বাইরে যাওয়ার অধিকার ছিল না নারীর। খেলাধুলা-গানসহ সব রকম চিত্তবিনোদনের সুযোগ থেকে সে ছিল পুরোপুরি বঞ্চিত। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় নিষ্ঠুর সতীদাহ প্রথা উঠে গেলেও বাল্যবিবাহ, অকাল বৈধব্য, যৌতুক প্রথা, অকালমৃত্যু, স্বামীগৃহে চতুর্মুখী নির্যাতন নারীর নিত্যসঙ্গী ছিল। বাল্যবিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, স্বামীসহ পতিগৃহের সকলের সেবাকরণ, সন্তান উৎপাদন, রান্নাবান্না এসব কাজে আবদ্ধ থেকে চারদেওয়ালের মধ্যে ঘরকন্না করাই ছিল নারীর অপরিহার্য নিয়তি। নারীও যে পুরুষের মতোই পুরোপুরি মানুষ, নারীও যে সকল কাজে পুরুষের সমান উপযুক্ত, নারীরও যে পুরুষের পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাধীন পেশার অধিকার থাকা প্রয়োজন, নারীর যে সমান আত্মমর্যাদার ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ থাকা দরকার, পুরুষজাতির মগজে ও ইচ্ছায় এসব ঠাঁই পেত

না। সামাজিক-পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। মুসলমান নারীরও অবস্থা ছিল করুণ। ভয়ংকর পর্দাপ্রথা নারীকে অবরোধবাসিনীর মানবেতর বন্দি জীবনে আটকে রেখেছিল। সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বর্ণনা করেছেন : "নারীদের জীবন্ত সত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে সংস্কারবদ্ধ সমাজ তাদের দেহ ও মনকে জড়পিণ্ডবৎ করে রেখেছিল। মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষাদান নিষিদ্ধ ছিল।...তাদের বাংলা শিক্ষাদান ছিল সমাজ ও ধর্ম বিরুদ্ধ। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলিম পরিবারে কঠোর অবরোধ প্রথার প্রচলন করা হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস মুসলিম নারীর জন্য ছিল চিররুদ্ধ। ...গুরুতর রূপে অসুস্থ হলেও মেয়েদের ডাক্তার বা কবিরাজ দেখানো হতো না পর্দা নষ্ট হওয়ার ও দোজখে যাওয়ার ভয়ে।...খান্দানি এবং অর্থশালী লোকের পত্নীরা ছিল তাদের ভোগের বস্তু... আর গরিব লোকের স্ত্রীরা ছিল ক্রীতদাসীরও অধম।"

বেগম রোকেয়া ছিলেন ওপরে বর্ণিত অচলায়তন থেকে নারীর শৃঙ্খলমুক্তির অগ্রদূত। তিনি মেয়েদের ঘরে বন্দি না রেখে শিক্ষাদান করে কর্মস্থলে ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ ও প্রণোদনা দান করেছিলেন। একইসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন নারী জাগরণের কবি। তিনি নারীদের উদ্দেশ্যে লিখে গেছেন বহু কবিতা, গান ও প্রবন্ধ। নারীর ভেতরে সুপ্তশক্তিকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করে তার শুভ উদ্বোধন ঘটাতে আগুন-ঝরানো ভাষায় তিনি রচনা করে গেছেন 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গান, 'নারী' শীর্ষক কবিতা। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'নারী' কবিতায় বলেছেন,

'সেদিন সুদূর নয়-
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাইবে নারীরও জয়।'

আজ সারাদেশে এবং দেশের বাইরেও বাংলাদেশের নারীর জয়জয়কার। এক্ষেত্রে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। তবে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা গ্রামের অশিক্ষিত মায়েদের মতোই যা অগোচরে রয়ে যায় সুধীমহলের, উন্নয়ন-গবেষকদের। সমবায় সমিতিগুলো অশিক্ষিত-আধাশিক্ষিত নারীদের প্রচলিত প্রথাবদ্ধ অচলায়তনের বাইরে এনে নানা পেশায় ও ব্যবসায় সম্পৃক্ত করছে। তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের চেয়ে বেশি ঘটছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস-আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠা। 'বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির' প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি একজন গোলাপ বানু তারই উজ্জ্বলতম উদাহরণ। এমন কত গোলাপ বানু তৈরি হচ্ছে দেশের আনাচকানাচে ! পিছনে কাজ করছে হাজারো সমবায় সমিতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ের নারীর দুরবস্থাকে পুরুষের নানামুখী ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবে দেখেছিলেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথ না দেখে হতাশ হয়ে বলেছিলেন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার/কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা?' নারীকে তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার এনে দিয়েছে শিক্ষা ও সমবায়। সমবায় সমিতিগুলো নারী শিক্ষা নিশ্চিতকরণেও সক্রিয় ভূমিকা রেখে চলেছে।

মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং তাদের সকল স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে মহিলা সমবায় সমিতি। জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক মহিলা সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক বিআরডিবিভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারাদেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৯২,০২০টি এবং মোট ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,১৫,০৯,৮২৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য সংখ্যা ৮৮,৩৮,৫৯৬ জন এবং মহিলা সদস্য সংখ্যা ২৬,৭১,২২৯ জন। মোট সমবায় সমিতির মধ্যে শুধুমাত্র মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে ২৭,৩৮৮টি। এসব মহিলা সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৯,৭২,৩৪৯ জন। শুধুমাত্র মহিলা সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৯,৯৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২২,৯১৬.৪০ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ৮৯.১৭ লক্ষ টাকা। হরিদাস ঠাকুর সম্পাদিত 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় গবেষণা' গ্রন্থটি পাঠ করলে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের কার্যকারিতা।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ

নারীসমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সদস্যভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার হস্তজাত পণ্য উৎপাদন, সেলাই, অ্যাম্ব্রয়ডারি ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ ১৯৭৭ সালের মে মাসে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে ৩৯টি কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ০.০৯ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ০.১০ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ১.৫৬ লক্ষ টাকা।

১০. পরিবহণ সমবায়

পরিবহণ খাতের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রাক চালক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় টেক্সি চালক সমবায় সমিতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতি যেমন প্রাথমিক অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক ও ট্যাংক/লরি চালক সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক মটর মালিক ও শ্রমিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এ ধরনের প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সর্বমোট সমিতির সংখ্যা ১,৩৪৬টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,০৫,২২৭ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৭৬৩.৯২ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬,১০৩.০৬ লক্ষ টাকা।

১১. গৃহায়ন সমবায়

বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ছোট একটি দেশ অথচ জনসংখ্যার দিক থেকে অন্যতম বৃহত্তম (বিশ্বের অষ্টম) দেশ। ফলে আবাসনের বিষয়টি দিনদিন সমস্যা হয়ে উঠছে। অনেক মানুষ এতটুকু একখানি সুন্দর বাসার জন্য ছটফট করছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাসনা প্রকাশ করে লিখেছিলেন,

'বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন-মনে;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।'

পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও এই এতটুকু বাসা পাওয়া কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। এই সমস্যা মোকাবিলায় সরকার এবং হাউজিং কোম্পানিগুলোর পাশাপাশি অনেক সমবায় সমিতি জমি কিনে আপন সদস্যদের মাঝে প্লট ও ফ্ল্যাট সরবরাহ করছে। এটি সমবায়ের একটি সময়োপযোগী ডাইমেনশন। ঢাকাসহ বড় বড় শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমবায়ভিত্তিক গৃহনির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা লক্ষণীয়। ফলে সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি এর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ২২৮টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৫৩,৮৯৯ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩,৭৮৭.০৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬,৮৯৯.৭৪ লক্ষ টাকা। আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে ঢাকা খ্রিস্টান মেট্রোপলিটন হাউজিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইতোমধ্যেই একটি উজ্জ্বল মডেলে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন পেশার মানুষ সমবায়

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, ২০১৯ সালের জাতীয় সমবায় পুরস্কার বিতরণ করেন।

সমিতির মাধ্যমে সদস্যদের জন্য মানসম্মত আবাসন ব্যবস্থা করে চলেছেন এবং সেসব সমিতির সংখ্যা দিনদিন বেড়ে চলেছে। হয়তো একদিন গ্রাম পর্যায়েও এ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হবে।

১২. দুগ্ধ সমবায়

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'আমার সন্তান' কবিতায় অন্নপূর্ণা দেবীকে পার করার বিনিময়ে দেবীর কাছে একজন মা--ঈশ্বরী পাটুনীর প্রার্থনা ছিল, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' দেবী তা মঞ্জুর করেছিলেন : তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান/দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।' কিন্তু সেই বর বাংলার সব ঘরে পৌঁছায়নি। আমরা নজরুলের 'দারিদ্র্য' শীর্ষক কবিতাতেই সেই বঞ্চনার চিত্র দেখেছি :

> 'পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,
> দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে!- মোর অধিকার
> আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ
> পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
> আমার দুয়ার ধরি!'

কিন্তু এখন আর সেই অসহ অবস্থা নেই। আজ বাংলার ঘরে ঘরে দুধ পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে যাচ্ছে সমবায়। আর এ ধরনের সমবায়কে জাতীয় রূপ দেওয়ার এবং তার মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধশিল্পে স্বনির্ভর করার সমবায়ী স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছে। এসব সমিতির মধ্যে আছে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ। এই সমিতির উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম মিল্কভিটা। বর্তমানে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা ৩,০৮৪টি, ব্যক্তি সদস্য ১,৩২,৬০৮ জন, সমবায়ীদের অংশগত মূলধন ৪২.২৯ কোটি, সরকারি ইক্যুইটি ৪১.৫০ কোটি, সরকারি ঋণ ২৬.২০ কোটি এবং আবর্তক ঋণ ৫.০০ কোটি টাকা। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। উক্ত প্রকল্পে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৩ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন যা দিয়ে দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড' নামে নামকরণ করা হয়। মিল্কভিটা গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্কভিটা তরল দুধের পাশাপাশি ঘি, মাখন, আইসক্রিম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং, রসগোল্লা, সন্দেশ, রসমালাই ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করছে। বর্তমানে মিল্কভিটার সদস্য ৬৯টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। এই সমিতি ২০১৯-'২০ অর্থবছরে প্রায় ৪.৩০ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। ফলে সমবায়ী দুগ্ধ খামারিগণ আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মিল্কভিটার নিট লাভ ছিল ১৫.১১৮৮ কোটি টাকা, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১৫.৮১৯৬ কোটি টাকা, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৭.১২০৭ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ বছরে তা ৪.২২ কোটি টাকায়, ২০১৭-২০১৮ সালে ৩.৫৩৪৫ কোটি টাকা এবং ২০১৮-২০১৯ বছরে ২.৭৮৯৭ কোটি টাকায় নেমে আসে। ২০১৯-২০২০ বছরে তা ১.১১৬৪ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৭ কোটি প্রায়। দুধের প্রয়োজনীয়তা ও বাজার দুই-ই অনেক বড়। লাখ লাখ মানুষ গরু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এনে দিতে হলে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-কে আরও বেশি বেগবান, আরও বেশি বিস্তৃত, আরও বেশি লাভজনক করে তোলা ছাড়া পথ নেই। সমবায় অধিদপ্তর সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ-কে সকল প্রকার সাপোর্ট ও সহযোগিতা দিয়ে আসছে। এটি অচিরেই প্রত্যাশিত সাফল্য লাভে সক্ষম হবে বলে আমরা আশা করি।

১৩. বিমা সমবায়

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ নামে দুটি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত। এক্ষেত্রে আরও অনেক সমবায় সমিতি গড়ে ওঠার অবকাশ আছে। বিশেষত প্রবাসী কর্মী এবং প্রবাস ফেরত কর্মীদের জন্য এ ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করা যেতে পারে। সমবায় অধিদপ্তর বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে।

ক. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আশির দশকের মাঝামাঝি সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বিমা ব্যবস্থা পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা প্রসূত নিরলস প্রচেষ্টায় সমন্বিত কার্যকর সহযোগিতার ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০১, শেয়ার মূলধন ৬৩.৭৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৭৮.৮৮ লক্ষ টাকা।

খ. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ

সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা

বিধানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লিঃ' নামে এ সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬০৯, শেয়ার মূলধন ৮.৫৬ লক্ষ টাকা।

১৪. সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়

গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক এবং আরও কিছু এনজিও দাবি করে আসছে যে তারাই দেশে ক্ষুদ্র ঋণ চালু করেছে। অথচ এ কাজটি ব্রিটিশ আমলেই শুরু করেছিল সমবায় ব্যাংকগুলো। আসলে ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক ব্যাংকিং ও ঋণদান ব্যবস্থার প্রচলনের সাথে জড়িয়ে আছে সমবায়। আর সেই ব্যাংকগুলোই শিখিয়েছে কীভাবে সঞ্চয়কে বাড়তি লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করতে হয়, কীভাবে শোধ করতে হয় ঋণের কিস্তি। আমাদের কাছ থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে নেপালের সমবায়ীরা সেদেশে চালু করেছে সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি। তাদের সাফল্য এখন ঈর্ষণীয়। বাংলাদেশে প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ১২,৩৮১টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১৪,৪২,৫১৩ জন। এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্ব) নামে একটি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। কাল্ব-এর সদস্য সংখ্যা ৮১০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধন ৩২১.৯০ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,১৮৬.৩৪ কোটি টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ২৯.৭৭ কোটি টাকা।

১৫. আশ্রয়ণ সমবায়

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভুক্ত কর্মসূচি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজারে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত উপকূলীয় অঞ্চল পরিদর্শনে যান এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারগুলোকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-'০২) মেয়াদে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭,২১৫টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-'১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে প্রায় ৫৮,৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। এ পর্যন্ত ৩টি ফেইজে মোট ৪ লক্ষ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। সারা দেশে জুন/২০ পর্যন্ত ১,৪৭০টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে, সদস্য সংখ্যা ১,৫৯,৬৮২ জন, শেয়ার মূলধন ১০৪.৭৯ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫৪০.৪০ লক্ষ টাকা।

১৬. পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি

একজন মনীষী মন্তব্য করেছেন যে, যদি পৃথিবীতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তবে তা হবে পানি নিয়ে। নদীগুলো মরে যাওয়া, দিনদিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া, ভূগর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বর্জ্য নিষ্কাশন প্রভৃতি কারণে নদী-সমুদ্র-ভূগর্ভস্থ পানি মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে ওঠার ফলে পানিসংকট প্রকটতর হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় সুপরিকল্পিত ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে দেশের পানি ও পানিসম্পদের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আর এক্ষেত্রে সমবায় হতে পারে একটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

পানিসম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্রবিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূউপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের বিধিবদ্ধ কার্যাবলি নিয়মিত তদারকি করে থাকে। জুন ২০২০ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৩৩৮টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৪,৪২,৯১১ জন, শেয়ার মূলধন ৯০৩.২৫ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৪,৪২৩.৩৫ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধন ৭,০৫৩.৪৬ লক্ষ টাকা।

১৭. করোনা মহামারি মোকাবিলায় সমবায় সমিতির কার্যক্রম

২০২০ সালের প্রায় শুরু থেকে নতুন করোনা ভাইরাস (SARS-Cov2) বা কোভিড-১৯ এ যখন পুরো বিশ্ব টালমাটাল তখন এদেশের সমবায় সমিতিগুলো শুধু নিজেদের টিকিয়ে রাখতেই সমর্থ হয়নি, অধিকন্তু আর্তমানবতার সেবায় সফলভাবে এগিয়ে এসেছে। এ সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৯৭৭টি সমবায় সমিতি করোনা মহামারির প্রথম ৪ মাসে প্রায় ১,৯৬,৪৩৪ (এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশ চৌত্রিশ) জন দুর্গত সদস্যদের মাঝে প্রায় ৯,৪৩,৬৯,২৮০ (নয় কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশ আশি) টাকার ত্রাণ বিতরণ করেছে। বর্তমানে এর পরিমাণ আরও অনেক বেশি যদিও তার সঠিক হিসাব এখনও পাওয়া যায়নি। এছাড়াও ঢাকার বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ তাদের সদস্যদের প্রায় ৬ কোটি টাকা ঋণের সুদ মওকুফ করেছে। অধিকন্তু সমবায় সমিতিগুলো করোনায় আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আসছে। সমবায় সমিতিগুলো নিজ সদস্যদের মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং প্রয়োজনে হাইব্রিড সরবরাহ করছে। তারা সদস্যদের করোনা মহামারি মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করছে এবং আক্রান্ত সদস্যদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করছে। সমবায়ের মূলনীতি 'সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে',- এটি এই করোনা মহামারিকালে নতুন করে দেখতে পাচ্ছি আমরা।

- **সমবায় অধিদপ্তরের বিশেষ কিছু কার্যক্রম**

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সমবায় অধিদপ্তর উপজেলা বাস্তবায়ন টাস্ক ফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমিতি গঠন ও নিবন্ধন করে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠপর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদেরকে নিয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। উক্ত ঋণ ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০ হাজার পুনর্বাসিত পরিবারের অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্য ৫০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। ঋণ আদায় ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমগুলোকে ঋণ আদায়ের মাসিক অগ্রগতি, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দের সাথে ২০১৯ সালের জাতীয় সমবায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সমবায় সমিতির সমবায়ীগণ।

(ত্রৈমাসিক), অডিট অগ্রগতি প্রতিবেদন, অভিযোগ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয় ভাগ করে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

- **বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে গৃহীত সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ**

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনার পথ ধরে সমবায় অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে সমবায় সমিতিগুলো নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের সমস্যা সমাধান ও ভাগ্যোন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে যার সংক্ষিপ্তসার ওপরে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতা এই যে এগুলো সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সমবায়ীদের উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক নয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসিয়ালি শেষ হওয়ার পর তা রিভলভিং ফান্ডের সহায়তায় চলতে থাকে এবং প্রয়োজনে নতুন নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিশেষত্বের কারণে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ তাদের নির্বাচনি এলাকায় সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। তেমন কয়েকটি প্রকল্পের কথা এখানে তুলে ধরা হলো :

ক. বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

১. উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০১৬ হতে ৩০/৬/২০২১ ; প্রকল্প ব্যয় : ১৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে।

২. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০১৬ হতে ৩০/৬/২০২১; প্রকল্প ব্যয় : ২৩ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩. আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসেবে 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়ন'; প্রকল্পের নৃতাত্ত্বিক কম্পোনেন্টের মেয়াদ : ১/৭/২০১৬ হতে ৩০/৬/২০২১; নৃতাত্ত্বিক কম্পোনেন্টের ব্যয় : ৪০ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে।

খ. ২০২০-'২১ অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পসমূহ

১. 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প'; প্রকল্পের মেয়াদ: ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২২; প্রকল্প ব্যয় : ৪৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। প্রকল্পটি ২০২১ সালের ১ জুলাই থেকে বাস্তবায়ন হবে।

২. দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যশোর ও মেহেরপুর জেলায় সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৩; প্রকল্প ব্যয় : ৪৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ২০২১ সালের ১ জুলাই থেকে বাস্তবায়ন শুরু হবে।

৩. দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয় : ১৫৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি একনেকের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

৪. সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের ভেল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয় : ১২১ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা।

৫. সমবায়ের মাধ্যমে হাওড় অঞ্চলে বিকল্প জীবনযাত্রা সৃষ্টি প্রকল্প; প্রকল্পের মেয়াদ : ১/৭/২০২০ হতে ৩০/৬/২০২৪; প্রকল্প ব্যয় : ১৮০ কোটি ০৭ লক্ষ টাকা।

- **বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

১. সমবায় সেক্টরে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা ও পণ্য পৌঁছানো;

২. সমবায়ীদেরকে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ দিয়ে বিশেষায়িত পণ্য

ও সেবার ক্ষেত্রে দক্ষ করে গড়ে তোলা;

৩. আন্তঃসমবায় সহযোগিতার মাধ্যমে সমবায় মূলনীতির বাস্তবায়ন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সমবায়ীদের অনলাইন প্লাটফর্মে এনে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার লিংকেজ গড়ে তোলা;

৪. নতুন নতুন ক্ষেত্রে (যেমন: গার্মেন্টস সেক্টর, প্রবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য পতিত জমিতে কৃষি উৎপাদন, স্কুল কো-অপারেটিভ, ট্যুরিজম কো-অপারেটিভ, হেলথ কো-অপারেটিভ ইত্যাদি) সমবায়কে নতুন আঙ্গিকে সম্প্রসারণ।

- **চলমান এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের শিক্ষা থেকে সমবায় সেক্টরে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ**

১. সমবায় অধিদপ্তরের বিদ্যমান দুগ্ধ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা নিয়ে সারাদেশে দুগ্ধ সেক্টরের উন্নয়নে চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা এবং চরাঞ্চলে এসব প্রকল্পের আওতা বৃদ্ধি করা।পাশাপাশি গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন ও মহিষ পালন প্রকল্প গ্রহণ;

২. ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত গারো প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় দেশের অন্যান্য জেলায় এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা এবং তাদের পেশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায়ভিত্তিক ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ;

৩. উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা এবং এর আওতায় প্রতিটি জেলায়/বিভাগে শো-রুম স্থাপন এবং মার্কেটিং লিংকেজ স্থাপন;

৪. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের জন্য প্রকল্পভিত্তিক কৃষি সমবায় সমিতি গঠন করা এবং গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে সদস্যদর মাঝে আধুনিক যন্ত্র ও প্রযুক্তি সরবরাহকরণ;

৫. সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ সহ জাতীয় পর্যায়ের সমবায় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণের জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৬. সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ (বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি/ আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহ) ও মাঠপর্যায়ের সমবায় অফিসসমূহকে শক্তিশালী করার জন্য অবকাঠামোসহ আধুনিক সুবিধা নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ এবং

৭. আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজড করা এবং সকল সেবা অনলাইনে প্রদানের জন্য অধিদপ্তরসহ সমবায় সংগঠনসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন; সেটি বাস্তবায়নে সমবায় হবে অন্যতম প্রধান মাধ্যম এবং গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

৮. হিজড়া, বেদেসহ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বড় আকারের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ।

আমরা সবাই জানি, জাতির পিতা ছিলেন পুঁজিবাদী শোষণের বিপক্ষে। আশার কথা, সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদের প্রবল আগ্রাসনের মুখে সমবায় এখন নতুন করে সাড়া জাগিয়েছে সারাবিশ্বে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট জনসংখ্যার ৪০%, কানাডায় ৩৩% এবং সিংগাপুরে ২৫% মানুষ সমবায়ের সাথে জড়িত। বিশ্বে ১০ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান করেছে সমবায়। ফ্রান্স, জাপান, কোরিয়ায় ৯০% কৃষক হচ্ছেন সমবায়ী : নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় ৯০% ডেইরি পণ্য সমবায়-ভিত্তিতে উৎপাদিত; জাপানে ভোক্তা সমবায় সমিতি (Consumers Cooperatives) সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ যার ৯০% মহিলা; ইউরোপে সমবায়ীর সংখ্যা ১৪ কোটি মানুষ; সেখানে ৩ লাখ সমবায় সমিতি ২৩ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান করেছে;

ভারতে White Revolution সৃষ্টিকারী Gujarat Co- operative Milk Marketing Federation Ltd. (GCMMF) হচ্ছে সেদেশের বৃহত্তম খাদ্যপণ্য বাজারজাতকরণ অর্গানাইজেশন যার পণ্যের ব্র্যান্ড নাম 'আমূল' এবং যা ভারতকে পৃথিবীর বৃহত্তম দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনকারী দেশে উন্নীত করেছে। বাংলাদেশেও সমবায় দিনদিন অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জুলাই ২০০৯ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১১ বছরে ১,৩৯,৪৯৯টি নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে। উন্নয়নের পন্থা হিসেবে এটি সমবায়ের উজ্জ্বল ভূমিকার স্বাক্ষর বহন করে।

জাতির পিতার সোনার বাংলা হচ্ছে দারিদ্র্যমুক্ত, শোষণমুক্ত, বঞ্চনামুক্ত, কুসংস্কারমুক্ত, নারী-পুরুষের সমঅধিকারে সমুন্নত আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গ্রাম বাংলা। জাতীয় কবি, বেগম রোকেয়া, জাতির পিতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ও সম্পূরক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে সমবায় অধিদপ্তর ও সমবায়ীগণ। সেদিন সুদূর নয় যেদিন বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশের কাতারে শামিল হবে। বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি গ্রাম হয়ে উঠবে এক একটি ক্ষুদ্র সোনার বাংলা। সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে সমবায় অধিদপ্তর। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় উজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ সমবায় ও সমবায় অধিদপ্তর। বিজয় আমাদের নিশ্চিত।

মোঃ আমিনুল ইসলাম : প্রাক্তন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা এবং টেকসই উন্নয়ন

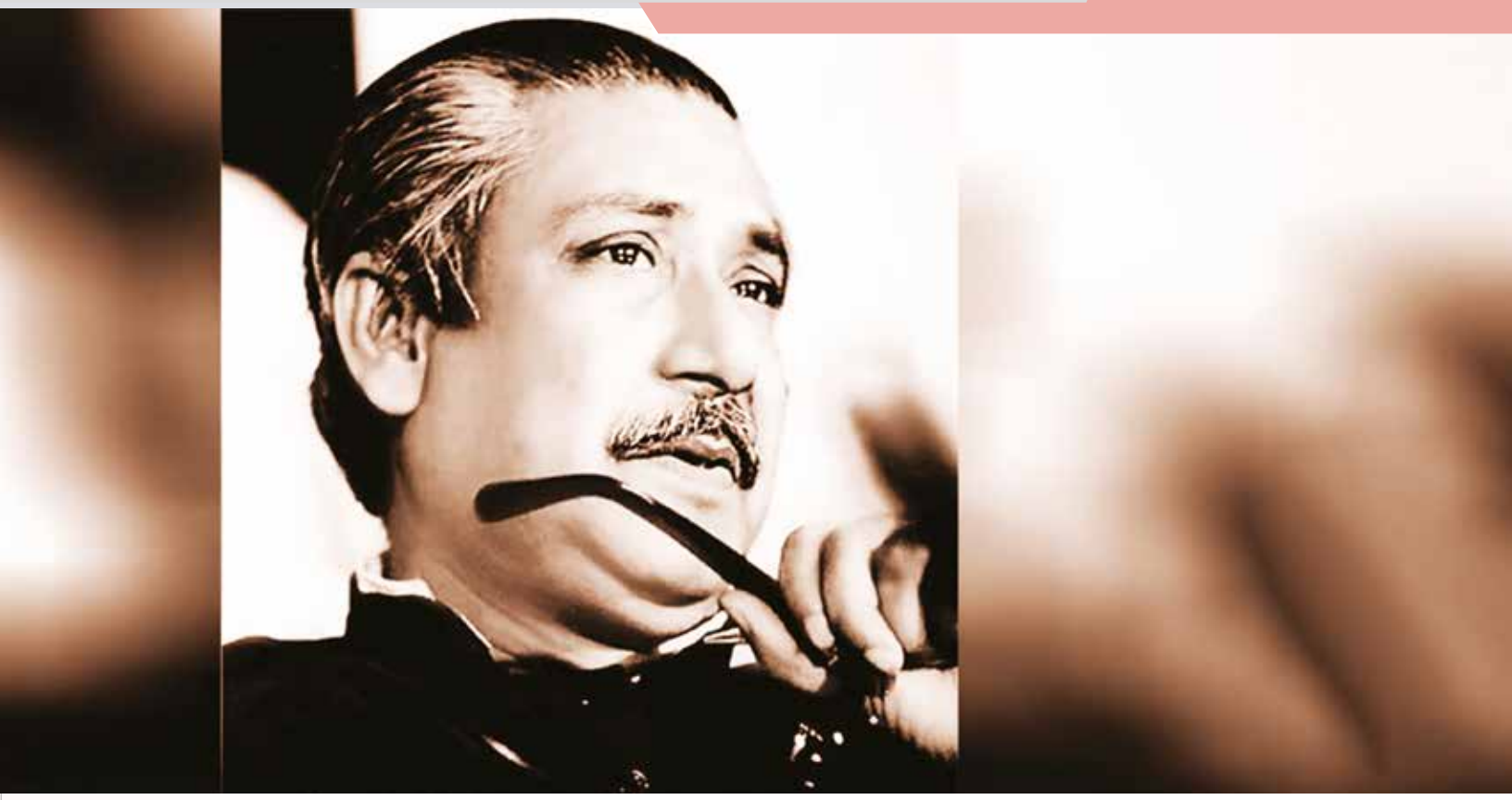

ড. আতিউর রহমান

বঙ্গবন্ধু আজীবন সাধারণের কল্যাণ ভাবনায় অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। একেবারে ছেলেবেলা থেকে তিনি গরিব-দুঃখী মানুষের দুঃখের সমব্যথী ছিলেন। তাই তাদের ভাগ্যোন্নয়নে চিরকাল নিজেকে নিবেদিত রেখেছেন। তবে একই সঙ্গে তিনি খুবই বাস্তববাদী ছিলেন। কৃষক, শ্রমিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করেই এ কথাটি বলা আছে। তবে একই সঙ্গে ব্যক্তিখাত ও সমবায় খাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রীয়, সমবায় ও ব্যক্তিখাতের মালিকানায় থাকবে উৎপাদনের উপায়সমূহ। সমবায় ব্যবস্থার প্রতি বঙ্গবন্ধুর দুর্বলতা সংবিধান রচনার আগেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত 'সমবায় সম্মেলন'-এ বঙ্গবন্ধু তাঁর সমবায় ভাবনার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেন, "সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একই ভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-

বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ। সমাজতন্ত্র স্থাপনের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই সমস্ত বড় শিল্প, ব্যাংক, পাটকল, চিনিকল, সুতাকল ইত্যাদি জাতীয়করণ করেছি। জমির সর্বোচ্চ মালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছি। আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার।

কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে এক সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা।

আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভুয়া সমবায় কোনোমতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলোকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করেছি যে সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারি স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে আমরা সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করে দেব। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুসম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।

বাংলাদেশ সমবায় সংস্থার বিভিন্ন স্তরে বহুবিধ অব্যবস্থা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি দীর্ঘদিন ধরে জমে জমে দুর্নীতির পাহাড় তৈরি হয়েছে। সমবায় সংস্থার অবাধ বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে দুর্নীতির জগদ্দল পাথরকে সরাতেই হবে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থে পরিচালিত প্রশাসনব্যবস্থাকে দুর্নীতির নাগপাশ থেকে মুক্ত করে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচকানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।

আমাদের সংঘবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'। এ দায়িত্ব সমগ্র জাতির, প্রত্যেক সাধারণ মানুষের এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের। তবেই আমার স্বপ্ন সার্থক হবে, সার্থক হবে শহিদের আত্মত্যাগ, সার্থক হবে মাতার অশ্রু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে। জয় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন। জয় বাংলা।" (সূত্র : ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এফএফডিএফ) ওয়েব সাইট)]

এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার গড়ে তুলে 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারের ১৩ কোটি ১২ লাখ টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। দেশের সবাই যেন সহজলভ্যে দুগ্ধসেবা পায় তাই ছিল বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য। পরবর্তীতে এর নামকরণ হয় 'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)। মিল্ক ভিটার অধীনে বাংলাদেশের তরল দুধের ৭০ শতাংশ বাজার দখলে রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগে কোম্পানিটির কারখানা রয়েছে। (সূত্র- উইকিপিডিয়া)

তৎকালীন আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বঙ্গবন্ধুর সমবায়-প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়ন হতে পারেনি। সমবায় গ্রাম প্রতিষ্ঠার আগে বঙ্গবন্ধু ভূমিসংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। স্বাধীনতার আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু জানতেন এ দেশের জমিগুলো বেশিরভাগই জোতদারদের হাতে। অনেক জমি অনাবাদি পড়ে থাকে, কিছু জমি পতিত। আর কিছু জমি দেশভাগের পর থেকেই 'অর্পিত সম্পত্তি' হিসেবে গণ্য। ভূমির সুসম বণ্টনের জন্য ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে ভূমিস্বত্ব আদেশ জারি করেন। তাতে পরিবারপিছু সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা সিলিং আরোপিত হয়। এর অতিরিক্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সরকার অধিগ্রহণ করবে। কিন্তু, সরকারের নিজ দলের ভিতরেই প্রতিরোধের কারণে এই আদেশ কার্যকর সম্ভবপর হয়নি। কারণ, '১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ধনী কৃষক, তাদের মোট জমির পরিমাণ ১০০ বিঘার বেশি ছিল। তারা বঙ্গবন্ধুর ভূমিসংস্কারের বিরোধিতা করেন। বিবাহিত পুত্রদের আলাদা বাড়িঘর গণ্য না করাকে তারা অযৌক্তিক মনে করেন।' (বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম, নজরুল ইসলাম, পৃষ্ঠা- ২৬)

ফলে এই আইনের মাধ্যমে খুব সামান্য জমি উদ্ধার করে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হয়। নজরুল ইসলাম মনে করেন, ভূমিসংস্কারের বদলে সমবায়ভিত্তিক যৌথ চাষের যে প্রস্তাব বঙ্গবন্ধু করেন, তা রাজনৈতিকভাবে আপসমূলক হলেও এটি ছিল অধিক বাস্তবসম্মত। বাংলাদেশে মোট আবাদি জমির পরিমাণ এত কম যে বাধ্যতামূলক সিলিং আরোপ করে যে উদ্বৃত্ত জমি মিলবে, সব ভূমিহীনের মধ্যে তা বণ্টন অসম্ভব। তা ছাড়া বণ্টিত জমির আয়তন ক্ষুদ্র হওয়ায় তা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে না, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জমির নতুন মালিক প্রতিবেশী জোতদারের কাছে তা বিক্রি করতে বাধ্য হবেন। এই অবস্থায় একটি বাস্তবসম্মত সমাধান হতে পারে জমির যৌথভিত্তিক চাষাবাদ।

অর্থাৎ ভূমিসংস্কার বঙ্গবন্ধু যখন করতে পারলেন না তখন তাঁকে বাধ্য হয়েই যেতে হলো সমবায় আন্দোলনে। আর সমবায় আন্দোলন বললেই হয়ে যায় না। এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তাই ১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ তিনি দিলেন দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক। দ্বিতীয় বিপ্লব মূলত বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে বাধ্যতামূলক কো-অপারেটিভ গঠন করার প্রচেষ্টা।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের চতুর্থ বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণা দেন। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন, "সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি

আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব। তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান- এই বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ- এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ- যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে কো-অপারেটিভ-এর সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেওয়া হবে, তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে।" (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খণ্ড, ড. এ এইচ খান, পৃষ্ঠা-১৮৭)

পুরো ভাষণটিতেই বঙ্গবন্ধু সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। এ ভাষণটি সম্পূর্ণ পাঠ না করলে কিংবা না শুনলে বুঝা যাবে না দেশজাতি নিয়ে তিনি কতবড় স্বপ্ন দেখতেন। শুধু স্বপ্ন দেখেই ক্ষান্ত ছিলেন না, দলবল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছিলেন, কাজে নেমে পড়েছিলেন। শিক্ষিত তরুণদের প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন, "আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফপ্যান্ট করতে হবে। পায়জামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে। যুবক চাই, ছাত্র চাই, সকলকে চাই। " (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খণ্ড, ড. এ এইচ খান, পৃষ্ঠা-১৮৯)

উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, "গ্রামের প্রত্যেকটি কর্মঠ মানুষ এই বহুমুখী সমবায়ের সদস্য হবে। যার যার জমি সে-ই চাষ করবে, কিন্তু ফসল ভাগ হবে তিন ভাগে- কৃষক, সমবায় ও সরকার।" এই গ্রামীণ সমবায়কে তিনি নতুন গ্রাম সরকার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁদের হাতেই উন্নয়ন বাজেটের অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হবে, ওয়ার্কস প্রোগ্রামও থাকবে তাদের হাতে। তিনি বলেছিলেন, "এরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে একসময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের টাউটদের বিদায় দেওয়া হবে।"

এই সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তিনি জানতেন গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো মধ্যস্বত্বভোগী 'টাউট'দের কাছে কতভাবেই না শোষিত হচ্ছিলেন। এটা সম্ভব হচ্ছিল সাধারণ মানুষের ভিতরে ঐক্যের অভাবের কারণে। মানুষ একা একা থাকলেই এই সুবিধাবাদী গোষ্ঠী তাদের পেয়ে বসে। যেহেতু গ্রাম-বাংলাকে তিনি নিবিড়ভাবে দেখেছেন তাই এই সত্যের সন্ধান তিনি যথার্থই পেয়েছিলেন। ঠিক যেমনটি পেয়েছিলেন আরেক শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পূর্ব বাংলার জমিদারি পরিচালনা করতে এসে তিনি দুঃখী কৃষককুলকে খুবই কাছ থেকে দেখেছিলেন। আর তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন "মানুষ খাটো হয় কোথায়? যেখানে সে দশজনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পরের মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা-মানুষ টুকরা মাত্র।" (সমবায়নীতি, রবীন্দ্রসমগ্র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৩)

..."আজ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া ছাড়া হইয়া নিজের নিজের দায় একলা বহিতেছি।" (সমবায়নীতি, রবীন্দ্রসমগ্র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪)

..."মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে একত্র বাস করতে চায়। একলা-মানুষ কখনোই পূর্ণমানুষ হতে পারে না; অনেকের যোগে তবেই সে নিজেকে ষোল-আনা পেয়ে থাকে।"(সমবায়-২ রবীন্দ্রসমগ্র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৭)

...অবশেষে একদিন দুর্বলকে এই কথা মনে আনতে হবে যে, "আমাদেরই বিচ্ছিন্ন বল বলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে বল দিয়েছে। বাইরে থেকে তাকে আক্রমণ করে তাকে ভাঙতে পারি, কিন্তু তাকে জুড়তে পারি নে; জুড়তে না পারলে কোনো ফল পাওয়া যায় না। অতএব আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সকলের কর্মশ্রমকে মিলিত ক'রে অর্থশক্তিকে সর্বসাধারণের জন্য লাভ করা। একেই বলে সময়বায়নীতি। এই নীতিতেই মানুষ জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়েছে, লোক-ব্যবহারে এই নীতিকেই মানুষের ধর্মবুদ্ধি প্রচার করছে। এই নীতির অভাবেই রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে-পৃথিবী জুড়ে মানুষের এত দুঃখ, এত ঈর্ষা, দ্বেষ, মিথ্যাচার, নিষ্ঠুরতা, এত অশান্তি।" (সমবায়নীতি, রবীন্দ্রসমগ্র, চতুর্দশ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৮)

মনে হয় বিশ্বকবির স্বপ্নের বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছিলেন আমাদের জাতির জনক রাজনীতির অমর কবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, আর তারা অশিক্ষিত ও দরিদ্র। তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি পুরো গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে হাত দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতের জন্য যে ধরনের প্রণোদনা দরকার তাও ছিল। কিন্তু সবাই মিলে যৌথ খামারের অংশীদার করার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। হয়তো ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থায় আরো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটত। কিন্তু সেই নিরীক্ষার তিনি 'সুযোগ'ই পেলেন না। ঘাতকরা মাঝ পথেই তাঁর স্বপ্নের সেই অভিযাত্রা হঠাৎ স্তিমিত করে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সমবায়ের যে সম্মিলনের চেতনা আজও তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি। বিশেষ করে কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণে এই ব্যবস্থা এখনো কার্যকর হবার দাবি রাখে।

'কাউকে পিছনে ফেলে এগোনো যাবে না' চলমান টেকসই উন্নয়ন ভাবনার এই মূলনীতির সাথে বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার সরাসরি সংগতি খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। বাংলাদেশ এখন অন্তর্ভুক্তিমূলক টেকসই উন্নয়নের মহাসড়কে। টেকসই উন্নয়নের এই অভিযাত্রায় নিশ্চয় বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনার মূল অনুভব সর্বদায় আমাদের সচেতন ও সক্রিয় রাখবে।

ড. আতিউর রহমান : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

বঙ্গবন্ধুর সমবায় ভাবনা এবং আমাদের দায়বদ্ধতা

মোঃ আসাদুজ্জামান

বাংলাদেশের বর্তমান ভূখণ্ডে আনুষ্ঠানিক সমবায়ের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯০৪ সালে ঔপনিবেশিক আমলে। অব্যাহত শোষণে ঋণ জর্জরিত এবং খরা কবলিত কৃষকদের মাঝে সৃষ্ট অসন্তোষ ও সংঘাত এড়ানোর কৌশল হিসেবে ঋণদান সমবায়ের সূচনা করে সমস্যার তখন একটি ক্যারিশমেটিক সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পাকিস্তান আমলে সমবায়ের তুলনামূলক বিস্তৃতি ঘটলেও এর ভূমিকা মূলত ঋণ প্রদান এবং উপকরণ সরবরাহের প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যম হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে। সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সুসম বণ্টন ও বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক সুশাসন নিশ্চিতকল্পে অংশগ্রহণমূলক টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে সমবায় পদ্ধতিকে ব্যবহারের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

সে লক্ষ্যে প্রথমেই তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৩ (খ) অনুচ্ছেদে দেশের উৎপাদনযন্ত্রের উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালিসমূহের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায়ী মালিকানাকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মালিকানা খাত হিসেবে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি প্রদান করেন।

১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত 'সমবায় সম্মেলন'-এ বঙ্গবন্ধু তাঁর সমবায় ভাবনার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে বলেন "সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম

বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে।...সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ"।

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের চতুর্থ বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের ঘোষণা দেন। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, "সমাজব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই—যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাবো। তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান—এই বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ-এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ—যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে কো-অপারেটিভ-এর সদস্য হতে হবে। এগুলি বহুমুখী কো-অপরেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কাস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেওয়া হবে, তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে।" (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খণ্ড, ড. এ এইচ খান, পৃষ্ঠা-১৮৭)

উক্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, "গ্রামের প্রত্যেকটি কর্মঠ মানুষ এই বহুমুখী সমবায়ের সদস্য হবে। যার যার জমি সে-ই চাষ করবে, কিন্তু ফসল ভাগ হবে তিন ভাগে- কৃষক, সমবায় ও সরকার।" এই গ্রামীণ সমবায়কে তিনি নতুন গ্রাম সরকার হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁদের হাতেই উন্নয়ন বাজেটের অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হবে, ওয়ার্কস প্রোগ্রামও থাকবে তাদের হাতে। তিনি বলেছিলেন, "এরা মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে একসময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের টাউটদের বিদায় দেওয়া হবে"। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সত্যিকারের অংশগ্রহণমূলক যৌথ মালিকানাভিত্তিক স্তর সংযোজন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বরণের মধ্য দিয়ে তাঁর মানবিক দর্শনেরও অপমৃত্যু ঘটে। সমাজতন্ত্র, বাকশাল, একদলীয় শাসন ইত্যাদি তকমা লাগিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শনের আর কোনো বাস্তব প্রয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

প্রশ্ন হলো, বঙ্গবন্ধুর সমবায় দর্শন বাস্তবায়নে কি সত্যিই সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োজন? বর্তমান রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কি এর প্রাসঙ্গিকতা নেই? বাংলাদেশের বিদ্যমান কৃষি ও পল্লী অর্থনীতির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

বিগত ১২ বছরে বাংলাদেশে প্রভূত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এতৎসত্ত্বেও এখনো প্রায় ২০% লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। এ দারিদ্র্যের হার শহরের তুলনায় পল্লী এলাকায় বেশি। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০% গ্রামে বাস করে। প্রায় ৬০% লোক এখনো কর্মসংস্থান এবং জীবিকায়নের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়নে গড়ে প্রায় ২০/২৫ হাজার লোক বসবাস করে। দেশের ভূখণ্ডের প্রায় ৯০ শতাংশ নিয়ে পল্লী এলাকা গঠিত। প্রায় ৯০ শতাংশ ভূখণ্ডে বসবাসকারী ৭০ শতাংশ লোক এর স্বার্থ দেখাশোনার জন্য সরাসরি অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ। এ বিশাল ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক এবং মানবসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের সক্ষমতা, জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতার নিরিখে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের চরম দুর্বলতা রয়েছে।

জাতির পিতার সুযোগ্য উত্তরসূরি জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ দেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর দর্শন লালন করে অংশগ্রহণমূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে বারবার গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও সেগুলোর স্থায়িত্ব রক্ষার্থে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনও গড়ে উঠেনি। তাছাড়া এসব উদ্যোগের মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয়েরও অভাব রয়েছে। ফলে এক দিকে যেমন সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না তেমনি সেবা প্রত্যাশী সকল জনগণকে এর আওতাভুক্ত করা যাচ্ছে না।

অধিকন্তু চলমান বিভিন্ন উদ্যোগের অধিকাংশই আর্থিক বিষয় কেন্দ্রিক হওয়ায় সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ অনেকাংশে উপেক্ষিত রয়ে গেছে। কিন্তু একটি দেশের জনগণের উন্নয়ন মানসিকতা, সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক চিন্তাশক্তি, সামাজিক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, দেশ প্রেম, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধ এবং সেবা গ্রহণ ও সেবা দানের জন্য দায়িত্বশীল আচরণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন সহজ করে, সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং সর্বোচ্চ ফলাফল পাওয়া যায়। বর্তমানে পল্লী এলাকায় মানবসম্পদসহ যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে তার অনেকাংশ অপচয় হচ্ছে এবং অব্যবহৃত রয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় উদ্বুদ্ধকরণ, তথ্য ঘাটতি এবং দক্ষতা ও প্রযুক্তির অভাবে।

মাঠপর্যায়ে জাতিগঠনমূলক এবং সেবাদানকারী সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাগণেরও ক্ষেত্রবিশেষে উপযুক্ত দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভাব রয়েছে এবং সেবা পৌঁছানোর জন্য কাঠামোগত দুর্বলতার কারণে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সেবা প্রদান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে সেবাদানকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা যেমন প্রয়োজন তেমনি সেবা পৌঁছানোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোরও উন্নয়ন প্রয়োজন। লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ভূমি ঘাটতির দেশে বহু জমি অনাবাদি বা আধা আবাদি রয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার পুকুর রয়েছে যেখানে কোনো মাছ চাষ হয় না, শত শত মাইল রাস্তা যার দু'পাশে কোনো ফলজ গাছ নেই, লক্ষ লক্ষ বাড়ির আঙিনা যেখানে কোনো সবজি চাষ হয় না, কোটি কোটি কর্মঘণ্টা নষ্ট করছে জনগণ যার বিপরীতে কোনো উৎপাদন নেই। মাঠপর্যায়ের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ অলস সময় কাটাচ্ছে অথচ সেবা প্রত্যাশী জনগণ সে সেবা বিষয়ে মোটেও অবহিত নয়। প্রতিদিন বহু মামলা, বিবাদ সৃষ্টি হচ্ছে, বহু মহিলা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, বহু কিশোর যুবক মাদকাসক্ত হচ্ছে, বহু ছাত্রছাত্রী লেখাপড়ার পিছনে সময় এবং অর্থ ব্যয় করে বেকারের সংখ্যা বাড়াচ্ছে উপযুক্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের অভাবে।

প্রায় ১৭ কোটি লোকের অপার সম্ভাবনার এই উন্নয়নশীল দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে উন্নয়নের ডাক দিয়েছেন যার আওতায় তিনি "দেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি থাকবে না" মর্মে নির্দেশনা দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে এসব কর্মসূচির সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে উন্নয়নমুখী সামাজিক আন্দোলন। যা প্রকারান্তরে বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় গ্রামের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে মুজিব শতবর্ষে জাতির পিতার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান

প্রদর্শনের অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবায় গ্রাম ধারণা ও বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারের বিশেষ অঙ্গীকার আমার গ্রাম—আমার শহর ধারণায় গ্রামের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে গ্রামীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও সুসম ব্যবহার নিশ্চিত করা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, জৈব জ্বালানির ব্যবহার, যোগাযোগ ও বাজার অবকাঠামো সৃষ্টি, স্বাস্থ্য-শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে সকল সেবা সহজলভ্য করা ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে শহরমুখী স্থানান্তরের প্রবণতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শনের আদর্শিক অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবে 'বঙ্গবন্ধুর গণমুখী সমবায় ভাবনার আলোকে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রাম' প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হলো যৌথ উদ্যোগে পল্লীর প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা; মধ্যম আয়ের দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে উন্নত দেশের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অনুশীলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করা; প্রয়োজনীয় টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে গণমুখী সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি ও গতিশীলতা আনয়ন করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি এ প্রস্তাব অনুমোদন করে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রতিটি ইউনিয়নে বসবাসকারী প্রায় ২০/২৫ হাজার অধিবাসীর প্রত্যাশা পূরণের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে একটি বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব করা হয়েছে যা হবে যৌথ মালিকানাধীন এবং অংশগ্রহণমূলক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠান জনগণ এবং উপজেলা পর্যায়ের সেবা দানকারী বিভাগসমূহের সাথে সেতু বন্ধন স্থাপনের দায়িত্ব পালন করবে। সে লক্ষ্যে এ সমবায় প্রতিষ্ঠানের গঠন, উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে স্থানীয় সম্ভাবনা এবং সমস্যার আলোকে সরকারি সেবা এবং সম্পদ বণ্টন সহজ হবে ও সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতাও নিশ্চিত করা যাবে। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটি ০৮টি বিভাগের নির্বাচিত ১০ টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। এ পরীক্ষা সফল হলে, ভবিষ্যতে বিদ্যমান ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের গঠন এবং কার্যাবলি সংশোধন করে পুনর্গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রমসমূহ

ক) কম্পোনেন্ট-১

সার্ভে পরিচালনা : প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রথম ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচিত গ্রামে উপকারভোগী নির্বাচনে বেইজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প শেষ হওয়ার ৩ মাস পূর্বে Endline Evaluation পরিচালনা করা হবে। পেশাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ দুইটি সার্ভে পরিচালনা করা হবে।

খ) কম্পোনেন্ট-২

সমবায় সমিতি গঠন : নির্বাচিত গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে ১টি করে মোট ১০টি গ্রাম বহুমুখী সমবায় গঠন করা হবে।

১) সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সরকারি প্রতিনিধি ও সমিতির সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

২) এই সমবায় সমিতির কার্যক্রমে গতিশীলতা রক্ষায় একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে যার প্রধান হবেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং নির্বাচিত অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণ উপদেষ্টা কমিটিতে থাকবেন।

৩) সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সমিতিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত জনবল সমিতি নিয়োগ করবে।

যৌথ খামার/চাষাবাদ ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে গ্রাম/মৌজার পতিত, অনাবাদি কৃষি ও অকৃষি ভূমি উৎপাদন

অংশীদারির ভিত্তিতে জমির মালিক ও গ্রাম সমবায় সমিতির মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে জমির ধরন অনুযায়ী উপযোগী কৃষি কাজ (প্রধান ও অপ্রধান শস্য) এবং মৎস্য চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পভুক্ত ১০টি গ্রামে সমিতির সদস্যদের সম্মতিক্রমে আইলবিহীন চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সমিতির তত্ত্বাবধানে এসব জমি যান্ত্রিক চাষাবাদের আওতায় আনা হবে এবং জমির মালিক মালিকানার হিস্যা অনুযায়ী ব্যয় বহন করবে ও উৎপাদিত ফসলের মূল্য পাবে। এছাড়া রাস্তার পাশের, নদী তীরের উন্মুক্ত জমিতে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ফসল চাষ/ বৃক্ষ রোপণ করা হবে। বাড়ির ভিটা, পাশের পতিত ও পরিত্যক্ত জমিতে অপ্রধান শস্য (আদা, রসুন ইত্যাদি) ও শাকসবজি চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে।

জমির মালিক, সমবায় সমিতি ও ব্যক্তি উৎপাদক এই তিন পক্ষ উৎপাদন অংশীদারিত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। সমবায় অধিদপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার সহায়তায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে গ্রাম সমবায় সমিতির মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গ) কম্পোনেন্ট-৩

১) **কৃষি ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে দক্ষতা উন্নয়নে :** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রতি ইঞ্চি জমি আবাদের আওতায় আনতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গ্রামের কৃষিজমির সর্বোচ্চ ব্যবহার, আইলবিহীন চাষাবাদ, যৌথ খামার ব্যবস্থা প্রবর্তন, মানবশ্রমকে যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন, উৎপাদন বৃদ্ধি, পোস্ট হারভেস্ট লোকসান কমানো, পানির সাশ্রয়ী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে। উপজেলা কৃষি বিভাগ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে।

২) **মৎস্য চাষ :** বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আধুনিক ও মানসম্মত মাছ চাষের শ্রেষ্ঠ অনুশীলনের (Best Practice) জন্য মৎস্য সম্পদ অধিদপ্তরের সহায়তায় উপজেলা মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামে ২ টি করে মোট ২০ টি প্রদর্শনী পুকুর তৈরি করা হবে।

৩) **পশুপালন, ডেইরি ও পোলট্রি :** সারা বছরের আয় নিশ্চিত করা, অফফার্ম কার্যক্রম হিসেবে গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক ও মানসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার কৌশলের ওপর গ্রামের মহিলা ও বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে গ্রামে গরু ও গাভি পালনে ২ গরু মডেল (2 cow model) এর অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আবর্তক তহবিল হতে আগ্রহীগণ ঋণ সুবিধা পাবে।

৪) **উৎপাদিত পণ্য বিপণন :** প্রকল্পের আওতায় যৌথ উদ্যোগের ফলে গ্রামীণ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। গ্রামে উৎপাদিত কৃষিপণ্য প্রাথমিক সংরক্ষণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র পর্যায়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থা সমবায় সমিতির কমিউনিটি ভবনে থাকবে। এছাড়া নিকটবর্তী মার্কেট/ বিপণন হাব/ গ্রোথ সেন্টারে পণ্য পরিবহণের জন্য প্রত্যেক সমিতিতে ১টি পিকআপ ট্রাক (১.৫ টন) সরবরাহ করা হবে। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সমবায় সমিতির নিজস্ব নামে (ব্র্যান্ড হিসেবে) বিপণন করা হবে। সমিতির কমিউনিটি ভবনে পণ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি সমবায় সমিতিকে সমবায় অধিদপ্তরের ই-কমার্স প্লাটফরমের সাথে লিংক করে দেওয়া হবে।

প্রস্তাবিত বঙ্গবন্ধু মডেল কো-অপারেটিভ ভবন।

ঘ) কম্পোনেন্ট-৪

প্রশিক্ষণ প্রদান : প্রকল্পে ৩ ধরনের প্রশিক্ষণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

১. সুবিধাভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ;
২. উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ;
৩. কৃষিপণ্য ক্ষুদ্র পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ;

তাছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু মডেল গ্রামের উপকারভোগীদের প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য দপ্তরের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতে এই ১০টি গ্রামকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ঙ) কম্পোনেন্ট-৫

আবর্তক তহবিল : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের চাহিদার ভিত্তিতে ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনাসুদে ঋণ প্রদান করা হবে। এছাড়া কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

প্রকল্পের আওতায় ব্যক্তি পর্যায়ে এবং প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যোক্তা খাতে প্রতিটি গ্রাম সমবায় সমিতির অনুকূলে আবর্তক তহবিল হিসেবে ২০০ লক্ষ টাকা হিসেবে মোট ২,০০০ লক্ষ টাকার তহবিল থাকবে।

চ) কম্পোনেন্ট-৬

কমিউনিটি ভবন নির্মাণ : সমিতিকে কেন্দ্র করে গ্রামের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। কমিউনিটি ভবন নির্মাণের জন্য সমিতির সদস্যগণ প্রকল্প দপ্তরের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ১৫ শতক/১০ কাঠা ভূমি ভবন নির্মাণের জন্য হস্তান্তর করবে এবং ব্যবহারের চুক্তি স্বাক্ষর করবে।

১) ১০টি মডেল গ্রামে সমবায় সমিতি প্রদত্ত ১৫ শতক/১০ কাঠা ভূমিতে প্রতিটি প্রায় ৩,৪৬৮ বর্গফুটের দ্বিতল কমিউনিটি ভবন নির্মাণ করা হবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে ভবনসমূহ নির্মাণ করা হবে।

২) কমিউনিটি ভবনে বঙ্গবন্ধু পাঠাগার ও বঙ্গবন্ধু কর্নার, নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১০০ জনের কমিউনিটি হল, সমিতির অফিস কক্ষ, ১টি প্রশিক্ষণ কক্ষ, ডিজিটাল সেবা কেন্দ্র, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার গোডাউন, সংরক্ষণাগার, প্রদর্শনীকেন্দ্র এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের মাধ্যমে ভবনটি পরিচালনা করবে।

মডেল গ্রামের প্রত্যাশিত পরিবর্তনসমূহ

প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের সম্পদের সুসম ব্যবহার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নত অনুশীলনের ফলে গ্রামে যেসব পরিবর্তন সূচিত হবে-

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

ক) যৌথপদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ হবে।
খ) গ্রামের অনাবাদি ও পতিত জমি আবাদের

আওতাভুক্ত হবে।
গ) রাস্তার ধার, নদীর পাড়, মাঠ এবং বাড়ির আঙিনায় আবাদ করা হবে।
ঘ) কৃষিতে আধুনিক কৃষিযন্ত্রের ব্যবহারের প্রচলন হবে।
ঙ) পরিবেশবান্ধব ও পানি সাশ্রয়ী সেচ ব্যবস্থা থাকবে।
চ) কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের পরিমিত ব্যবহার থাকবে এবং জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার অনুশীলন করা হবে।
ছ) কৃষি বহুমুখীকরণ চর্চা থাকবে।
জ) কৃষিপণ্যের বাজার নেটওয়ার্ক থাকবে।
ঝ) ফসলের সময়ের বাইরে (Off Season) কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পশুপালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কুটির পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা থাকবে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে

ক) গ্রামীণ দারিদ্র্য ৭% এ নেমে আসবে।
খ) গ্রামে অপরাধপ্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে কমবে।
গ) গ্রামে মাদক গ্রহণকারী ও মাদক কারবারি থাকবে না।
ঘ) গ্রামে বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধ থাকবে।
ঙ) গ্রামে সালিশ মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে। মামলা মোকদ্দমার হার কমে যাবে।
চ) গ্রামের লোক ১০০% চিকিৎসা সুবিধা পাবে।
ছ) স্কুলে ভর্তির হার ১০০% এবং ঝরে পরার হার উল্লেখযোগ্য হারে কমবে।
জ) নারীর প্রতি সহিংসতা থাকবে না।
ঝ) কোনো শিশু ও নারী পুষ্টিহীন থাকবে না।
ঞ) ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা থাকবে।
ট) গ্রামের জনগণ তথ্যপ্রযুক্তিগত সুবিধা লাভ করবে।
ঠ) গ্রামের জনগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত থাকবে।
ড) অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সামাজিক সংহতি ফিরিয়ে আনা হবে।
ঢ) পরিবেশ সুরক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে শতভাগ পরিবেশবান্ধব গ্রাম হিসেবে আবির্ভূত হবে।

গ্রামের এসব বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তরের প্রদত্ত সরকারি সেবা গ্রামে পৌঁছে দিয়ে গ্রামের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রকল্প কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করাতে হবে। এ লক্ষ্যে উপজেলার বিভিন্ন দপ্তর ও উপকারভোগীদের সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি কাজ করবে।
ক) সার্বিক সমন্বয় কমিটি;
খ) কৃষি, মৎস্য, প্রাণীসম্পদ ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত;
গ) শিক্ষা, আইসিটি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত;
ঘ) আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক সমস্যা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত;
ঙ) স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং নারী ও শিশুর উন্নয়ন সংক্রান্ত;
চ) গ্রামীণ অবকাঠামো ও পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত;

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব। তাঁর চিন্তা ছিল সর্বজনীন। তিনি ছিলেন সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী বিশ্বমানের নেতা। আজ থেকে ৫০ বছর বা তারও আগে তিনি যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার প্রযোজ্যতা আজও কমেনি বরং বেড়েছে। এখানে প্রশ্ন হলো তাঁর দর্শন বাস্তবায়নে আমরা কতটা আন্তরিক? আলোচনা, বক্তৃতা এবং কাগজেকলমে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে যদি জনগণের কল্যাণে তাঁর দর্শন বাস্তবায়ন করা যায় তবে সেটাই হবে এ মহান নেতার প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

মোঃ আসাদুজ্জামান : অতিরিক্ত নিবন্ধক (পিআরএল), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান।

হরিদাস ঠাকুর

১. প্রারম্ভিকা

নারী, উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সমবায়-এ চারটিই হচ্ছে শক্তির প্রতীক-প্রগতির প্রতীক। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে এখনো পৃথিবীর পিছিয়ে থাকা এবং পিছিয়ে রাখা মানুষের মূল অংশটি হচ্ছে নারী। এটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের জন্য কমবেশি প্রযোজ্য। মূলত সমবায়ের জন্ম হয়েছিল পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোকে সংগঠিত করে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে নিতে। সেজন্য জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয় রে আয়/ দুঃখজয়ের নবীন মন্ত্র সমবায়, সমবায়।' বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মূল ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু সমবায় অনেক আগে থেকেই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক নানাবিধ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মহিলা সমবায় সমিতি আছে দেশে। পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে আসছে নারী-উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প। আসলে ব্যাংকিং, কৃষি, মাছ চাষ, মৃত্তিকা শিল্প, কুটিরশিল্প, তাঁত শিল্প, প্রতিটি সেক্টরের মূলে ছিল সমবায় সমিতি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ। নারীর ক্ষমতায়নেও সমবায়ের ভূমিকা ও সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দৃষ্টির আড়ালে এসব অর্জন ও সাফল্য এখনো অনুচ্চারিত রয়ে গেছে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ২০১৮-২০১৯ আর্থিক বছরে 'নারীর ক্ষমতায়ন : অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা' শিরোনামে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তর থেকে মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে ২০২০ সালের ৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসে 'সমবায়ের সাফল্যগাথা' নামে একটি গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে সমবায়ের মাধ্যমে মহিলাদের উন্নয়নের চিত্র বস্তুনিষ্ঠভাবে উঠে এসেছে।

'নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা' সম্যকভাবে

উপলব্ধি করতে আমরা শিরোনামের চারটি প্রত্যয় 'নারী', 'উন্নয়ন', 'ক্ষমতায়ন' ও 'সমবায়' নিয়ে সামান্য আলোকপাত করে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সমবায়ের স্বরূপ ও ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে পারি"

ক. নারী

নিকট অতীতে নারীর অবস্থা ছিল বন্দিনীর সমতুল্য। 'অসূর্যম্পশ্যা' নারী ছিল পুণ্যবতীর প্রতীক যার জন্য চারদেওয়ালে বাঁধা সংসার নামক অচলায়তন ছিল তার সবখানি পৃথিবী। রান্নাবান্না আর পুরুষের সেবা করাই ছিল তার কাজের সিলেবাস। মুক্ত পৃথিবী ছিল শুধু পুরুষের কর্মক্ষেত্র। বেগম রোকেয়ার রচনাবলিতে আমরা এই দৃশ্য দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থের 'মুক্তি' নামক কবিতাতেও বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে যার একটা অংশ নিম্নরূপ :

বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কি বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা—
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।

খ. উন্নয়ন

যেকোনো ধনাত্মক পরিবর্তনকে উন্নয়ন বলে। (Anything positive change is called development). উন্নয়ন ধারণাটি ব্যাপক-বহুমাত্রিক ও আপেক্ষিক বিষয়। সাধারণ অর্থে উন্নয়ন বলতে অগ্রগতি, প্রগতি, সমৃদ্ধি, বিকাশ, বিস্মৃতি, উন্মেষ, সংযোজন, বিবর্তন, পরিবর্তন ইত্যাদি বুঝায়। জাতিসংঘের মতে, উন্নয়নের ধারণাটি ব্যাপক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার সমন্বিত ইতিবাচক ধারণাকে বুঝায়।

নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, সব ধরনের পরাধীনতা থেকে মুক্তির প্রয়াসকেও উন্নয়ন বলা হয়। মানবাধিকারসহ সব ধরনের অধিকার নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাকে অধিকারভিত্তিক উন্নয়ন বলেও আখ্যায়িত করা হয়। যে উন্নয়ন প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পর্যন্ত প্রসারিত হয়, তাকে বলে টেকসই উন্নয়ন।

উন্নয়নের কয়েকটি মাত্রা রয়েছে। যেমন- (ক) সবার জন্য উন্নয়ন; (খ) সব খাতে/ক্ষেত্রে উন্নয়ন; (গ) সুসম উন্নয়ন; (ঘ) টেকসই উন্নয়ন এবং(ঙ) মানুষের/মানবজাতির/সভ্যতার জন্য উন্নয়ন। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন বলতে বুঝায় বিদ্যমান সম্পদ ও সক্ষমতাকে বাড়ানো, জীবনকে আরও সহজ, আরামদায়ক ও নিরাপদ করা, জ্ঞান, বিদ্যা, যোগাযোগ বিনোদনের জগৎ প্রসারিত করা। যদি দেখা যায় সম্পদ ও সক্ষমতা আরও বিপর্যস্ত হচ্ছে, যদি দেখা যায় জীবন আরও কঠিন, অনিশ্চিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ হচ্ছে, যদি দেখা যায় চারপাশের জগৎ আরও বিপর্যস্ত হচ্ছে, তবে তাকে উন্নয়ন বলা যাবে না। দেশকে ও দেশের মানুষকে যা বিপন্ন করে তা উন্নয়ন নয়।

গ. ক্ষমতায়ন

নারীর ক্ষমতায়ন মূলত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক অবকাঠামোতে অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি মাধ্যম বা উপায়, যার মাধ্যমে নারীরা নিজেদের মেধা ও যোগ্যতাকে প্রকাশ করতে পারেন এবং নিজেদের অধিকারগুলো আদায়ে সচেষ্ট হতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়ন তখনই সম্ভব যখন কোনো বাধা বা সীমাবদ্ধতা ছাড়াই নারীরা শিক্ষা কর্মজীবন এবং নিজেদের জীবনধারার পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাগুলো ব্যবহারের সুযোগ পান।

আবার ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা হঠাৎ করে হওয়ার সুযোগ নেই। এজন্য দীর্ঘ ও অব্যাহত উদ্যোগ দরকার। নারীর ক্ষমতায়নের আওতাকে প্রধানত : (১) সামাজিক ক্ষমতায়ন, (২) রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, (৩) অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এই তিন ভাগে দেখানো হয়। আজকাল অবশ্য আইনগত, তথ্যগতসহ আরো কয়েক ধরনের ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ উঠে এলেও মোটাদাগে উল্লিখিত তিন ধরনের ক্ষমতায়নের আওতায়ই সব চলে আসে।

ঘ. সমবায়

প্রচলিত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়-'সমবায় হচ্ছে সমমনা লোকদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার সংঘবদ্ধ সংগ্রামী সংগঠন'। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির ধ্রুপদি সংজ্ঞা মতে, 'সমবায় হচ্ছে সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা।' সমবায়ের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Cooperative. Cooperative শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Cooperari' থেকে। এখানে 'co' এর অর্থ 'সাথে' ('with') এবং 'operari' শব্দের অর্থ 'কাজ করা' ('to work')। সুতরাং 'Cooperari' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় একসাথে কাজ করা। ("working together.")।

ভাষা শাস্ত্রীদের মতে, ভাষার প্রথম উত্তম পুরুষের বহুবচন পদের ('আমরা') সৃষ্টি হয়েছে এবং এর পরে একবচন পদ অর্থাৎ 'আমি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই 'আমরা' শব্দের প্রত্যয় ও দ্যোতনাই 'সমবায়' নামক সমষ্টিগত কর্মপ্রয়াসের নির্যাস বলে অভিহিত। সমবায় 'আমি' কে 'আমরা'য় পরিণত করে শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটায়। ব্যাকরণগতভাবে বলা যায়, 'আমি' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'I' অপর দিকে 'আমরা' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'We'। 'আমি এর চেয়ে 'আমরা' অনেক বেশি শক্তিশালী কারণ আমি একক ব্যক্তি' কিন্তু আমরা হচ্ছে 'ব্যক্তির সমষ্টি'। বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন থেকে আমরা জানি,'আমিত্ব' ত্যাগ করতে বলা হয়েছে প্রতিটি ধর্মে। কারণ 'আমি' থেকে 'আমরা'য় পরিণত হলে কঠিন কাজও সহজে সম্পাদন করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : Illness মানে অসুস্থতা। কিন্তু এই Illness শব্দের I কে (আমি) We (আমরা) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হলে হয়ে যায় Wellness যার অর্থ সুস্থতা। এভাবেই সমবায় সমাজে একক ব্যক্তিকে সমষ্টিতে পরিণত করে সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ ঘটায়। এটাই সমবায়ের মৌল চেতনা। নারীর ক্ষমতায়নেও সমবায় এ আদর্শেই কাজ করে।

২. নারীর সংগ্রামী প্রয়াস

সব নারী প্রচলিত বন্দিদশা মন থেকে মেনে নেননি। তারা মুক্তির জন্য ছটফট করেছেন। চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মুক্তির দিশা পাননি। পথ পাননি অচলায়তন ভেঙে বাইরে আসার। বিধাতার কাছে সঙ্গোপনে ফরিয়াদ জানিয়েছেন আর অভিশাপ দিয়েছেন নারী হয়ে জন্মানোর নিয়তিকে। তারপরও সেই অবস্থার মধ্য থেকেই দু'চারজন নারী সাহসী হয়ে উঠেছেন নারীর মুক্তির পক্ষে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের জানান দেয়, নারীরা আজ সমাজ ও সংসারে উন্নয়নের পরীক্ষিত হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতায় নারী তার স্বাধিকারের প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন :

নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
যাব না বাসর ঘরে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।

এই দৃঢ়চেতা নারীর আপন ভাগ্য জয় করার ইস্পাতকঠিন প্রত্যয়ে সমবায় শক্তি জোগায়। প্রাসঙ্গিকভাবে আমরা 'নারী' কবিতায় সাম্যের কবি, বিদ্রোহের কবি, নারী জাগরণের কবি কাজী নজরুলের নারী

পুরুষ সম্পর্কিত অমিততেজী ভাষ্য উচ্চারণ করতে পারি :

বিশ্বে যা কিছু এলো পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান,
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান্।
কোনোকালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে, বিজয়লক্ষী নারী।
সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক', নারীরা আছিল দাসী!
চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায় মল,
মাথার ঘোম্‌টা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও-শিকল!
যে ঘোমটা তোমা' করিয়াছে ভীরু, ওড়াও সে আবরণ,
দূর ক'রে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ!
সেদিন সুদূর নয়-
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!

সমবায়কে পাথেয় করে রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'রাই আজ 'অসাধারণ' হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজ প্রগতির পথে-জীবনের রথে। আর তাইতো গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের কথায় ঘরবন্দি নারীদের যে চিত্রকল্প পাই তা আজ নির্বাচিত হতে চলেছে 'নারীর ক্ষমতায়নের হাত ধরে'।

খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার,
এই তোমাদের পৃথিবী
এর বাইরে জগৎ আছে তোমরা মাননা।

তোমাদের কোনটা হাসি কোনটা ব্যাথা,
কোনটা প্রলাপ কোনটা কথা,
তোমরা নিজেই জাননা।

এর বাইরে জগৎ আছে তোমরা মানোনা
তোমরা নিজেই জাননা।

খিড়কি থেকে সিংহদুয়ার এই তোমাদের পৃথিবী।

আমরা জানি আমাদের এই বাংলা ভূখণ্ডে নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া। বেগম রোকেয়ার হাত ধরেই বাংলার অবহেলিত বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা নারীরা জাগরণের পথে এসেছে-স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। রোকেয়ার যুগে নারীরা ছিল অন্তঃপুরবাসিনী-অবগুণ্ঠনবতী ও অসূর্যম্পশ্যা। এই অবস্থায় বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেগম রোকেয়া। বিশ শতকের প্রথমে বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণ সূচনালগ্নে নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণে তিনিই প্রথম নেতৃত্ব দেন। মুসলমান সমাজের ঘোর অন্ধকার যুগে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে রোকেয়ার ভূমিকা ছিল একক, ব্যতিক্রমী এবং অনন্যসাধারণ। অবরোধ প্রথার শেকল ভেঙে তিনি বেরিয়ে আসেন অসামান্য সাহস, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। বেগম রোকেয়াই প্রথমবারের মতো বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের দাবি তুলে ধরেন এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া নারীর ক্ষমতায়নের ভবিষ্যৎ রূপরেখা এঁকেছিলেন এভাবে : তোমাদের কন্যা শিশুদিগকে শিক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দাও দেখিবে তারা নিজেদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া নিতে পারিবে।

আমাদের সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। নারী অবলা-তারা কঠিন কাজ করতে পারে না। বিশাল চাপ সামলাতে পারে না। অথচ যেকোনো কঠিন কাজ নারী অবলীলায় করতে পারে। তারা ঘর সামলান দক্ষতার সাথে-তারা অফিস সামলান যোগ্যতার সাথে-তারা দুর্গম পথ পাড়ি দেন দৃঢ় মনোবল নিয়ে। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্রই তাদের দৃপ্ত পদচারণা। উদাহরণ দিলে আমরা নারীর প্রাকৃতিক শক্তিমত্তার বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারব।

(ক) বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোকে আমরা জানি, একজন মানুষ একবারে ৪৫ ইউনিট ব্যথা সহ্য করতে পারে। একজন নারী/মা যখন একটি শিশুকে জন্মদান করেন, তখন তিনি ৫৭+ ইউনিট ব্যথা সহ্য করেন। এই ব্যথা ২০টি হাড্ডি একসাথে ভেঙে যাওয়ার থেকেও বেশি। কাজেই আমরা বুঝতে পারি একজন নারী কত কষ্টসহিষ্ণু, নিবেদিতপ্রাণ ও সৃষ্টিশীল কাজে কত সংগ্রামী। (তথ্য : ফেসবুক থেকে)।

(খ) গবেষণা তথ্যানুযায়ী, একজন নারী দিনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৬ থেকে ২০ ঘণ্টা কাটায় পরিবারের বিভিন্ন কাজের জন্য।

(গ) একজন নারী প্রতিদিন গড়ে ৪৫ ধরনের গৃহস্থালির কাজ করেন এবং বিপরীতে একজন পুরুষ করেন মাত্র ২২ ধরনের কাজ। গবেষণা বলছে ৪৫ রকমের গৃহস্থালির কাজ পেশাজীবীর মাধ্যমে করাতে গেলে প্রতিমাসে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ করতে হবে। এই হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালির কাজের অতিরিক্ত অর্থনৈতিক মূল্য দাঁড়ায় ৯০১ থেকে ২ হাজার কোটি ডলার। (৭৫,৬৮৪ কোটি থেকে ১, ৬৮,০০০ কোটি টাকা)।

নারীকে তাই কোনোভাবেই অবহেলা বা হেলার চোখে দেখার অবকাশ নেই শারীরিক-মানসিক ও নৈতিক দিক থেকে।

ওপরের বৈজ্ঞানিক-সামাজিক-আর্থিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণকে 'বাঁচতে শেখা' এনজিও প্রকাশিত একটি চমৎকার পোস্টারের মাধ্যমে

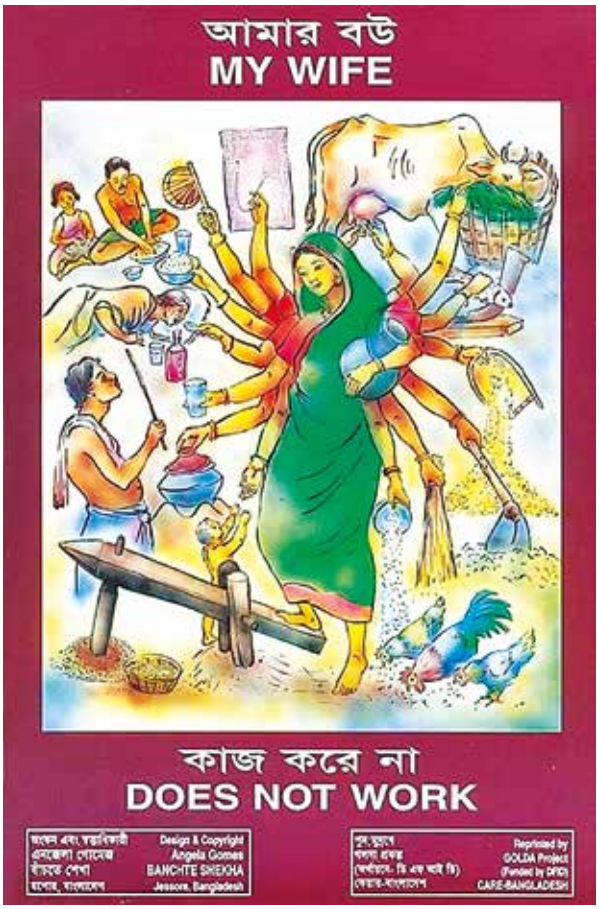

নারীর বহুমাত্রিক কাজের পোস্টার

অনুধাবন করা যেতে পারে। অ্যাঞ্জেলা গোমেজ প্রতিষ্ঠিত 'বাঁচতে শেখা' নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করে থাকে। তাদের পোস্টারটি নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।

৩. নারী উন্নয়ন ও সমবায়

'নারীকে তার প্রাপ্য দিলে-দেশ ও দশের সুফল মিলে'-নারী দিবসের এ স্লোগান শুধু কথার কথা নয়, একটি জীবনধর্মী ও উন্নয়নকামী আপ্তবাক্য। একটি গতিশীল ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণে নারীর প্রতি আমাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। আমরা সমবায়ের মাধ্যমে কর্মস্রোতে এনে আমাদের মা-বোন-কন্যা-জায়া হিসেবে নারীর অবস্থানকে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে WOMAN শব্দটির অর্থ হবে-

W	Workforce and Wealth	কর্মশক্তিতে সম্পদ
O	Organized and Operating	সংগঠিত কার্যক্রম
M	Motivation and Manager	চেতনাগত দক্ষ ব্যবস্থাপক
A	Active and Accountable	দায়বদ্ধতায় সক্রিয়
N	Nice and New Horizon	নবদিগন্তের চেতনাদীপ্ত কর্মী

উপরিউক্ত আলোচনার সারাংশে আমরা বলতে পারি, সমবায় নারীকে জাগ্রত করে তাকে উন্নয়নের পথে পরিচালিত করতে পারে।

৩০ জুন ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত বাণীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন: "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।" অপরদিকে ২৫ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন: সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল। জাতির পিতার সমবায় দর্শন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের আলোকে আমরা নারীর ক্ষমতায়নের সমবায়ের ভূমিকা ও কার্যকারিতার বিষয়ে বলতে পারি :

- সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতি অন্যান্য সংগঠন থেকে অধিক কার্যকর।
- সমবায় সমিতি সমাজে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে এবং যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে।
- সমবায় সমিতি একক প্রচেষ্টার পরিবর্তে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলতার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী।
- সমবায় সমিতি গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটায়।
- সমবায় সমিতি পরোপকার শেখায় নিজের প্রয়োজন মিটাতে উদ্বুদ্ধ করে।
- সমবায় সমিতি সমাজের মানুষের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালোবাসা বৃদ্ধি করে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে।
- সমবায় সমিতি ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর করে। সমতাভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সৃষ্টি করে।
- সমবায় সমিতি সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করে তা বিনিয়োগের মাধমে অর্থনৈতিক প্রবাহ তৈরি করে।
- সমবায় সমিতি সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।
- সমবায় সমিতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে।
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি সমবায় সমিতির অন্যতম প্রধান দিক।
- অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি করে।
- সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে।
- মহিলাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়।
- মহিলাদের পারিবারিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সেসব হলো :

১) **নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি :** সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থা বিনিয়োগের অবস্থানের জ্ঞান লাভ করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়।

২) **পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন :** সমবায় সমিতির সদস্যগণ বিভিন্ন গোত্র, শ্রেণি পেশার হয়ে থাকে। সমিতির সদস্য হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন হয়।

৩) **গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নেতৃত্ব তৈরি :** সমবায় সমিতির মাধ্যমে গ্রুপভিত্তিক কার্যক্রম তাদের সফলতার পথ প্রশস্ত করে। সমিতি পরিচালনাকারীগণের মধ্যে নেতৃত্ব তৈরি করে। সমিতির মহিলা সদস্যদের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়িত করে।

৪) **সামাজিক সমতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি :** সমবায় সমিতি সমাজে বিদ্যমান ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে এককভাবে নয় সামষ্টিকভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে। মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ

মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে তাদের সমাজে ও পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৫) অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ : ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ হলো অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন। আর্থিক সচ্ছলতা মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সাধারণ মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং তারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে তাদের সচ্ছলতা ফিরে আসে। এতে নারীদের পরিবারে ও সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যা তাদেরকে ক্ষমতায়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

৪. নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সমবায় অধিদপ্তরের গৃহীত কর্মকাণ্ড

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩ অনুচ্ছেদে 'গ্রামীণ উন্নয়ন' বিষয়ক বিষয়াবলি বর্ণিত হয়েছে। এখানে ৭.৩.৩ উপ-অনুচ্ছেদসমূহে পল্লী উন্নয়ন সেক্টরে সমবায় বিভাগের সম্পৃক্ততা ও কৌশল বিষয়েও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের সপ্তম অধ্যায়ের ৭.৩৩ অনুচ্ছেদে সমবায়ের মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে : Livelihood development for disadvantaged women reducing vulnerability of women through building awareness through skill development and employment generation among the disadvantaged women living in south- west area of the country; increasing income of the targeted people; forming capital through savings pursued.

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals-SDG) এর ৫ নং অভীষ্টে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আমরা বিশ্বনেতাদের অঙ্গীকার পাই এভাবে :

Women - Achieve **gender equality** and **empower** all women and girls জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জনে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায় বিভাগও নারী উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে আসছে। সমবায়ভিত্তিক বেশকিছু প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ও হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে :

১) সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি।
২) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (Copmprehensive Village Development Programme- CVDP)।
৩) Family Welfare and Income Generation Activities Through the Rural Co- operatives''
৪) গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন।
৫) সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।
৬) 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে'র আওতায় পরিচালিত 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কম্পোনেন্ট'।
৭) বৃহত্তর ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্প।
৮) দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।

এসব প্রকল্পের কয়েকটি শুধুমাত্র নারীদের জন্য পরিচালিত। অন্যগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নারীর উন্নয়নে গৃহীত একটি প্রকল্প ''উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প''। দেশের ৭টি বিভাগের ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাক্কলিত টাকা ১৫১.৫৭০৩ কোটি। মেয়াদ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২১। উপকারভোগী ১০,০০০ জন সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী। প্রত্যেককে ২টি করে বকনা /গাভি কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং খাদ্য ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য ২০ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ, তদারকি, গবাদি পশুর চিকিৎসা বিনামূল্যে পাচ্ছেন। এই প্রকল্পভুক্ত ১৩,৯৬৮টি গাভি বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৬.৫০ লিটার দুধ দিচ্ছে। দৈনিক উৎপাদন ২৮,৩০৬ লিটার। প্রতি লিটার ৪০ টাকা দরে দুধ কিনে নেয় মিল্কভিটা। দৈনিক দুধ বিক্রয়লব্ধ অর্থ আসছে ১১.৩২ লক্ষ টাকা। এটি একদিকে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে, সংসারে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

৫. নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির উদ্যোগে মুজিব বর্ষকে সামনে রেখে 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা' শিরোনামে একটি গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে। এ গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়নে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছিল। এসব মানদণ্ডকে তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো :

(ক) অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত :
(১) আয় বৃদ্ধি হয়েছে কি না?
(২) মর্যাদা বেড়েছে কি না?
(৩) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
(৪) পারিবারিক ও সমিতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা/সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না?
(৫) পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা বেড়েছে কি না?
(৬) পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
(৭) সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?
(৮) কর্মসংস্থান হয়েছে কি না?
(৯) আয়ের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু?
(১০) নিজস্ব আয় নিয়ে নিজের স্বাধীনতা কতটুকু?

(খ) পারিবারিক ও মানসিক পরিপ্রেক্ষিত :
(১) পরিবারের সম্পদের ওপর অধিকার কতটুকু?
(২) পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা কতটুকু?
(৩) অসমতা বা নারীর প্রতি অবহেলা সম্পর্কে ধারণা কতটুকু?
(৪) চলাফেরায় কতটুকু স্বাধীনভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারে?
(৫) নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটুকু স্বাধীন?

(গ) স্বাস্থ্য পরিপ্রেক্ষিত :

(১) নিজের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

(২) সন্তানের স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে কতটুকু স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

এ গবেষণায় বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ফাইন্ডিংস/ফলাফল পাওয়া গেছে। উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ/ফলাফল হলো :

(১) সমিতির নারী সদস্যগণ মূলত ৬টি পেশায় জড়িত। তাদের মধ্যে গৃহিণীরা (৬০%) স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি উদগ্রীব। চাকরিজীবী ১৫%; ব্যবসায়ী ১৩%; কুটিরশিল্প ৪%; এবং টেইলারিং ২%। বিবাহিত মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেশি।

(২) নারীদের সাধারণ সদস্য ৬১%। সভাপতি হয়েছেন ৭%, সম্পাদক ৯%, নির্বাহী কমিটির সদস্য ১৩%; সহসভাপতি ৫% এবং কোষাধ্যক্ষ ৫%।

(৩) গবেষণায় দেখা গেছে মহিলারা গড়ে সর্বোচ্চ ২ লাখ টাকা এবং সর্বনিম্ন ২০ টাকার শেয়ারের মালিক। গড় শেয়ার মূল্য ৬,৬২৮ টাকা।

(৪) সমিতিগুলোর ৯৬% ব্যবসা বা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং ৯৯% সদস্য নিজেদের সম্মানিত হওয়ার বোধ অর্জন করেছেন।

(৫) পুরুষতান্ত্রিক বেড়াজাল থেকে মুক্তিলাভে সমবায় সমিতি তাদের সহায়তা করছে বলে অধিকাংশ নারী মনে করেন।

(৬) সমিতির ৯৯% নারী সদস্য মনে করেন যে সংসারে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বেড়েছে।

(৭) জরিপকৃত ১০৭টি মহিলা সমবায় সমিতির মধ্যে ৪৫টি সমিতি থেকে মহিলারা স্থানীয়/জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারী নারীদের ৫৮% নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

(৮) ৯৮% উত্তরদাতা মনে করেন যে সমিতিতে সংযুক্ত হওয়ার ফলে তাদের স্বাস্থ্যজ্ঞান বেড়েছে। ডাক্তার/ ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগের সক্ষমতা বেড়েছে।

(৯) ৯৭% উত্তরদাতা নারী মনে করেন যে সমবায় সমিতির সদস্য হওয়ায় তাদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে।

(১০) অংশগ্রহণকারী ৯৯% নারী মনে করেন যে সংসারে তারা আর ''অবহেলিত'' নন।

(১১) নারী সমবায়ী যাদের ভবিষ্যতে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বা ব্যবসায়িক উদ্যোগে জড়িত হতে চান, তাঁদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (২৮%) ব্যবসা করতে আগ্রহী। ২৭% চান হাঁস-মুরগি ও গবাদি প্রাণীর খামার; ১০% সেলাই কাজ; গাভিপালন ও দুগ্ধখামার চান ৯%। এতে প্রতীয়মান হয় যে নারী সমবায়দের চিন্তাচেতনায় ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে। এতদিন যাবৎ যেসব কাজ ''শুধুই পুরুষের কাজ '' বলে গণ্য করা হতো, সমবায়ী নারীরা সেসব কাজে বেশি করে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

(১২) বিবাহিত মহিলাগণ আর্থসামাজিকভাবে স্বনির্ভর ও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বেশি আকাঙ্ক্ষী।

গবেষণার আলোকে বেশকিছু সুপারিশ ও মতামত পাওয়া গেছে। এগুলো হলো :

(১) সমবায় বিভাগের নারীদের দ্বারা সমবায় সমিতি গঠন করে তাদেরকে সফল করার বিষয়ে ইতিপূর্বে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে কার্যক্রম গ্রহণ করে আরও কার্যকর ফলাফল পাওয়া যাবে।

(২) নারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরবর্তী সাপোর্ট দিলে তাদের সফলতা ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।

(৩) সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নারী সমবায়ী তথা সমবায়ীদের সঙ্গে সংযোগ আরও বাড়াতে ও নিবিড় করতে হবে।

(৪) মহিলা সমবায় সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর থেকে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা প্রয়োজন।

(৫) সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন করে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৭) মহিলা সমবায়ীদের উচ্চমূল্য সংযোজনকারী পণ্য উৎপাদন প্রশিক্ষণ (Training with High Value Addition) প্রদান করে যথাযথ বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা (Marketing System with Proper Linkage) এর প্রসারণ ঘটাতে হবে।

৬. নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সমবায়ের দর্শনগত ভূমিকা

(ক) সমবায় নারীদের জীবনের চারটি 'NOT' অপসারণ করে

বাংলাদেশের নারীদের জীবনে মোটাদাগে ৪টি 'NOT' আছে। এই ৪টি 'NOT' তাদের জীবনের আর্থসামাজিক সক্ষমহীনতার পরিচায়ক। সমবায় তাঁর আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের জীবন থেকে এই ৪টি 'NOT'তুলে দিয়ে তাদের সার্বিক উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে। আমরা সাধারণ একজন নারীর জীবন উপলব্ধি থেকে এই ৪টি 'NOT'এর দ্যোতনা বুঝতে পারি এভাবে :

(ক)

সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে নারীর জীবনের সেকালের হতাশাজনক গল্প

I have ***NOT*** kept my PROMISES to my family and friends. I can ***NOT*** PROVIDE all their needs. I do ***NOT*** PLAN ahead for time and my future is ***NOT*** ASSURED.

(Life with 4 NOTs)

[পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের কাছে দেওয়া ওয়াদা আমি রাখতে পারি না। তাদের সব চাহিদা আমি পূরণ করতে পারি না। আমি সামনের দিনের পরিকল্পনা করতে পারি না এবং আমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত না।]

(চারটি না যুক্ত জীবন)

(খ)

সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার পর নারীর জীবনের একালের উদ্দীপনাময় গল্প

I have kept my PROMISES to my family and friends. I Can PROVIDE for all their needs. I do PLAN ahead for time and my future is ASSURED.

(Life without 4 NOTs)

[পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের কাছে দেওয়া ওয়াদা আমি রাখতে পারি। তাদের সব চাহিদা আমি পূরণ করতে পারি। আমি সামনের দিনের পরিকল্পনা করতে পারি এবং আমার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত।]

(চারটি না মুক্ত জীবন)

(গ)

সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার পর নারীর জীবনের আত্মবিশ্বাসী উপলব্ধি

Proper Planning and Income Generating Activities (IGA) today holds the Key to a Better Future.

[আজকের সঠিক পরিকল্পনা এবং আয়বর্ধন কর্মকাণ্ডই আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবে।]

(ঘ)

সমবায়ে সম্পৃক্ত হওয়ার পর নারীর আত্মবিশ্বাসী গর্বিত উচ্চারণ

I was bad- I became Better- Better is now the Best.

[আমরা খারাপ ছিলাম-ভালো হয়েছি- বর্তমানে সর্বোচ্চ ভালো অবস্থায় আছি।]

(ঙ)

সমবায়সম্পৃক্ত আত্মবিশ্বাসী নারীর জীবনে 'NOT'এর ইতিবাচক অর্থ

NOT means Next Opportunities Tomorrow

(খ) সমবায় নারীদের FISH উপহার দেয়

সমবায় এর সদস্যের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে তৎপর। এই তৎপরতাকে বিশেষজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করেন FISH শব্দ দ্বারা। সমবায় দর্শনের FISH হচ্ছে :

F	Food- Cloth- Housing- Education- Treatment- Entertainment	অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসা ও বিনোদন নিশ্চিত করা
I	Income Generation Activities	আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা
S	Saving Tendency	সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি
H	Health Development	স্বাস্থ্য উন্নয়ন

মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ তাদের সদস্যদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের জীবনের অনুন্নয়নের বাধাসমূহ অপসারিত করে আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে।

(গ) সমবায় নারীদের প্রদান করে SPEECH

সমবায়ের মাধ্যমে নারীদের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকৌশলকে SPEECH শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। সমবায় দর্শনের SPEECH কে ব্যাখ্যা করা হয় :

S	Social Development	সামাজিক উন্নয়ন
P	Political Development	রাজনৈতিক উন্নয়ন
E	Economical Development	অর্থনৈতিক উন্নয়ন
E	Environmental Development	পরিবেশগত উন্নয়ন
C	Cultural Development	সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
H	Health Development	স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন

নারীদের এই ছয়টি বিভিন্ন দ্যোতনার উন্নয়ন তাদেরকে আলোকিত জীবনের পথে ধাবিত করে।

৭. সমবায়ের মাধ্যমে নারীর উন্নয়নের দুটি উজ্জ্বল উদাহরণ

সরকার এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বেশকিছু মহিলা ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতি সফলতার শীর্ষে উঠে এসেছে। এসব সমিতির মাধ্যমে নারীরা সমবায়ে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি সংসার ও সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের প্রায়োগিকতাকে তুলে ধরছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ রকম সফল মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ হিসেবে আমরা ঢাকার বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি এবং মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ গুড নেইবার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ-এর নাম উল্লেখ করতে পারি। বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির স্বশিক্ষিত গোলাপ বানু একদম প্রান্তিক অবস্থা থেকে উঠে এসে আজ নারী উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি সমবায়ের পতাকাতলে এসে রাষ্ট্রীয়ভাবে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও জয়িতা। অপরদিকে কমলগঞ্জ গুডনেইবার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সভাপতি সুভাষিনী দেবিসহ অপরাপর সদস্য (গুলনাহার বেগম, রহিমা বেগম, মিনারা বেগম, মমতাজ বেগম, নাসিমা বেগম,উজ্জ্বলী সিনহা, প্রণতি সিনহা, সবিতা সিনহা, তাইজুন বেগম) আজ সমবায়ের মাধ্যমে জীবনের উজ্জ্বল দিশা খুঁজে পেয়েছেন।

(ক) বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি : সমবায়ের মাধ্যমে একজন অসহায় ও উন্নয়নবিহীন নারীর জীবনের ৪টি 'NOT' কেটে যাওয়া এবং FISH ও SPEECH পাওয়ার বাস্তব উদাহরণ মিসেস গোলাপ বানুর সমবায় অভিযাত্রার কাহিনি। মিসেস গোলাপ বানু একটি সফল ও টেকসই সমবায় প্রতিষ্ঠান বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। [সমিতির নিবন্ধন নম্বর : ২১৯/৯৬, ঠিকানা : ১১৬০, নূরের চালা, ভাটারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২]। তিনি মনে করেন সমবায় সমিতি হচ্ছে গরিব মানুষের ২৪ ঘণ্টার ব্যাংক। সমবায় হচ্ছে গরিব-অসহায় মানুষের বেঁচে থাকার/ উন্নতি করার অবলম্বন বা হাতিয়ার। নিঃস্ব/রিক্ত মানুষকে কেউ ঋণ/সহায়তা দেয় না। কারণ তাদের দৃশ্যমান সম্পদ নেই জামানত রাখার মতো। কিন্তু সমবায় গরিব অসহায় মানুষকে বিনা প্রশ্নে বিশ্বাস করে ঋণ/সহায়তা দেবে কারণ আপনার দৃশ্যমান সম্পদ না থাকলেও রয়েছে অমূল্য অদৃশ্য সম্পদ যা হচ্ছে আপনার সততা ও নিষ্ঠা। সমবায় এই সততা ও নিষ্ঠাকে মূল্য দেয়। সফল ও টেকসই সমবায় সমিতি হওয়ার জন্য এই দুটিকে তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

সমিতিতে বর্তমানে ১২টি প্রকল্প বা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এগুলো হলো :

(১) সঞ্চয়ী প্রকল্প। (২) ক্রেডিট প্রকল্প (বিশেষ শেয়ার আমানত)। (৩) মরণোত্তর সেবা প্রকল্প। (৪) বারিধারা মহিলা স্পেশাল ডিপোজিট প্রকল্প (বিএসএফডি)। (৫) স্পেশাল (মর্টগেজ) ঋণ প্রকল্প। (৬) এফডিআর প্রকল্প। (৭) হাউজিং প্রকল্প। (৮) প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (ডায়াবেটিস মাপা, বাচ্চাদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল প্রদান, গর্ভবতী মহিলাদের টিকা প্রদান)। (৯) দ্বিগুণ বা ডাবল ডিপোজিট স্কীম। (১০) ঋণ নিরাপত্তা স্কীম(এলপিএস)। (১১) শিক্ষা প্রকল্প। (১২) শেয়ার নিরাপত্তা স্কীম। (১৩) লাখপতি স্কীম।

সমিতির সফলতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য নিম্নরূপ :

(১) বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ-এর বর্তমান মোট সদস্য ১,৩৫,০০০ জন (সমিতির মূল সদস্য : ৬০,০০০ জন এবং ক্ষুদে বা সহযোগী সদস্য ৭৫,০০০ জন)।

(২) এই লক্ষ ১,৩৫,০০০ জন মহিলা/মেয়ে শিশুর জীবনযাত্রার সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে একটি মহিলা সমবায় সমিতির মাধ্যমে।

(৩) সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন : ৪৬০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২৫০ কোটি টাকাই সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নকল্পে বিনিয়োজিত আছে। সমিতিতে ১২ ধরনের বিভিন্ন প্রকল্প চলমান।

(৪) বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমিতি এবং সমিতির সদস্যদের পরিবারের মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সমিতিতে বর্তমানে ১০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী সরাসরি কর্মে নিয়োজিত আছেন এদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। এছাড়া সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

(৫) সমিতিটি তাদের কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৩,২০১১,২০১৫ এবং ২০১৭ সালে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছে।

(৬) ২০১১ সালে মালেশিয়ার কুয়ালালামপুরে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) ৪০ তম ক্রেডিট ইউনিয়ন ফোরামে ইন্টারন্যাশনাল রিকগনিশন এওয়ার্ড জিতেছেন।

(৭) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাপ বানু ২০১০ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয় সমবায় পুরস্কার পেয়েছেন।

(৮) সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি গোলাপ বানু ২০১৪ সালে বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছেন।

(৯) বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি করোনাকালীন সদস্যদের প্রায় ৬

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মিসেস গোলাপ বানু

কোটি টাকার সুদ মওকুফ করেছে।

(খ) কমলগঞ্জ গুড নেইবার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ : নারীর ক্ষমতায়তনে কমলগঞ্জ গুড নেইবার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। (সমিতির রেজি : নং : ১৭৩; তারিখ : ১২/০৬/২০১২; ঠিকানা : গ্রাম-তেতইগাঁও, ডাক-আদমপুরবাজার, উপজেলা-কমলগঞ্জ, জেলা-মৌলভীবাজার)। কর্মএলাকা : সমগ্র কমলগঞ্জ উপজেলা। বর্তমান সদস্য সংখ্যা : ১,০৮৬ জন। সদস্য প্রকৃতি : মহিলা (মায়েরা)। কার্যকরী মূলধন ১,৪৯,৩৭,৪১১ টাকা। কর্মসংস্থান : ১,০৩০ জন। বার্ষিক বিক্রীত পণ্যমূল্য : ১৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা।। ঋণ বিতরণের হার : ৭৯%;ঋণ সংগ্রহের হার : ৭০%; ক্রয়কৃত জমির পরিমাণ : ১৮ শতক। সমিতিতে মোট ১০৩০ জনের আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে। এসব কর্মসংস্থানের মধ্যে রয়েছে গবাদি পশু ক্রয় খাতে ২৬৫ জন, তাঁত খাতে ২৩৫ জন, পান বরজ খাতে ৩০ জন, মৎস্যচাষ খাতে ৪০ জন, হাঁস-মুরগি খামার খাতে ১৪৫ জন, মুদি দোকান খাতে ৬৫ জন, কৃষিকাজে ১৬৫ জন, কম্পিউটার খাতে ৩০ জন, ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে ৪৫ জন এবং সেলাই খাতে ১০ জন।

কমলগঞ্জ গুড নেইবার সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্যরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সমিতির মাধ্যমে তাদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন। এসব পরিবর্তনকে আমরা নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করতে পারি :

(১) আগের তুলনায় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(২) আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। (আইজিজি ও সোস্যাল এন্টারপ্রাইজ গ্রুপের মাধ্যমে ঋণ নিয়ে গবাদি প্রাণী পালন, মৎস্য চাষ, হস্তচালিত তাঁত ইত্যাদি এবং একক ঋণের মাধ্যমে এসব কাজ করছে)।
(৩) মায়েদের মাধ্যমে শিশুদের/সদস্যদের শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
(৪) পারিবারিকভাবে তারা সচ্ছলতা লাভ করায় সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
(৫) সামাজিকভাবে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
(৬) স্বাস্থ্য সচেতনতা কার্যক্রমের ফলে নারীদের পুষ্টি সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে।
(৭) বাড়ির আঙিনায় সবজি চাষ প্রকল্পের ফলে উন্নতি হচ্ছে।
(৮) মায়েদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্লাটফর্ম সৃষ্টি হচ্ছে।
(৯) সদস্যদের আয় বৃদ্ধি হয়েছে।
(১০) তাদের নিজেদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(১১) পারিবারিক ও সমিতি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা/সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
(১২) পরিবার ও সমাজকে সহায়তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(১৩) সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবারের সম্পদের ওপর অধিকার হয়েছে এবং নিজের আয়ের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়েছে।
(১৪) পরিবারের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখতে পারছেন।
(১৫) অসমতা বা নারীর প্রতি অবহেলা সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে।
(১৬) চলাফেরায় স্বাধীনভাবে ও নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারছেন।
(১৭) নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেই স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারছেন।

৮. উপসংহার

সমবায় হচ্ছে নারী ও পুরুষ উভয়কেই সংগঠিত করে উন্নয়নের ধারায় আনয়ন করা। সমবায় অধিদপ্তর নারীর ক্ষমতায়নে তাই ব্যাপক ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীদের অধিকতর কর্মস্রোতে আনয়ন করাই এখন যুগের দাবি (Time Driven), চাহিদার দাবি (Demand Driven)ও কর্মআবহের দাবি (Situation Driven)। সমবায় অধিদপ্তর সে কাজটি সুচারুভাবে পরিপালনের জন্য নতুন আঙ্গিকে পরিকল্পনা করে এগিয়ে যাচ্ছে।

সমবায় অধিদপ্তরের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারাদেশে মোট সমিতির সংখ্যা ১,৯২,০২০টি এবং মোট ব্যক্তি সদস্যের সংখ্যা ১,১৫,০৯,৮২৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৮৮,৩৮,৫৯৬ জন এবং মহিলা সদস্য ২৬,৭১,২২৯ জন। (৩০%) মোট সমবায় সমিতির মধ্যে মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে ২৭,৩৮৮টি (১৪.৪২%)। এসব মহিলা সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৯,৭২,৩৪৯ জন।

আজ সারাদেশে নারীরা এসব সমবায় সমিতির মাধ্যমে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে চলেছেন। তারা অশিক্ষিত ও আধাশিক্ষিত নারীদের প্রচলিত প্রথাবদ্ধ অচলায়তনের বাইরে তাদেরকে নানা পেশা ও ব্যবসায়ে যুক্ত করেছে। তাদের আর্থিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি ঘটেছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং তারা পেয়েছে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদার সোপান। তারা যেন উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানাচ্ছে :

জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা।।

হরিদাস ঠাকুর : উপসচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়

পল্লী উন্নয়নে সমবায়

৪৮ তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত মেলায় বিজয়পুর রুদ্রপাল মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ-এর স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মোঃ জিল্লুর রহমান

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা ও নিরন্তর প্রচেষ্টা। সাধারণত উন্নয়ন বলতে বুঝায় মানুষের সঠিক অবস্থার পরিবর্তন। একটি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিশেষ ইতিবাচক অবস্থায় উপনীত হওয়াই উন্নয়ন।

ILO এর মতে, "বেঁচে থাকার জন্য মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণই হলো উন্নয়ন।"

অমর্ত্য সেন এর মতে, "মানুষের ক্ষমতার বিকাশই উন্নয়ন।"

UNDP এর মতে, "উন্নয়ন হলো একটি দেশের বা অঞ্চলের জনসমষ্টির গড় আয়ু, শিক্ষা ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি।"

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শহর-গ্রাম, নারী-পুরুষসহ সকল পেশার সকল মানুষের উন্নয়ন ঘটানো দরকার। বাংলাদেশ কৃষি ও গ্রামপ্রধান দেশ। সে হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে গ্রাম তথা পল্লীর উন্নয়ন ঘটানো দরকার।

পল্লী উন্নয়ন

সাধারণ অর্থে পল্লী উন্নয়ন বলতে পল্লীর জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে পল্লী উন্নয়ন বলতে বুঝায়, পল্লী এলাকার জনগণের জীবনধারণের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞানসম্মত কারিগরি দিকসমূহের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন।

ড. আখতার হামিদ খানের মতে, "পল্লী উন্নয়ন হলো একটি ধীমান মানুষ চালিত

প্রক্রিয়া যা পল্লীর সর্বস্তরের জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং সার্বিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।"

হাসানাত আব্দুল হাই এর মতে, "পল্লী উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পল্লীবাসীর পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং নিয়ন্ত্রণের এ দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সুফল লাভ নিশ্চিত করা যায়।"

প্রেসিডেন্ট লুসিয়ার নায়ার বলেন, "A rural development is a policy of national development."

সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, যে প্রক্রিয়ায় পল্লীর জনগণের উৎপাদন, আয়, বণ্টন, ভোগ, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়ন সাধন হয় তাকে পল্লী উন্নয়ন বলে।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়নের গুরুত্ব

গ্রামাঞ্চলে অবস্থানরত সাধারণ জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের প্রক্রিয়া হলো পল্লী উন্নয়ন। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৮০ ভাগ মানুষই গ্রামে বাস করে। সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় না এনে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। গ্রামাঞ্চলগুলোতে জীবিকা নির্বাহের পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকার ফলে শহরাঞ্চলে অতিরিক্ত চাপ লক্ষ করা যায়। এ কারণে শহরগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বসবাস অযোগ্য বস্তি গড়ে ওঠে যা সেখানে এবং আশপাশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। দেশের জনগণের এই অতিরিক্ত শহরকেন্দ্রিকতা যে কখনোই সুফল এনে দিতে পারে না তা বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে প্রমাণিত হয়েছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিসংখ্যান (২০১৯) এর তথ্যানুসারে ৬৮.৮% মহিলা পারিবারিক অর্থনীতিতে ভারসাম্য রাখতে শহরে গমন করে এবং ৮৫.৩% পুরুষ উচ্চ আয়ের আশায় শহরে কিংবা বিদেশে গমন করে। এদের বেশিরভাগই ঢাকায় (৬৮.১%) এবং চট্টগ্রামে (১৫.৭৭%) স্থিতিশীল হয়। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলগুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। করোনা ভাইরাসের মতো এই ভয়াবহ মহামারিতেও দেখা যাচ্ছে টেস্ট, চিকিৎসা এবং এ সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদনে গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত জনগণকে অতিরিক্ত ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। সাধারণ অবস্থাতেও উন্নত চিকিৎসা সেবা পেতে মানুষকে শহরের দিকে যেতে হয়। এছাড়া দেশের এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। পল্লী উন্নয়ন যেসব বিষয়াদির কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তার অন্যতম একটি হলো অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। দেশের আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুন্দর এবং সহজ করবার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে এবং কিছু চলমান রয়েছে। তবে সমসাময়িক পরিস্থিতি বিবেচনায় পল্লী উন্নয়নকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে।

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও দেশি বিদেশি এনজিও পল্লী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া ব্রাক, আশা, প্রশিকার মতো প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। বিগত শতকে পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু মডেল উদ্ভাবন করা হয়। ১৯০৪ সালের গ্রামীণ সমবায় ব্যাংক, ১৯৫৩ এর V- AID কর্মসূচি, ১৯৬০ এর দশকের কুমিল্লা মডেল ইত্যাদি। ডঃ আখতার হামিদ খানের কুমিল্লা মডেল বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং এটি বিশ্বের সকল অনগ্রসর রাষ্ট্রের পল্লী উন্নয়নের জন্য আদর্শস্বরূপ। কুমিল্লা মডেল প্রধান যে ৪টি কর্মসূচি গ্রহণ করে তা হলো; পল্লীপূর্ত কর্মসূচি, থানা সেচ কর্মসূচি, থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র এবং দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়। তাছাড়া ১৯৯০ এর দশকে বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘ গবেষণার পর 'লিংক মডেল' উদ্ভাবন করা হয় যা বর্তমানেও বিভিন্ন সময়কাল অনুযায়ী দেশের ৬৪টি জেলার ২০০টি উপজেলার ৬০০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য এর আলোচ্যসূচি ২০৩০ এ বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের বেশ কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। পল্লী অঞ্চলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ উক্ত আলোচ্যসূচিতে বিভিন্ন লক্ষ্য তুলে ধরা হয়। আর বিভিন্ন সময়ে সমবায়ের মাধ্যমে সারাদেশে পল্লী উন্নয়নের একটি অন্তর্মুখী স্রোত নিঃশব্দে বহমান।

গ্রাম তথা পল্লী উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনা

বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু দায়িত্ব পালন করেন। সমবায়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার ২য় খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর অন্যতম উন্নয়ন দর্শন ছিল সমবায়। বঙ্গবন্ধু সমবায়ী গ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের চিন্তা করেছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু সমবায়ী গ্রাম সংক্রান্ত তাঁর প্রস্তাবটি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন,

"সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই, যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। আমি আপনাদের সমর্থন চাই। আমি জানি আপনাদের সমর্থন আছে কিন্তু একটা কথা, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে, জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান-এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের কাছে, টেষ্ট রিলিফ যাবে তাদের কাছে, ওয়ার্কাস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল টাউটদেরকে বিদায় দেওয়া হবে তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। এই জন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্লানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পালসারি কো-অপারেটিভ হবে।

আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভের হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্টের হাতে।...

আমার যুবক ভাইরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুল প্যান্টটা একটু হাফ-প্যান্ট করতে হবে। পাজামা ছেড়ে একটু লুঙ্গি পরতে হবে। আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে।" (সূত্র : 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ', পৃ : ২৭৭, ২৭৯, সম্পাদনায় মিজানুর রহমান মিজান, হাওলাদার প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২১)।

বঙ্গবন্ধুর উপর্যুক্ত বক্তব্য থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে আসে। প্রথমত, তিনি যৌথ চাষের প্রস্তাব করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, উৎপাদিত (নিট) ফসল তিনভাবে বিভক্ত হবে। একভাগ বিতরণ হবে গ্রাম তহবিলে।

দি কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব) কক্সবাজারে আয়োজিত 'বাংলাদেশ ক্রেডিট ইউনিয়ন ফোরাম-২০১৯'-এর অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি এবং সমবায় অধিদপ্তরের প্রাক্তন নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

এই তহবিল দিয়ে গ্রামের জন্য কল্যাণকর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হবে। (এই ভাগের বিষয়টি বঙ্গবন্ধু অন্যত্র আরও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেন)। তৃতীয়ত, বঙ্গবন্ধু বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, জমির মালিকানা অক্ষুণ্ন থাকবে। জমির মালিকদের তিনি আশ্বস্ত করেছেন যে, তাদের জমি নিয়ে নেওয়া হবে না। চতুর্থত, তিনি এমন সমবায়ের কথা ভেবেছেন যা গ্রামের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করবে, শুধু কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে জড়িতদের নয়। সেকারণেই বঙ্গবন্ধুর সমবায় ছিল 'বহুমুখী' সমবায়। শুধু ফসল উৎপাদন এবং তার ভাগ-বাটোয়ারাই এই সমবায়ের উদ্দেশ্য ছিল না। অন্যান্য বিভিন্নমুখী তৎপরতা পরিচালনাও এসব সমবায়ের লক্ষ্য ছিল। পঞ্চমত, তিনি গ্রামোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয়, তথা গ্রামের বাইরের সকল সম্পদও গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে প্রবাহিত করার কথা ভেবেছেন। (বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম, নজরুল ইসলাম-পৃ.৭,৮)

সমবায় সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা ছিল গভীর এবং ব্যাপক

১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে তা স্পষ্ট হয়। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, সমবায়ের পথে সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ। সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকেরা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুসম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার, ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তি দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি ও অন্যান্য উপাদান সমবায়ের মাধ্যমে একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।... আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য; শ্রমিকেরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার।...অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন-কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান। আপনারা জানেন যে, সমবায় সংস্থাগুলিকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করেছি যে, সংস্থার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোন আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপর নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে, সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে। জেলে সমিতি, তাঁতি সমিতি, গ্রামীণ কৃষক সমিতি যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়; মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। আমার প্রিয় কৃষক, মজুর, জেলে, তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন

ও সুসম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।" (বারকাত ২০১৫, পৃ. ৯৪-৯৫,বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম, নজরুল ইসলাম-পৃ.১০.১৪)।

পল্লী উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ এবং সমবায়ের ভূমিকা

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ এবং এসব ক্ষেত্রে সমবায় কীভাবে কাজ করতে পারে তার একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা নিম্নরূপ :

কৃষি উন্নয়ন

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। দেশের মোট জাতীয় আয়ের একটি বিরাট অংশ আসে কৃষিখাত থেকে। কৃষির উন্নয়নই হলো এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত। সুতরাং, পল্লীর সার্বিক উন্নয়ন ব্যতীত কৃষির উন্নয়ন সম্ভব নয়। পরিকল্পিত পল্লী উন্নয়ন শুরু হলে গ্রামের অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আসবে এবং তার ফলে কৃষির আধুনিকায়ন সম্ভবপর হবে যার সুফল শিল্প বাণিজ্যসহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে পড়বে। গ্রামীণ দরিদ্র জনসংখ্যার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

সমবায়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি জৈবজ্বালানির ব্যবহার, আইলবিহীন চাষাবাদ প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবিক উন্নয়ন, ব্যক্তির মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীল বিকাশের একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে পারে সমবায়। সমবায় সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে সমাজ ও সমস্যাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে তার সদস্যদেরকে দক্ষ উদ্যমী করে তুলতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ব্যক্তি মানুষ বিপুল সম্ভাবনার অধিকারী।' সমবেত প্রচেষ্টায় ব্যক্তি মানুষের সম্ভাবনাকে বাস্তবে কাজে লাগানো সম্ভব।

প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, উন্নত প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন দল বা এলাকাতে মতবিনিময় কর্মসূচির আয়োজন, বিশ্লেষণধর্মী সাপ্তাহিক আলোচনা, সেমিনার ও কর্মশালায় যৌথ সামাজিক ক্রিয়া ও আর্থসামাজিক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবিক উন্নয়নের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সমবায় সমিতি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

নেতৃত্বের বিকাশ

সমবায় সমিতি নেতৃত্ব তৈরি ও বিকশিত করার একটি উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। সমবায়ের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের চর্চা হয়ে থাকে। সমবায় সমিতি পরিচালিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্য হতে নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা এবং সেই পরিচালনার কাজটিও হয় নিজেদের সুলিখিত ও বিধিবদ্ধ উপ-আইন অনুসরণ করে। ফলে নেতৃত্ব বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তাও সমবায়ের মাধ্যমে তৈরি হয়।

মূলধন সরবরাহ

মূলধনের অভাবে গ্রামের দরিদ্র জনগণ কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কাজ করতে পারছে না। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য করার জন্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে মূলধন তৈরি হচ্ছে। সমবায়ীরাও এ মূলধন বিনিয়োগ করে দারিদ্র্য দূরীকরণে সক্ষম হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ১,৯২,০২০টি সমবায় সমিতি রয়েছে যার কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৪,৪৯২.১৪ কোটি টাকা।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সমবায় সমিতির মাধ্যমে গঠিত সঞ্চয় ও মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রসার ঘটানো সম্ভব। আর এসব কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে সমবায় সমিতির সদস্যদের অংশগ্রহণে কর্মসংস্থান তৈরি হয়। এভাবে সমবায় সমিতিগুলো বেকারত্ব নিরসনকল্পে তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে খাল ও পুকুরে মৎস্য চাষ, উপকূল এলাকার মৎস্য আহরণ, তাঁত শিল্প, ভূমিহীন বর্গাচাষিদের জন্য কৃষি উপকরণ বিতরণ, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়ন, পণ্যের বাজারজাতকরণ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের ব্যাপক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, ২০১৯-২০২০ অর্থবছর শেষে সমবায় সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৯ লক্ষ ২৫ হাজারের অধিক মানুষের।

নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হলো নারী। কাজেই নারীদের অবস্থার উন্নয়ন ছাড়া দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। এ লক্ষ্যে সমবায় সমিতিগুলো নারী শিক্ষার প্রসার, নারীদের আয়বর্ধনমূলক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য হাঁস-মুরগি পালন, গরু ছাগল পালন, রেশম চাষ প্রকল্প মৌমাছি পালন, ধানভাঙা, চিড়া-মুড়ি তৈরি, কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প যেমন : বাঁশ, বেত, মাটি ও কাঠের কাজ প্রভৃতি সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে।

উল্লেখ্য, সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৭,৩৮৮টি, যার সদস্য সংখ্যা ৯,৭২,৩৪৯ জন। এবং মোট মাহিলা সদস্য ২৬,৭১,২২৯ জন। শুধুমাত্র মহিলা সমবায় সমিতিসমূহের মোট শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১৯,৯৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমান ২২,৯১৬.৪০ লক্ষ টাকা।। সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতির মধ্যে মোট মহিলা সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৬,৭১,২২৯ জন। ২০১৯-'২০ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তরের ১১ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৭২০০ জন মহিলা সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে সারাদেশে ২,৪৯,৯৩৭ জন নারী সমবায়ীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। অনগ্রসর মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক "উন্নতজাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবযাত্রার উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। এ প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০ নারীকে স্বাবলম্বী করার জন্য প্রত্যেককে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে গাভি ক্রয় বাবদ ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পায়ন

দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলো নিজস্ব উদ্যোগে সমিতির সদস্যদেরকে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও ঋণ দিচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বিস্তার ঘটছে। ফলে দারিদ্র্য দূরীভূত হচ্ছে এবং পল্লীর উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

সমবায় বাজার ব্যবস্থাপনা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ

সমবায় বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একদিকে যেমন কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রদান করা সম্ভব অপরদিকে মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপসাধন করে ন্যায্যমূল্যে পণ্যসামগ্রী ভোক্তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি ইত্যাদি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতি অন্তর্ভুক্তির পর। বর্তমানে দেশে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৬৩৯টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ২৭,৯৭৪ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৭৮১.৭৯ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১,৫৯৫.৫৬ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৭৮.২৮ লক্ষ টাকা এবং নিট লাভের পরিমাণ ১৬৭.২৮ লক্ষ টাকা। সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য

রংপুরে কান্ডারী বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ পরিচালিত 'গুড হেল্‌থ হাসপাতাল' পরিদর্শন করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরকে অনেক বেশি কাজ করতে হবে অনেক দূর যেতে হবে। সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যাটি এখন প্রকট। বিশেষত উৎপাদনমুখী সমবায় সমিতিগুলো এ সমস্যায় ভুগছে সবচেয়ে বেশি। এটি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দেরও অবগতিতে আছে। সমবায় অধিদপ্তর এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য বেশ কিছুদিন ধরে চিন্তাভাবনা করে আসছে এবং ই-মার্কেটিং, উপজেলা স্তরে সমবায় বাজার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেওয়ার কাজ শুরু করেছে।

বনায়ন

সমবায় সমিতিগুলো বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে সমিতির জায়গা ও সমিতির সদস্যদের জায়গায় বিপুল পরিমাণ বৃক্ষরোপণ করছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ও বিরাট ভূমিকা রাখছে।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

সরকারের পাশাপাশি সমবায় সমিতির মাধ্যমে দুর্গত মানুষের সহায়তা করা সম্ভব। সমবায় আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমবায় সমিতিগুলো সমিতির সদস্যসহ অন্যান্য সাধারণ জনগণকে দুর্যোগকালে তাদের সামর্থ্য অনুসারে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ করে চলেছে। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-২০১৯ বা করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতি অসহায় মানুষকে সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। এ পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ১ হাজারটি সমবায় সমিতি ২ লক্ষ অসহায় মানুষকে প্রায় ১০ কোটি টাকা মূল্যের ত্রাণসামগ্রীসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেছে।

অন্যান্য কার্যক্রম

উপরে বর্ণিত কার্যক্রমের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়নের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার, গণসচেতনতা তৈরি, স্বনির্ভর কর্মী সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা সম্ভব।

বাংলাদেশ গ্রামপ্রধান দেশ। আধুনিক নগর রাষ্ট্রের গতির সাথে তালমিলিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সরকার। উন্নয়নের দুটি চাকা শহর ও গ্রাম। একটি চাকাকে অচল কিংবা কম সচল রেখে অপর চাকার গতি বাড়ানো সম্ভব নয়। তাই শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ তথা পল্লী উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। অনেক উন্নয়ন পদ্ধতি থাকলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমবায়কেই পল্লী উন্নয়নের প্রধান প্রায়োগিক পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেওয়া যায়। জাতির পিতার উন্নয়ন দর্শনও ছিল সমবায়। সমবায়ের মাধ্যমেই একটি সুখী-সমৃদ্ধ-সোনার বাংলাদেশ গড়ে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

মোঃ জিল্লুর রহমান : যুগ্ম-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

সমবায় সেক্টরের উন্নয়নে
শেখ হাসিনার সরকার

৪৯তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে ভাষণ প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মুহাম্মদ গালীব খান

টুঙ্গিপাড়ার দুরন্ত কিশোরের স্বপ্নমাখা চোখ মুক্ত আকাশে মুক্তির নিশানায়। মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। সে মুক্তি চাওয়ার উদ্দামতা-একদিন ছাড়িয়ে যায় তেপান্তরের সীমানা। যা স্বাধিকার আন্দোলনে পরিণত হয়ে বয়ে আনে চূড়ান্ত মুক্তি। মানচিত্রে ঠাই হয় নতুন একটি দেশের, বাংলাদেশ। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহু ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে স্থাপন করেছিলেন হানাদার মুক্ত একটি দেশ। তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন যে "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে "সমবায়ের কাজে যারা দক্ষ, তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং তারা যেন সৎভাবে কাজ করে, সেই বিষয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। ইনশাল্লাহ, তবেই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।" জাতির পিতার রক্তের উত্তরাধিকারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে বাংলাদেশের ক্ষমতা গ্রহণের পর বাংলাদেশের সমবায় অঙ্গনে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। ২০০৯ থেকে চলতি সাল পর্যন্ত সমবায় অধিদপ্তর ও এর আওতাভুক্ত সমবায় সমিতি গুলোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।

১. সক্ষমতা বৃদ্ধি

২০০৯ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের সময় অর্থাৎ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর ও এর আওতাধীন দপ্তর

সমূহের জন্য পরিচালন (অনুন্নয়ন) বাজেট ছিল ৫৮,৪৩,০৩,০০০ টাকা যা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৮৬,৩২,৮৩,০০০ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ বৃদ্ধির হার ৩৯০.০৩%। একইসাথে সমবায় অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেট ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ছিল ৫,২০,০০,০০০ টাকা যা ২০২০-২০২১ সালে হয়েছে ৬,১৭,০০,০০০ (সারণি-১)।

১.১ অফিস সরঞ্জাম, লজিস্টিক ও অন্যান্য : ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ভ্রমণ ব্যয়, প্রশিক্ষণ ব্যয়, গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়, কম্পিউটার ক্রয়, অফিস সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র খাতে বরাদ্দ ছিল ২,৮২,০০,০০০ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ৪৩,৯৭,৭৩,০০০ টাকা। (সারণি-১)

যানবাহন : ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর পর্যন্ত মোট অনুমোদন ও বিদ্যমান যানবাহনের সংখ্যা ছিল ৩৭। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যা এসে দাঁড়িয়েছে ১,১৫২। এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ৩০১৩.৫১%। (সারণি-২)
জনবল : আলোচ্য সময়ে জনবল নিয়োগ, শূন্যপদে পদোন্নতি প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য রয়েছে।

১.২ সমবায় ভবনের বর্ধিতাংশ : আগারগাঁও সমবায় ভবনের ওপরে অফিস, প্রশিক্ষণ রুম, সেমিনার ও অত্যাধুনিক মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা হয়েছে। সমবায় একাডেমিসহ অন্যান্য জায়গায়ও বিপুল পরিমাণে পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের বর্ধিত অংশ উন্নয়নে ৩,৪৮৮.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। (সারণি-২)

সমবায় অধিদপ্তরের গৃহীত কর্মকাণ্ড

(ক) ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ
সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের গঠনমূলক পরামর্শ প্রদানের জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ দল গঠন করা হয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ দল কর্তৃক সমবায় সমিতিতে গিয়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদি পশুপালন, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০০৯ হতে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট এর মাধ্যমে ৭,১৮,২০৮ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) কর্মসংস্থান
সরকারের সমবায়বান্ধব নীতির কারণে এবং সমিতির পুঁজিপ্রবাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সৃষ্ট ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত মোট কর্মসংস্থান ৯,২৫,৬৯৯ জনের। মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ সরকারের সময়ে এটি একটি উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড।

এছাড়াও সমবায় অধিদপ্তরের ১১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেসিক কম্পিউটার, ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্ক, মোবাইল সার্ভিসিং, ব্লক ও বাটিকের কাজ, ক্রিস্টালের কাজ, সেলাই, মৌ-চাষ, মাশরুম চাষ, মৃৎশিল্প ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান হয়ে থাকে।

(গ) আইন সংশোধন
২০১৩ সালের সরকার সমবায় আইন সংশোধন করতঃ যুগোপযোগী করেন। এই আইন সংশোধনের ফলে সমবায় সেক্টরে আর্থিক অনিয়ম রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ফলে সমবায় অঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসে এবং দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে নানা আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সুষ্ঠু পরিবেশের ফলে সমবায়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, মহিলাদের উন্নয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়।

(ঘ) জনবান্ধব সমবায়
জনবান্ধব সমবায় গঠনের লক্ষ্যে সরকার গত ১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সমবায় বিধিমালা ২০০৪ এর সংশোধন করেছেন। ফলে সমবায় আইন ও বিধিমালা অধিকতর যুগোপযোগী ও কার্যকর হয়েছে। এই সংশোধনীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটেছে। এখন সমবায়ীদের উৎপাদনমুখী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পেশাজীবী নৃতাত্ত্বিক, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও পর্যটন ক্ষেত্রে সমবায় সমিতির গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২.১ প্রশিক্ষণ : বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি কোটবাড়ি, কুমিল্লা এবং এর আওতাভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে মোট ১,৫৭৩ জন সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সমবায়ীকে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, আয়বর্ধকমূলক ট্রেড ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দাঁড়ায় ৮৭,১৪২ এ। যার শতকরা হার ৫৩০.৬৪%।

সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে অর্জন

সমিতির সংখ্যা : সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগেও বিভিন্ন ক্যাটাগরির সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। প্রতিবছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সমিতির সংখ্যা ছিল ১,৬৯,৩০৫টি যা বর্তমান সময়ে সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৯২,০২০টি (২০১৯-২০২০ পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। ২০০৯ থেকে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ১,৩৯,৪৯৯টি সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে ২০০৯ এবং ২০২০ সালের সমবায় সমিতির তথ্য লেখচিত্রে তুলে ধরা হলো।

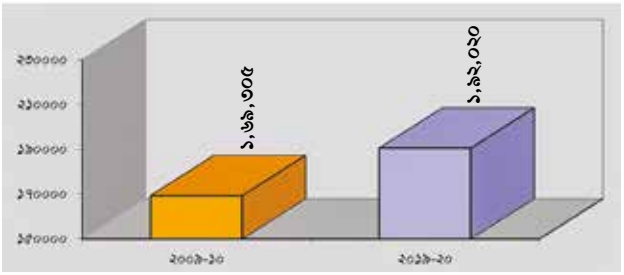

সমিতির সদস্য সংখ্যা : উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। সমবায় নিম্নবিত্তের সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হলেও বর্তমানে সকল শ্রেণির বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থসামাজিক উন্নতির একটি পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রাখছে। বিগত দশ বছরের সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান (জুন ২০২০ পর্যন্ত) সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,১৫,০৯,৮২৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৮৮,৩৮,৫৯৬ জন, এবং নারী সদস্য ২৬,৭১,২২৯ জন।

শেয়ার মূলধন : দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহৎ মূলধন তৈরি এবং উক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করাই হচ্ছে সমবায়ের লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল। যার প্রধান উৎস হলো সদস্যদের নিকট বিক্রীত শেয়ার। ২০০৯ সালে সমিতির শেয়ারের পরিমাণ ছিল ৫৯১.৮৬ কোটি টাকা যা জুন, ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১,৭৯৩.৪৯ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির শেয়ার

মূলধনের তথ্য নিম্নের লেখচিত্রে তুলে হলো।

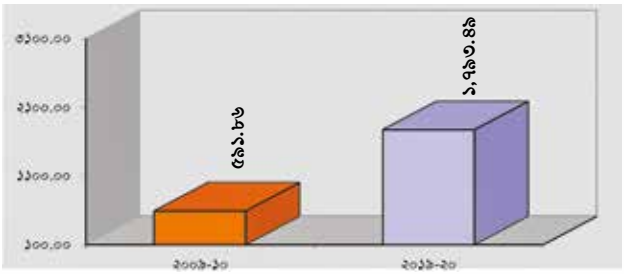

সঞ্চয় আমানত : সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে শেয়ারের পরে সঞ্চয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে সমিতিতে সঞ্চয় জমা করে তা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকে। ২০০৯ সালে সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ছিল ৩,৬৫৫.৭৫ কোটি টাকা যা জুন ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৮,৫৯৪.৩২ কোটি টাকা।

কার্যকরী মূলধন : সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে থাকে। ২০০৯ সালে সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬,৬৯২.১৬ কোটি টাকা যা মার্চ, ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৪,৪৯২.১৪ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের তথ্য নিম্নের লেখচিত্রে তুলে ধরা হলো।

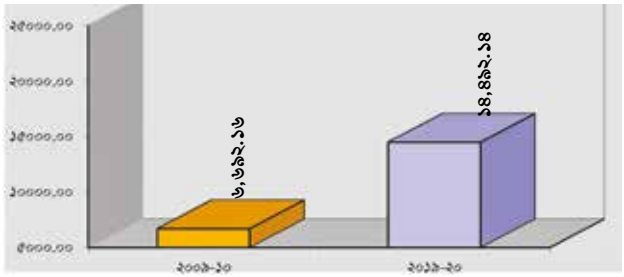

মোট সম্পদ : সমবায় সমিতির ভৌত সম্পদ, বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ, মজুত তহবিল ইত্যাদির মোট পরিমাণ হচ্ছে মোট সম্পদ। ২০০৯ সালে সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ ছিল ২,৪৭৬.২৩ কোটি টাকা যা জুন, ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৫,৯৮৩.২৫ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির মোট সম্পদের তথ্য লেখচিত্রে তুলে ধরা হলো।

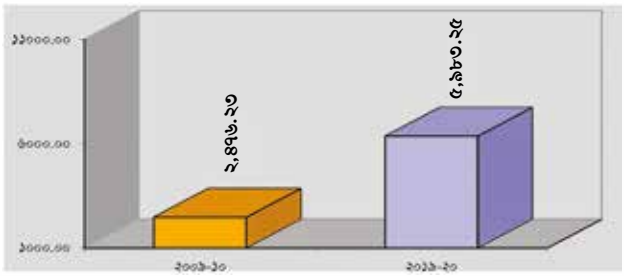

৩. সরকারের সমবায়বান্ধব নীতি ও সহায়তার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনার নারীবান্ধব কর্মকাণ্ড দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীদের সমাজের বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করেন। সমবায় সেক্টরেও এর সার্থক প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই।

সরকার ও সমবায় বিভাগের নারী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বেশকিছু মহিলা সমিতি ও মহিলাসম্পৃক্ত সমবায় সমিতি সফলতার শীর্ষে উঠে এসেছে। এর মাধ্যমে নারীরা সমবায়ে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেদের উন্নয়নের পাশাপাশি সংসার ও সমাজে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নে সমবায়ের প্রয়োগিকতাকে তুলে ধরছেন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ রকম সফল মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। উদাহরণ হিসেবে আমরা বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতির উদ্যোক্তা গোলাপ বানুর নাম উল্লেখ করতে পারি। একদম প্রান্তিক অবস্থা থেকে তিনি আজ নারী উন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি সমবায়ের পতাকাতলে এসে রাষ্ট্রীয়ভাবে হয়েছেন শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও রোকেয়া পদকজয়ী জয়িতা।

সমবায়ের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের ওপর একটি গবেষণা চালানো হয়। উক্ত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ :

(১) ক্ষমতায়নের অন্যতম শর্ত হলো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা এদেশে এক সময় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু নারী যখন থেকে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে বিভিন্ন কাজে বা সংগঠিত হওয়া শুরু করেছে তখন থেকেই তা ক্রমে কাটিয়ে উঠছে। সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে নারীকে ঘরের বাইরে আসতে হয়। এতে নিজের বা বাইরের জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সমিতির সদস্য হওয়ার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারীর অংশগ্রহণ। স্থানীয় সরকার সহ যেকোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী নেতৃত্বে আসা ক্ষমতায়নের একটি বড় মাপকাঠি। সমবায় সমিতির নারী সদস্যগণের অংশগ্রহণ রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সমবায় সমিতির মধ্যে ৪৫% ভাগ সমিতি থেকে এর নারী সদস্য স্থানীয় সরকার বা জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। এখান থেকে বলা যায়, সমবায় সমিতি নারী নেতৃত্ব সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। এসব অংশগ্রহণ করা নারীর মধ্যে ৫৮% ভাগ নারী নির্বাচনে জয় লাভও করেছে। এতে বুঝা যায়, নারী নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতাও বেশি ছিল বলে জনগণের ভোটে জয় লাভ করেছে। নারীর ক্ষমতায়নের নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাপকাঠিতেও সমবায়ের ভূমিকা রয়েছে। তবে এ হার বাড়াতে সমবায় সমিতি আরো উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি নিতে পারে।

(৩) সমিতি নারী সদস্যদের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। একটি গবেষণায় দেখা যায় সমবায় সমিতির ৯৬% ভাগ নারী সদস্য আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। অর্থাৎ, এতে বুঝা যায় সমিতিগুলো আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে এবং বেশিরভাগ নারীকে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। সমিতিতে যুক্ত হয়ে নারী সদস্যগণ তাদের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমবায় সমিতির ৯৭% ভাগ নারীর সমিতির সদস্য হওয়াতে আয় বৃদ্ধি ঘটেছে।

(৪) নারী সমবায়ীর যে ৫৫% ভাগ উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িত তাঁরা নানা ধরনের পণ্য উৎপাদন করে থাকেন। গবেষণা তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৩৩% ভাগ সেলাই কাজ (পোশাক) এর সাথে জড়িত এরপরই রয়েছে কৃষিজ পণ্য যেমন : সবজি, ধান ইত্যাদি উৎপাদন করে থাকেন। এ ছাড়া হাঁস-মুরগি উৎপাদন করেন ১৭% ভাগ নারী সমবায়ী, ব্লক-বাটিকের কাজ করেন ১০%

৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্টল পরিদর্শন।

ভাগ এবং ০৮% ভাগ করে উত্তরদাতা ছাগল, গাভি পালন ও দুধ উৎপাদন এবং কাপড়ে হাতের কাজের নকশা উৎপাদনের সাথে জড়িত। গবাদি পশুপালন (০৭%), মাশরুম ও মাছ চাষ ও মাছের ডিম উৎপাদন (০৬%) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে এটি বলা যায় যে, উৎপাদিত পণ্যে নারীর আরো অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন রয়েছে। কারণ খুব কম সংখ্যক নারী বেশি উৎপাদনের সাথে জড়িত। এতে দেখা যায়, নারীর প্রকৃত আর্থিক ক্ষমতায়ন করাতে হলে বেশি সংখ্যক সম্ভব হলে সকল নারী সমবায়ীকে উৎপাদনের সাথে জড়িত হতে হবে।

৪.১ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের কার্যকর পরিকল্পনার আলোকে সমবায় অধিদপ্তরের গৃহীত কর্মকাণ্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার দেশের জনগণের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করছেন। এসব কর্মযজ্ঞের গন্তব্য বর্তমান ছাড়িয়ে ২১০০ পর্যন্ত বিস্তৃত। সরকারের নীতি ও পরিকল্পনার আলোকে আগামী ২১০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার পরিকল্পনা সোপান-

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার মাইলফলক :

(১) ২০২১ সাল : ডিজিটাল বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের দেশ।
(২) ২০৩০ সাল : এসডিজির জাংশন অতিক্রম।
(৩) ২০৪১ সাল : উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।
(৪) ২০৭১ সাল : সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে বিশ্বের বুকে অনুকরণীয় অবস্থানে গমন।
(৫) ২১০০ সাল : ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণতকরণ।

উন্নয়ন পরিকল্পনার মহাসড়কে সমবায়কে সার্থকভাবে উত্তরণের জন্য সমবায়ভিত্তিক বেশ কিছু প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ও হচ্ছে। এসব প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠীর হতদরিদ্র মানুষকে সমবায় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে :

(১) সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি;
(২) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (Copmprehensive Village Development Programme- CVDP)
(৩) Family Welfare and Income Generation Activities Through the Rural Co- operatives
(৪) গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন।
(৫) সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ।
(৬) 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে'র আওতায় পরিচালিত সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কম্পোনেন্ট।
(৬) বৃহত্তর ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্প।
(৭) দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রমস সম্প্রসারণ প্রকল্প। এসব প্রকল্পের কয়েকটি শুধুমাত্র নারীদের জন্য পরিচালিত। অন্যগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকল্পের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হলো :

৫. অন্যান্য প্রকল্প

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের সাথেও সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমের সম্পৃক্ততা রয়েছে। বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত থেকে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব কার্যক্রমের ২০১৯-২০ অর্থবছরের অগ্রগতি নিম্নরূপ :

৫.১ আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। সমাজের আশ্রয়হীন, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, আত্মকর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে সচেতন ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই "আশ্রয়ণ প্রকল্প"গ্রহণ করা হয়। বিগত ৩০ জুন ২০০২ সালে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে আবাসন প্রকল্প নামে আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে মে,২০০৯ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প ফেইজ-২' নামকরণ করা হয়। ২০১৩ সালে 'আশ্রয়ণ-২' নামক আরো একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭,২১৫টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৫৮,৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় জুলাই, ২০১০ জুন, ২০২২ (সংশোধিত) মেয়াদে ২.৫০ লক্ষ ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৯৩২.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৯২,৩৩৬টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়ছে। (তন্মধ্যে ৪৮,৩২৫টি ভূমিহীন পরিবার ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে, ভিক্ষুক পুনর্বাসনসহ "নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ কর্মসূচির"আওতায় ১৪৩,৭৭৭টি পরিবারকে তাঁদের নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য ২৩৪টি টং ঘর ও বিশেষ ডিজাইনের ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩টি ফেইজে মোট প্রায় ৪ লক্ষ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। সারা দেশে জুন ২০২০ পযর্ন্ত ১,৪৭০টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে, সদস্য সংখ্যা ১,৫৯,৬৮২ জন, শেয়ার মূলধন ১০৪.৭৯ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫৪০.৪০ লক্ষ টাকা।

সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/ আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সমবায় অধিদপ্তর উপজেলা বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও তার নিবন্ধন করে, যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। মাঠপর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ঋণ আদায় করে থাকেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদেরকে নিয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন এবং তাদের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন।

আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০ হাজার পুনর্বাসিত পরিবারের অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্য ৫০ কোটি টাকা সংস্থান রয়েছে। ঋণ আদায় ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমগুলোকে ঋণ আদায়ের মাসিক অগ্রগতি, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক), অডিট অগ্রগতি প্রতিবেদন, অভিযোগ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ভাগ করে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের কার্যক্রমের শুরু হতে সমবায় অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সরাসরি তত্ত্বাবধান করছেন। সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ আশ্রয়ণ প্রকল্পের পুনর্বাসিতদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও আদায় কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালনসহ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের বাৎসরিক লেনদেনের হিসাব নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা করে আসছেন। সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ এ নিরীক্ষা কাজটি নিয়মিত করে আসছেন বিধায় প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের হিসাব হাল নাগাদ রয়েছে।

৫.২ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্রবিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূউপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের অডিট, নির্বাচনসহ অন্যান্য বিধিবদ্ধ কার্যাবলি নিয়মিত পরিচালনা করে থাকে। জুন'২০ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৩৩৩টি।

৫.৩ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প

দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভূ-সম্পদ ও জলাশয়ের ব্যবহার এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধি তথা আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় এলজিইডি কর্তৃক "ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" বাস্তবায়ন চলছে। উক্ত প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং টেকসই ভিত্তি (Sustainability) এর জন্য প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। এ লক্ষ্যে উভয় দপ্তরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে সমবায় অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। সারাদেশে ২০১৯-'২০ অর্থবছরে নিবন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি সংখ্যা ১,৩৩৮টি।

সমবায় সেক্টরে পাবসসের ভূমিকা

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের একটি উপ-প্রকল্প তথা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। পানি একটি অত্যন্ত

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত ৪৮তম জাতীয় সমবায় দিবসের অনুষ্ঠানে 'সমবায় পণ্য মেলা' পরিদর্শনকালে ই-কমার্স সমবায় বাজার উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

দুষ্প্রাপ্য অথচ এই কৃষি ও মৎস্য প্রধান দেশে অত্যাবশ্যকীয় প্রাকৃতিক সম্পদ। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি(পাবসস) একদিকে প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের শস্যের নিবিড়তা বাড়িয়ে অধিক উৎপাদন ঘটায় অপরদিকে তাদের আর্থসামাজিক সচ্ছলতার জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে।

৫.৪ পাবসস ওয়াটার সেল গঠন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে নিবন্ধিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহকে সফল করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকাকে আহ্বায়ক করে গবেষণা শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ৬১ জেলা সমবায় কর্মকর্তা ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ৬১ জন পরিদর্শককে অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রীয়ভাবে সমবায় অধিদপ্তরে একটি পাবসস 'ওয়াটার সেল' গঠন করা হয়। যার মাধ্যমে সারাদেশের পাবসসসমূহকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য ওয়াটার সেলে নিযুক্ত পরামর্শকগণের সহযোগিতায় সেলের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে মাঠপর্যায়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ওয়াটার সেলের মাঠপর্যায়ে সদস্যদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও পাবসসসমূহকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট হিসেবে প্রয়োজনীয় যানবাহন (মটরসাইকেল), কম্পিউটার ও আসবাবপত্র সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত ১২২টি মটরসাইকেল, সমবায় অধিদপ্তরের টি ও এন্ড ই ভুক্ত করে উপজেলা সমবায় কার্যালয়ে বরাদ্দ প্রদান করেছে।

পরিশেষ

নিজেদের চাহিদা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায়ীরা দেশব্যাপী নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ীদের আইনগত প্রশিক্ষণ ও নানামুখী প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সমবায় কার্যক্রম চালাতে সমবায়ীদের সহায়তা অব্যাহত রেখেছে। উন্নয়নের ও আত্মমর্যাদার বলে বলীয়ান সমবায় সমিতিগুলো দারিদ্র্য হ্রাস, অভাব পূরণ ও নানা সূচকে আরো সফল ও কার্যকর হবে।

মুহাম্মদ গালীব খান : উপনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বিআরডিবি

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু

ভূমিকা

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, শতাব্দীর মহানায়ক, বাঙালি জাতির চির অহংকার, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিব—কেবল একটি নাম নয়, বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্মের রূপকার এবং বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার অবিসংবাদিত নেতা। নিপীড়িত, শোষিত বাংলার মানুষের সংগ্রামী কণ্ঠস্বর—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যুদ্ধবিধ্বস্ত ভঙ্গুর অর্থনীতি, খাদ্যে হাহাকারের একটি দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার মহান ব্রত নিয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, চিরদুঃখী বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন এই মহান নেতা। তিনি বলেছিলেন, 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে—এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।' যেহেতু স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল একটি গ্রাম অধ্যুষিত রাষ্ট্র, অনিবার্যভাবেই বাংলাদেশের উন্নয়নে পল্লী বাংলার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ছিল বঙ্গবন্ধুর মূল রাজনৈতিক দর্শন।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা দর্শন

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও উন্নয়ন দর্শনকে স্বাধীন দেশের স্বপ্নের সাথে এক সূত্রে গাঁথার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের নতুন সংবিধান রচনা করেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে এ সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানে পল্লী উন্নয়নকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিপ্লব ও গ্রামীণ শিল্পায়নের ডাক দেন যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৬ এ এরূপভাবে উপস্থাপিত হয়েছে—'নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা করিবেন'। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার দর্শন ছিল গণমানুষের উন্নয়ন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন পল্লী প্রধান বাংলাদেশে কৃষক, জেলে, কামার, কুমারসহ প্রতিটি মানুষের সুখি-সমৃদ্ধ জীবন, যেখানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষাসহ প্রতিটি মৌলিক চাহিদা পূরণে পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকবে, মানুষের কর্মের সুযোগ থাকবে। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষির উন্নয়নই পল্লী উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই, ১৯৭২ সনের ১৩ জানুয়ারি মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কৃষকের সকল বকেয়া খাজনার সুদ, এমনকি ২৫

বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেন। পাশাপাশি কৃষি বিপ্লব বাস্তবায়নের স্বার্থে তিনি জমির মালিকানার সিলিং সর্বোচ্চ একশ বিঘা নির্ধারণ, উদ্বৃত্ত ও খাস জমি ভূমিহীন প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে বণ্টন, ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা হতে কৃষকদের মুক্তিদান এবং সুদসহ সকল বকেয়া ঋণ মওকুফ করেন। ১৯৭২-'৭৩ অর্থ বছরে প্রায় ৫০১ কোটি টাকার এডিপি বাজেটে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের জন্য।

বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন দর্শন

১৯৭৩ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এ এক সম্মেলনে বলেছিলেন, "গ্রাম হলো দেশের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। যখন গ্রামগুলি অর্থনৈতিকভাবে সবল হবে, তখন সমগ্র দেশ এগিয়ে যাবে"। তিনি আরও বলেছিলেন, "সোনার বাংলা গড়তে প্রয়োজন সোনার মানুষ।" তিনি কৃষিবিদদের উদ্দেশ্যে বলেন, "কৃষিবিদদের গ্রামের সাধারণ কৃষকের নিকট যেতে হবে, তাদের সাথে মাঠে কাজ করতে হবে"। বঙ্গবন্ধু সমন্বিত কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন, যেখানে কৃষকগণ তাদের ক্ষেতের সীমানা আলাদা না করে একত্রে চাষাবাদ করবে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তিনি কৃষকদের মাঝে সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে জোর দিয়েছিলেন। তাই, তিনি ৫০ হাজার সমবায় সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। গ্রাম পর্যায়ে সমবায়ের স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে তৎকালীন IRDP কে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর এই দর্শন বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ খাদ্যের অভাব দূর করে দ্রুত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশে পরিণত হয়েছিল। ১৯৭৫ সনের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের ৪র্থ বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিপ্লবের ডাক দেন। তিনি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি গ্রামে সমবায় ব্যবস্থা চালুসহ কৃষিজমিতে যৌথভাবে আবাদের নির্দেশনা প্রদান করেন, যেখানে গরিব কৃষক যৌথভাবে কৃষি উৎপাদন ও সেচযন্ত্রের মালিক হবে। পল্লী উন্নয়নে তিনি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান ও সমন্বিত উন্নয়নে জোর দিয়েছিলেন। তাই, তিনি ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-'৭৮) সমবায়ের আয়ের ৫০% পল্লী উন্নয়নে ব্যয় করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন ছিলেন বাঙালি জাতিসত্তার নিপুণ কারিগর, তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তেমনি বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় অবিসংবাদিত, অবিকল্প ও দ্যুতিময় একজন রাষ্ট্রনায়ক, যিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'দিন বদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহার, রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১ নিয়ে শেখ হাসিনা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন দিগন্ত রচনা করেন। 'বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন' শীর্ষক গ্রন্থের অংশ বিশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেছেন "আমরা এমন একটি সমাজ গড়তে চাই, যে সমাজে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। মানুষের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হবে। গ্রামকেই করতে হবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার মধ্যেই রয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের পথ"। তার এই চিন্তাভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়, স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিম্ন আয়ের বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে উন্নীত করেছেন। তাঁর অদম্য সাহস, যুগোপযোগী উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলস্বরূপ তিনি উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশকে আজ সারা বিশ্বে সমাদৃত করেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পরিবেশে বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। তন্মধ্যে পল্লী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগসমূহ হলো :

ক) আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
খ) আশ্রয়ণ প্রকল্প
গ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

বিআরডিবি, পল্লী উন্নয়নের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের মুখ্য সমন্বয়ক ও সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান

পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্য অর্জনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বহুমুখী পরিকল্পনা এবং যুগোপযোগী কৌশল ও নীতি প্রণয়ন করছে। পল্লী উন্নয়নের উক্ত কৌশল ও নীতি বাস্তবায়নের জন্য এ বিভাগের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্ববৃহৎ সরকারি সংস্থা হলো বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) যা IRDP'র সাফল্যের ভিত্তিতে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে জন্ম লাভ করে। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশে পল্লী উন্নয়নে সম্পৃক্ত সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/বিভাগের সমন্বয়ের দায়িত্ব বিআরডিবিকে প্রদান করা হয়। সে মতে সরকারের জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের মাঠ পর্যায়ের সমন্বয়ের জন্য ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত সংস্থা হলো বিআরডিবি। শুরু থেকে বিআরডিবি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিতে গণতন্ত্রচর্চা, নেতৃত্বের বিকাশ ও সমবায়ীদের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের জন্য বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আসছে। বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় কার্যক্রমের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এভাবে, পল্লী উন্নয়নে বাংলাদেশে বিআরডিবি অন্যতম বৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বহুমাত্রিক কাজ করে চলেছে।

পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবির কৌশল ও কার্যাবলি

পল্লীর ভৌগোলিক অবস্থান, সম্পদ ও সম্ভাবনার বৈচিত্র্য, জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা, সময়ের বিবর্তন প্রভৃতি বিবেচনায় শুরু থেকে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়নে বহুমাত্রিক কৌশল অনুসরণ এবং বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিআরডিবি'র এ পথপরিক্রমাকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যায়—

- **বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)**

কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নের ধারাকে বেগবান করার জন্য ১৯৭০-'৭১ সালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) চালু করা হয়। পরবর্তীতে আইআরডিপির সাফল্যকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সদ্য স্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে একে সম্প্রসারিত করা হয়। সত্তরের দশকের তৎকালীন 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি)' এদেশের কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে একটি Pioneer কর্মসূচি ছিল। বিশেষত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকদের সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করা ছিল এর মূল কৌশল। ১৯৭২ সালের বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লীর জনগণ ও জনপদের উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মকৌশল হিসেবে বঙ্গবন্ধু কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তর সমবায় ব্যবস্থা বিআরডিবি'র পূর্বসূরি 'সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP)' এর মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রবর্তন করেন। বঙ্গবন্ধুর মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম পর্যায়ে সমবায়ের দ্বারা স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করার মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনসহ

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা। ফলে, তৎকালীন IRDP সেচ-সার-বীজ প্রযুক্তি নিয়ে সফলভাবে কাজ করে এবং দেশে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করে। একই সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু নগদ ভর্তুকির মাধ্যমে সমবায়ী কৃষকদের মাঝে সেচযন্ত্র বিতরণ ও স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এতে দেখা যায়, ডিসেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত আইআরডিপিভুক্ত ২০০ থানায় ১৬,১৭৫টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয় যার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৩,০০,৭৫০ জন। সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয় ১২২ মিলিয়ন টাকা।

- **বিআরডিবির বর্তমান গণমুখী পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন**

আশির দশকে বিআরডিবি তার কার্যক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন করে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস, মহিলা উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, গ্রামীণ নেতৃত্বের বিকাশ সাধনসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে। আশি ও নব্বই দশকে বিআরডিবি সমবায়ী কৃষকদের সেচযন্ত্র সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনে নব বিপ্লব ঘটায়। ১৯৮৬-১৯৯৫ মেয়াদে বিআরডিবি, বার্ড, আরডিএ, বিএইউ, জাইকা ও জাপানের কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে পল্লী উন্নয়নে 'লিংক মডেল' নামে একটি টেকসই উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন করা হয় যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বর্তমানে বিআরডিবি দারিদ্র্য বিমোচনে সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সরকারি সংস্থা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক গৃহীত ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য বিআরডিবি'র গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে ১৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি বর্তমানে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে তা নিম্নরূপ—

- পল্লী এলাকার জনগোষ্ঠীকে সমবায় সমিতি/পল্লী উন্নয়ন দলের মাধ্যমে সংগঠিত করে মানব সংগঠন সৃষ্টি;
- চাহিদামাফিক মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রদান;
- উপকারভোগীদের মূলধন সৃষ্টি ও এর ব্যবস্থাপনা;
- সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর;
- কৃষিঋণ ও অকৃষি খাতে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- স্থানীয় উদ্যোগকে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান, উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ;
- সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরামর্শ সেবা কার্যক্রম;
- স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- স্থানীয় চাহিদার আলোকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবকাঠামোগত নির্মাণ;
- নারী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ;
- ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ও পল্লী উদ্যোক্তা সৃষ্টি;
- স্থানীয় সম্পদ যোজন ও ব্যবস্থাপনা;
- সেচযন্ত্রসহ অন্যান্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ;
- উপকারভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য মার্কেট লিংকেজ স্থাপন।

বিআরডিবি'র অর্জন ও স্বীকৃতি

পল্লী বাংলার উন্নয়নে বিআরডিবি একটি কালোত্তীর্ণ প্রতিষ্ঠান। সংক্ষেপে বিআরডিবি'র গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও স্বীকৃতি নিম্নরূপ—

সংগঠন সৃষ্টি : মোট ১,৬৬,৯৬০টি পল্লী সংগঠন (৮৯,৯৭৩টি সমবায় সমিতি ও ৭৬,৯৮৭টি পল্লী উন্নয়ন দল);

সদস্য অন্তর্ভুক্তি : মোট ৫০.১২ লক্ষ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে মহিলা ২৪.৪৩ লক্ষ জন;

মূলধন সৃষ্টি : মোট মূলধন সৃষ্টি ৭০৭.০৩ কোটি টাকা যা পল্লী অর্থনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে;

প্রশিক্ষণ প্রদান : পল্লীর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৭৬.৬৪ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

ঋণ বিতরণ : প্রতি বছর প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়;

সেচ যন্ত্র বিতরণ : ১৮,৩৬০টি গভীর নলকূপ, ৪৪,৫২৩টি অগভীর নলকূপ ও ১৯,৪০৫টি শক্তি চালিত পাম্প বিতরণ করা হয়েছে।

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা সংস্থা বিআইডিএস (BIDS, ২০১০) বিআরডিবি'র সার্বিক কার্যক্রম সমীক্ষা করে জিডিপিতে বিআরডিবি'র প্রভাব নিরূপণ করে। সমীক্ষার মূল্যায়ন অনুযায়ী সার্বিক কর্মকাণ্ডের ফলে জাতীয় পর্যায়ে জিডিপিতে বিআরডিবি'র অবদানের পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ১.৯৩%। *গার্ডিয়ান* (The Guardian) পত্রিকার ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর সংখ্যায় বিআরডিবি'র কার্যক্রমের সফলতার ভূয়সী প্রশংসা করে প্রদত্ত মন্তব্য—'BRDB brings a Silent Revolution in Poverty Alleviation.'

সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে বিআরডিবির কর্মপরিকল্পনা

সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, অর্জন ও সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ অনুসরণে উন্নত পল্লী বিনির্মাণে বিআরডিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। সামগ্রিক ও টেকসই পল্লী উন্নয়নে বিআরডিবি'র কর্মপরিকল্পনাকে নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যায়—

- **পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান অনুসারে টেকসই পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন**

রূপকল্প-২০৪১ এর আলোকে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হলো পল্লী বাংলার উন্নয়ন। পল্লী উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিক্ষিপ্ত বা এলাকাভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট মাস্টার প্ল্যানভিত্তিক কোনো কর্মসূচি অদ্যাবধি প্রণীত হয়নি। সাধারণভাবে পাড়া, গ্রাম বা ওয়ার্ডকে পল্লী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেখানে ইউনিয়ন হচ্ছে পল্লীর সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কাঠামো। পক্ষান্তরে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিবেচনায় ইউনিয়ন পরিষদ হচ্ছে সরকারি পর্যায়ে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর। অতএব ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততায় সমগ্র ইউনিয়নের জন্য একটি সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা এখন সময়ের দাবি। অন্যদিকে, বাংলাদেশে অঞ্চল ও ভৌগোলিক অবস্থাভেদে পল্লীর বৈশিষ্টে বৈচিত্র্য রয়েছে। পল্লীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতি রেখে অবকাঠামো ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। পল্লী অঞ্চলের প্রতিটি পরিবারকে পল্লী ডাটাবেজ এর আওতায় এনে, তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃষি/অকৃষি খাতে পল্লী উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা, নেতৃত্বের বিকাশ প্রভৃতি মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। দরিদ্রদের যেমন পুঁজি প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তাদের জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ ও সেবা, যাতে করে তাদেরকে আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সম্পদে, এককথায় যে বিষয়গুলি দরিদ্রদের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে, সে বিষয়গুলোতে পদক্ষেপ নেওয়ার সমন্বিত ব্যবস্থাই হবে পল্লী উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান। এক্ষেত্রে বিআরডিবি পল্লীভিত্তিক বাংলাদেশে মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারে।

- **সর্বজনীন পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন**

পল্লীর জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে

কোভিড ১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা ঋণের চেক প্রদান করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, পল্লীর আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডকে সহায়তা করা এবং Livelihood সমূহের সঠিক ও সুবিন্যস্ত তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে পল্লীর প্রচলিত ও সম্ভাবনাময় জীবিকায়ন এর বিস্তারিত তথ্য (জীবিকায়ন কোষ, বাংলাদেশ) প্রণয়ন করা হলে তার ভিত্তিতে টার্গেট গ্রুপের আগ্রহ, প্রযুক্তিগত সুবিধা, সম্ভাবনা, বাজার চাহিদা, দক্ষতা, বিপণন সুবিধা, মূলধন সহায়তা, কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি বিবেচনায় উপযুক্ত জীবিকা নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উক্ত জীবিকায়ন কোষ অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। সংকলিত জীবিকায়ন তথ্যের ভিত্তিতে সামগ্রিক পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে পল্লীর জনগোষ্ঠীকে অঞ্চলভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করে জীবিকাকে সকলের কাছে সহজলভ্য করাই হলো এর সর্বজনীনতা।

করোনায় প্রভাবিত পল্লী অর্থনীতিকে পূর্ণজীবন প্রদানে এ সংকলিত জীবিকার তথ্য মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। পল্লী উন্নয়নে অবকাঠামোর পাশাপাশি সংগঠন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, নেটওয়ার্ক এবং দক্ষতা, সক্ষমতা ও উপযোগী জীবিকায়ন নির্বাচন—গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ণিত জীবিকায়ন কোষ ও তৎপরবর্তী সহায়তা করোনা পরবর্তী পল্লী উন্নয়ন গতিধারাকে বেগবান ও সুসংহত করবে। প্রকাশনার পাশাপাশি প্রস্তাবিত 'জাতীয় জীবিকায়ন কোষ' এর একটি ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হবে যা বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটের লিংক হিসেবে অনলাইনে প্রকাশ করা হবে। কোনো ব্যবহারকারী উক্ত ডাটাবেজ হতে জীবিকায়নভিত্তিক, এলাকাভিত্তিক বা প্রয়োজন ও পছন্দ অনুসারে ডাটা আউটপুট নিতে পারবে। একই সাথে পছন্দের জীবিকা অবলম্বন করে স্বাবলম্বী হতে বিআরডিবিসহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা হতে সহায়তা গ্রহণ করতে পারবে।

- **অংশীদারিত্বমূলক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন মডেল অনুসারে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন**

পল্লীর জনসাধারণকে উন্নয়নে অংশীদারকরণ, চাহিদা ভিত্তিক উর্ধ্বমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সেবা সমন্বয়ে অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। এ কার্যক্রমটি লিংক মডেল হিসেবে পরিচিত। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সভায় উত্থাপিত চাহিদা ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সমন্বয় ও বাস্তবায়িত হয়। লিংক মডেল কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার জন্য সরু রাস্তা নির্মাণ, ইট সলিংকরণ, ছোট বক্স কালভার্ট ও ড্রেন নির্মাণ, নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি ক্ষুদ্র অবকাঠামো সুবিধাভোগী, ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকারের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে লিংক মডেলের সামগ্রিক কার্যক্রম ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অন্যদিকে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) পল্লী উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছিল। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে জীবিকায়ন ও পল্লী জনপদের সামগ্রিক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে লিংক মডেল এবং আইআরডিপি এর সাফল্যকে একীভূত করে অংশীদারিত্বমূলক সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির পরিমার্জিত সংস্করণ বাস্তবায়নকে বিআরডিবি'র অন্যতম মূল কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

- **পল্লী জীবিকায়নকে অন্তর্ভুক্ত করে দ্বি-স্তর সমবায় সমিতিগুলো প্রকৃত সমবায়ীদের দ্বারা সরকারের নিয়মনীতি অনুসারে পরিচালনা নিশ্চিতকরণ**

১৯৭২ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের হাজারো অভাব পূরণে বিশেষত কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে সমবায় প্রচেষ্টার কোনো বিকল্প নেই। মহানায়কের এই নীতিতে বলীয়ান হয়ে দেশটির পুনর্জাগরণে সমবায় পদ্ধতি এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সময়ের আবর্তে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতি আজ পল্লী উন্নয়নে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না। এর মূল কারণ সমবায় সমিতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও কার্যকর নেতৃত্বের অভাব। কুমিল্লা মডেলের দ্বি-স্তর সমবায় প্রথায় উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) এর চেয়ারম্যান হলেন ঐ উপজেলার সমবায়ীদের নেতা। উক্ত পদে বর্তমানে দক্ষ ও যোগ্য সমবায়ী নেতৃত্বের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে, দিনে দিনে সমবায় সমিতিগুলো ও সমবায় কার্যক্রমের সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ সংকুচিত হচ্ছে। তাই, সমবায় উন্নয়নে সরকারের নিয়মনীতি

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) আয়োজিত 'শৈশবের শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

অনুসারে চলার জন্য সমিতিসমূহকে নিম্নোক্ত নিয়মকানুন মেনে চলা বাঞ্ছনীয়—

ক) সমবায় আইন, বিধিমালা ও নীতির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
খ) সমবায় আইন প্রণয়নে প্রকৃত সমবায়ীদের সম্পৃক্ত করা;
গ) সমিতির নেতৃত্বে প্রকৃত সমবায়ীদের নির্বাচনের জন্য সমবায় আইনের যুগোপযোগী সংস্কার করা;
ঘ) সমবায়ীদের নগদে ঋণ প্রদান না করে সাপ্লাই ক্রেডিটের মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা করা;
ঙ) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ;
চ) সমবায় শিল্প প্রতিষ্ঠায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা করা;
ছ) ইউসিসিএগুলোকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা;
জ) ইউসিসিএসমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিআরডিবি'র ভূমিকা ও পরিধি সুনির্দিষ্ট হওয়া।

রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে বিআরডিবি'র উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ

সামগ্রিক পল্লী উন্নয়নের সুবিশাল কর্মধারায় বিআরডিবি কিছু চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহযোগিতা, সুনিপুণ বিশ্লেষণ ও সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে এ সকল চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করতে হবে। অনাগত দিনের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জসমূহ—

- উন্নত-সমৃদ্ধ পল্লী গঠনের লক্ষ্যে যুগোপযোগী পূর্ণাঙ্গ মডেল না থাকা;
- দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতিতে বিআরডিবি, ইউসিসিএ ও সমবায় বিভাগের ত্রিমুখী ব্যবস্থাপনা বিরাজমান থাকা;
- কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিআরডিবি'র সক্ষমতা উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব;
- কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় বিআরডিবি'র দায়িত্ব যথোপযুক্তভাবে বর্ণিত না থাকা;
- মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ঋণ তহবিল ও সরবরাহযোগ্য সম্পদের অপ্রতুলতা;
- পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে ফলপ্রসূ বাজার ব্যবস্থা/নেটওয়ার্ক অদ্যাবধি গড়ে না ওঠা;

উপসংহার

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের দর্শনের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করতে হলে অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে সমৃদ্ধ পল্লী গঠন করতে হবে। এলক্ষ্যে বিআরডিবি ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে মৌলিক ও ভিত্তিমূলক কার্যাবলি যেমন- বর্তমান প্রেক্ষাপটে পল্লী ও পল্লী উন্নয়নের সংজ্ঞা এবং এর পরিধি নির্বাচন, পল্লী উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন, সর্বজনীন পল্লী জীবিকায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, জীবিকায়ন কোষ প্রণয়ন, অংশীদারিত্বমূলক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন, পল্লী উন্নয়নের ডাটাবেজ তৈরি, বিআরডিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের সাথে সর্বস্তরের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। উক্ত উদ্যোগের ফলাফলের ভিত্তিতে অংশীদারিত্বমূলক ও সমন্বিত মডেল কর্মসূচি অবলম্বন করে আগামী দিনে গৃহীতব্য নীতিকৌশলে সংগতিপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করাই হবে আগামী দিনে টেকসই উন্নত পল্লী গঠনের রোডম্যাপ। এক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়ন খাতের গবেষকবৃন্দ এবং পল্লী উন্নয়নবিদগণের সর্বাত্মক সহযোগিতা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সেক্টরে সম্পৃক্ত সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওদের কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে এদেশের পল্লীর জনসাধারণকে এ কর্মসূচির আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুমিত হয়। এক্ষেত্রে বিআরডিবি মূল সমন্বয়কের ভূমিকা পালনে সদা প্রস্তুত রয়েছে।

মোট কথা, পল্লীর প্রতিটি জনগণকে অংশীদারিত্বমূলক ও সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় এনে পল্লী উন্নয়নের মাস্টার প্ল্যান অনুসারে পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারসহ সংশ্লিষ্ট জাতিগঠনমূলক সংস্থাসমূহের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে পারলে প্রতিটি পল্লী উন্নত ও আত্মনির্ভরশীল পল্লীতে রূপান্তরিত হবে, যার মাধ্যমে ২০৪১ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

সুপ্রিয় কুমার কুন্ডু: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

নারীর উন্নয়নে বিআরডিবি

ঝিকরগাছা উপজেলা, যশোর এ বিআরডিবি'র ইরেসপো কর্মসূচির আওতায় বেনিয়ালী বালিখোলা মহিলা সমিতির সদস্যদের নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে ক্যাশলেছ পদ্ধতিতে ঋণ সহায়তা প্রদান।

মো. আলমগীর হোসেন আল নেওয়াজ

ভূমিকা

সভ্যতার অভাবনীয় সাফল্যের পিছনে নারী ও পুরুষের সমান অবদান অনস্বীকার্য। কোন দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য নারীর অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। বর্তমান সময়ে স্বতন্ত্র সত্তায় পুরুষের পাশাপাশি নারীরা দেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। আধুনিককালে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে নারীর এ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকৃত। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে নারীরা প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখছে। এতে বুঝা যায় সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠী তথা নারীদের পিছনে ফেলে একটি জাতির পক্ষে কখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়। কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল-

"বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"।

নারীর ক্ষমতায়ন

ক্ষমতায়ন হচ্ছে মানুষের বস্তুগত, দৈহিক, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ওপর স্বনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, যার সঙ্গে দক্ষতার প্রশ্নটি জড়িত। কাজেই নারীর ক্ষমতায়ন বলতে এমন এক ধরনের অবস্থাকে বুঝায়, যে অবস্থায় নারী তাঁর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মর্যাদাকর অবস্থায় উন্নীত হতে পারে। নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাপক অর্থে একজন নারীর স্বকীয়তা, নিজস্বতা সর্বোপরি স্বয়ংসম্পূর্ণতার বিকাশকে বুঝায়। নারী-পুরুষের মধ্যকার অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো নারীর ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়ন করতে হলে নারীকে ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীদেরকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীর অবদান যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে, তবেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

সংবিধানে নারীর অবস্থান

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর যথাযোগ্য অবস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধারা সন্নিবেশ করা হয়েছে। ১৯ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে "জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের ক্ষমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবে।" ২৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে- "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" এছাড়াও ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২) ধারায় নারী-পুরুষ, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের বিধান রয়েছে। ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত আছে এবং এ ধারার অধীনে নারী স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

বিশ্বের প্রেক্ষাপটে নারী

পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি সফল করতে এগিয়ে আসে জাতিসংঘ। জাতিসংঘ নারীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালকে 'বিশ্ব নারী বর্ষ', ১৯৭৫-১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে, ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে এবং ১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শিতায় স্বাধীনতা যুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধা ও নির্যাতিত নারীর পুনর্বাসন এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' গঠন করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, নারীনির্যাতন রোধ, নারীর পাচার রোধ, নারীর নিরাপত্তা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরবর্তীতে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করার হয়। ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার দেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ১৯৯৭ প্রণয়ন করে, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এদেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। নারীর ক্ষমতায়নে বেশ কিছু আইন-নীতি ও বিধিমালা তৈরি করেছে সরকার। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন সুসংহতকরণে গৃহীত বহুমুখী কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বে রোল মডেল। নারী-পুরুষের সমতা অনুধাবনের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারী-পুরুষের আনুপাতিক অবস্থান। নারীরা তাঁদের মেধা, শ্রম, সাহসিকতা, শিক্ষা ও নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের দেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছে এবং একটি স্বাবলম্বী শিক্ষিত প্রজন্ম গঠনে একই সঙ্গে ভূমিকা রাখছে। নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে, তা মূলত নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির জন্যই, আর এক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য, তিনি রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ, প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অব চেঞ্জসহ নানাবিধ সম্মাননা অর্জন করেছেন। তাঁর সব অর্জন বাংলাদেশের নারীদের যেমন গর্বিত করে, তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বৈষম্যহীন-সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত হয়ে দেশ গঠনে অংশগ্রহণে আশার আলো দেখায়।

বাস্তবতা হলো কর্মক্ষেত্রে নারীরা দক্ষতা প্রমাণ করছেন, কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। নারীরা এখন রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন, পর্বত জয় করছেন, অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও। নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নে প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে তো বটেই, উন্নত অনেক দেশ থেকেও এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। নারী-পুরুষের সমতা (জেন্ডার ইক্যুইটি) দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবার ওপরে বাংলাদেশ। ২০২০ সালে দ্য গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুসারে, বিশ্বের ১৪৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪৭তম, যা এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় আশাব্যঞ্জক। চলতি বছর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ডব্লিউইএফ জেন্ডার গ্যাপ-২০২১ সালের প্রকাশিত প্রতিবেদনে ১৫৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে রয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে অষ্টম। আবার ১৩৬টি দেশের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকাটি পালন করছে সামাজিক পরিবর্তন, বিশেষ করে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন। ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বড় অবদান রেখে চলেছে। এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে নারী শিক্ষার প্রসার এবং সমাজে মেয়েদের ভূমিকা জোরালো করতে ব্যাপক ভূমিকা নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বর্তমানে দেশে নারী শিক্ষার হার ৫০.৫৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৫১ শতাংশ, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫৪ শতাংশ, এইচএসসি পর্যায়ে ৪৮.৩৮ শতাংশ নারী শিক্ষার্থী রয়েছে। সরকার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত নারীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করছে। প্রাথমিক শিক্ষায় নারী শিশুদের ভর্তির হার বিবেচনায় বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান আরও ৬২টি দেশের সঙ্গে সমন্বিতভাবে প্রথম। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ ২০১৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সরকারি চাকরিতে মোট নারীর সংখ্যা ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৮১৯ জন। গত দুই দশকে বাংলাদেশে নারীর কর্মসংস্থান প্রায় ৩ ভাগেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এতৎসত্ত্বেও নারীর জীবনমানের উন্নয়ন আশানুরূপ ঘটেনি। নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার। জয়িতা ফাউন্ডেশনকে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। মুজিববর্ষে ৫০ লাখ প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত নারীকে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিকভাবে দেশের নারীদের বেশ কয়েকটি তাক লাগানো সাফল্য সবার দৃষ্টি কেড়েছে। বাংলাদেশের নারী বিজ্ঞানীরা ২২তম ল'রিয়েল-ইউনেস্কো ফর ওমেন ইন সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন। বাংলাদেশি নারীর যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসায় যোগদান ও আন্তর্জাতিকভাবে ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলায় তারা ভালো করছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নেও সরকার ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছেন। সব রাজনৈতিক দলের কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা পরিষদে ১ জন নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৩৩ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

শিক্ষায় এগিয়ে যাওয়ার কারণে সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে নারীর পদচারণা দ্রুত হারে বাড়ছে। সমান অধিকার, মর্যাদার

প্রশ্নে নারীরা তৎপর। সার্বিক বিচারে সমাজের প্রতিটি পেশায় নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ও বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী এবং বিভিন্ন কারিগরি ক্ষেত্রে নারীরা উচ্চ পদে রয়েছেন। দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যুক্ত রয়েছেন অনেক নারী। নারী পুলিশ সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তি মিশনে কাজ করছেন। শিল্প প্রতিষ্ঠায়ও ভালো করছেন নারীরা। সরকার নারী উদ্যোক্তাদের বিনা জামানতে ও স্বল্প সুদে ঋণ দিচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অবস্থান

সকল উন্নয়ন পরিসরে যে কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়নে নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে নারীদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয়। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল নগণ্য; বর্তমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা সকল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নারীদের সম্পৃক্ত করছে। ফলে বর্তমানে পল্লী উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের নারীশ্রমশক্তির পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি। এর মধ্যে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার কাজে ১০ হাজারের বেশি নারী কাজ করেন। ৮০ শতাংশ নারী মৎস্য, বনায়ন ও কৃষিকাজে নিয়োজিত। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের প্রায় ৩৪ শতাংশ নারী এবং পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের মধ্যে ৮০ শতাংশই নারী।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০ অনুযায়ী বর্তমানে মোট শ্রমশক্তি ৬.৩৫ কোটির মধ্যে প্রায় ২.০০ কোটি নারী কৃষি, শিল্প ও সেবা—অর্থনীতির বৃহত্তর এই তিন খাতে কাজ করছেন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এর সমীক্ষায় জানা যায় যে, অর্থনীতিতে নারীর আরেকটি বড় সাফল্য হলো, উৎপাদন খাতের মোট কর্মীর প্রায় অর্ধেকই এখন নারী। এ খাতে নিয়োজিত ৫০.১৫ লক্ষ নারী-পুরুষের মধ্যে ২২.১৭ লক্ষ নারী। তবে নারী কর্মীদের সিংহভাগই শ্রমজীবী। কর্মজীবী নারীদের অর্ধেকের বেশি কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন। বর্তমানে কৃষি খাতে নিয়োজিত আছেন ৯০.১১ লক্ষ নারী, শিল্প ও সেবা খাতে কাজ করেন যথাক্রমে ৪০. ৯০ লক্ষ এবং ৩৭.০০ লক্ষ নারী এবং প্রায় ৫.৮০ কোটি নারী-পুরুষ কোনো না কোনোভাবে কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। শিক্ষক, নির্মাণকর্মী, বিজ্ঞানী, ব্যাংকার, উদ্যোক্তা, শিল্পী, গণমাধ্যমকর্মী —প্রায় সব পেশাই বেছে নিচ্ছেন নারী। এমনকি এখন পেশা হিসেবে গৃহকর্মকেও বেছে নিচ্ছেন তাঁরা। বিবিএসের সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্তমানে দেশে স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে ৯ লক্ষ নারী গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছেন, বিনোদন ও শিল্পকর্মেই জড়িত আছেন প্রায় ৯ হাজার নারী, ব্যাংক-বিমার মতো আর্থিক খাতে কাজ করেন ৭০ হাজার নারী, শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন প্রায় ৬.৫০ লক্ষ নারী এবং সেবা ও শিল্প খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রধান নির্বাহী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে প্রায় ৫ হাজার নারী দায়িত্ব পালন করছেন।

নকশিকাঁথা সেলাই প্রশিক্ষণ, বিআরডিবি, মিঠাপুকুর, রংপুর।

কলকারখানায় পুরুষের চেয়ে নারী শ্রমিক বেশি, এবং শ্রমঘন এ খাতে দেশের নারীদের অংশগ্রহণ বেশ উৎসাহব্যঞ্জক।

খাদ্যনীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ২০১৫ সালের একটি জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৯০ শতাংশ বাড়িতে মুরগি পালন নিয়ন্ত্রণ ও ৫৫ শতাংশ বাড়িতে ছাগল ও গরু পালন নিয়ন্ত্রণ করেন নারীরা। সিপিডির এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গৃহস্থালিতে নারীর যে কাজ জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না সেই শ্রমের প্রাক্কলিত বার্ষিক মূল্য জিডিপির ৭৮.৮ শতাংশ। অবশ্য গৃহস্থালি কাজে দেশের নারীরা বছরে ১৬ হাজার ৬৪১ কোটি ঘণ্টা সময় ব্যয় করছেন, যার আর্থিক মূল্যমান ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা। জিডিপিতে এই আর্থিক মূল্য যোগ হলে নারীর হিস্যা বর্তমানের ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৪৮ শতাংশ।

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক সংস্থার সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশের নারীরা। এ দেশে ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহকের সংখ্যা ২ কোটি ৫২ লাখ ৮০ হাজার। এর ৯০ শতাংশই নারী গ্রাহক। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, দেশের মোট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ৩৫ শতাংশই নারী উদ্যোক্তা। ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫৭ হাজার ৭২২ জন নারীকে ৮৬০ মিলিয়ন ডলার ঋণ হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এতে তাঁরা গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ৯৭ থেকে ৯৯ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাই ব্যাংক থেকে জামানতবিহীন ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করেন। এটি একটি বিরাট সাফল্য।

নারীর ক্ষমতায়নের অন্তরায়সমূহ

স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়ন সন্তোষজনক না হওয়া ও এসব রাষ্ট্রে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর দুর্বলতার কারণে নারী সমাজের উন্নয়নে পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষাক্ষেত্রে অসহযোগিতা, অপর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও আইনি পদক্ষেপ, সংকীর্ণ চিন্তাচেতনা ও মনোভাব এসব কিছুই নারীর ক্ষমতায়নে বাধা সৃষ্টি করে। নারীর ক্ষমতায়নে অন্তরায়সমূহ হলো : সামাজিক কারণ, রাজনৈতিক কারণ, অর্থনেতিক কারণ ও শিক্ষার অভাব।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকার নারীর ক্ষমতায়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সব পর্যায়ে নারীদের সমঅধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে রাষ্ট্রের বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও সংযোজন করা হয় (অনুচ্ছেদ ২৭ ও ২৮)। ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরিতে ১০ ভাগ কোটা নারীর জন্য সংরক্ষিত করা হয়। বর্তমান সরকার নারীর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড পদে ১০% ও নন গেজেটেড পদে ১৫% কোটা নির্ধারণ করেছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০% নিয়োগ নারীদের জন্য সংরক্ষিত করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরপরই সব পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা, নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য অসংখ্য নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করেন এবং বাস্তবিক অর্থে সব পর্যায়ে তা সুসংহত ও কার্যকর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছেন। এছাড়া সরকার বিভিন্ন আইনি পদক্ষেপ এবং অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে নারীর নিরাপত্তা বিধান করেছে।

নারী উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন ও তাঁদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অংশগ্রহণের বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনুসরণে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা হলো নারীদের সংগঠিত করা, সমবায়ী নারীদের নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান করা, নারীদের জন্য আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ করা, দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা প্রদান, বাজার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা ও নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয়ে যৌতুক নিরোধ, বাল্যবিবাহ রোধ, ইভটিজিং বন্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কাজ করছে।

নারীর উন্নয়নে বিআরডিবি

পল্লী উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি দপ্তর/সংস্থা গুলোর মধ্যে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আমার বাড়ি আমার খামারসহ অন্যান্য বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা নারীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বিআরডিবি পল্লীর জনগণের জীবনমান ও পল্লী জনপদের উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান ষাটের দশকে সূচিত 'কুমিল্লা মডেল' নামে সুবিদিত 'দ্বি-স্তর' সমবায় পদ্ধতির ঐতিহ্যকে ধারণ করে পল্লী উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। সরকারের পল্লী উন্নয়ন কৌশলের সাথে সংগতি রেখে বর্তমানে বিআরডিবি দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় অনানুষ্ঠানিক গ্রামীণ সংগঠন গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহয়তা প্রদান, পুঁজি গঠন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি ও সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা করে আসছে। বিআরডিবি মে ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত অর্জন হলো ১,৬৬,৯৬০টি পল্লী সংগঠন সৃষ্টি, সুবিধাভোগীদের ৭০৭.০৩ কোটি টাকা মূলধন সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ প্রদান ৭৬.৬৪ লক্ষ জন এবং ঋণ সহায়তা প্রদান প্রতি বছর প্রায় ১,২০০ কোটি টাকা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনে বিআরডিবি সরকারের নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবি ১৯৭৫ সাল থেকে নারীদের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও তাঁদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (মউ) চালু করে। বিআরডিবি মে ২০২১ খ্রি. পর্যন্ত ৭৬,২৮৭টি মহিলা সমবায় সমিতি/মহিলা দলের মাধ্যমে প্রায় ২১.৭৪ লক্ষ জন গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাকে সংগঠনের আওতায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এসকল নারীকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে বিআরডিবি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে অবদান রাখছে।

বিআরডিবি নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য লিঙ্গবৈষম্য হ্রাস, আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্পদের অধিকার অর্জন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার গুণগতমান উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এ সকল প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম যেমন- শাকসবজি চাষ, ফলমূলের চাষ, কাপড় সেলাই, দর্জি বিদ্যা, নকশা, বাটিক, বুটিক, অ্যাম্ব্রয়ডারি, নকশিকাঁথা, বাঁশ ও বেঁতের কাজ, গরু মোটতাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি ও কবুতর পালন, মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প, চিড়া মুড়ি ভাজা, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প স্থাপন, কম্পিউটার

জাতীয় শোক দিবসে যশোরে বিআরডিবি'র নারী সুফলভোগী সদস্যদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

চালনা ইত্যাদি কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাঁদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে। বিআরডিবির মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় সরকারের পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নারী স্বাস্থ্য শিক্ষা, মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, বাল্যবিবাহ রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, যৌতুক প্রথা নির্মূল ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়া বিআরডিবি মহিলা সদস্যদের মূলধন সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান করে থাকে এবং মহিলা সদস্যদের মূলধন জমার পরিমাণ ৩৮৮.৫৬ কোটি টাকা। আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের জন্য মহিলাদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণ সহায়তার পরিমাণ ৮,৭৭১.৪৩ কোটি টাকা।

বিআরডিবিভুক্ত নারী সদস্যরা ঋণ সহযোগিতা নিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান বেড়েছে। সমিতির নেতৃত্ব দানের সুযোগ সৃষ্টি করে বিআরডিবি নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে কাজ করছে। বিআরডিবি গ্রামীণ নারীদের সমবায় সমিতি/অননুষ্ঠানিক দলে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণে বিআরডিবি মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। বিআরডিবিভুক্ত নারী নেত্রীগণ স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়ে উন্নয়ন মূলক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিআরডিবির এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীরা কর্মমুখী আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবার ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

উপসংহার

বিআরডিবির সক্রিয় সহযোগিতামূলক ভূমিকার কারণে পল্লী উন্নয়নে তথা জাতীয় জীবনে নারীদের অবদান আজ প্রশংসনীয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং মুজিব জন্ম শতবর্ষে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। ২০৩০ সালে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৩১ সালে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালে দেশকে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভে বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি করতে বিআরডিবিকে যুগোপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। গ্রামীণ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন এবং নারীর পুনরুৎপাদনমূলক কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করে তাঁদের ভাগ্যোন্নয়নের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারলে বিআরডিবির সফলতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত হবে।

তথ্যসূত্র

১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২০।
২. বিআরডিবি'র বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২০-২০২১ (প্রকাশিতব্য)।
৩. বাংলা ট্রিবিউন, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ, ফারজানা মাহমুদ, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.।
৪. দৈনিক যুগান্তর, নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, ড.আফরোজা পারভীন, ০৮ মার্চ ২০১৯।
৫. দৈনিক প্রথম আলো, সম্পাদকীয় : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রি.।
৬. দৈনিক কালের কণ্ঠ, উন্নয়ন ও গ্রামীণ নারীর কাজের মূল্যায়ন, ড. মুহম্মদ মনিরুল হক, ১ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রি.।
৭. bn.wikipedia.org/wiki
৮. www.myallgarbage.com/2017/10/Women- Empower.html
৯. www.facebook.com/722100911284716/posts/838057036355769/
১০. www.banglatribune.com/687216

মো. আলমগীর হোসেন আল নেওয়াজ : উপপরিচালক (নিরীক্ষা), বিআরডিবি, ঢাকা।

পল্লী উন্নয়ন : প্রেক্ষিত এশিয়া

উঠান বৈঠক পাঁচকানিয়া বিআরডিবি, সদর, টাঙ্গাইল।

ফেরদৌস মামুন শিমুল

উন্নয়ন

প্রত্যক্ষ উপনিবেশ ধারণার বিলুপ্তির সঙ্গে ইউরোপের একচ্ছত্র আধিপত্য হ্রাস এবং তৎবিপরীতে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্ভব বিশ্বব্যাপী 'উন্নয়ন' ধারণাকে প্রসারিত করে। এতদিন ব্যবহৃত হয়ে আসা 'উন্নতি' শব্দের পরিবর্তে তার স্থলাভিষিক্ত হয় 'উন্নয়ন' শব্দ। উন্নতি যেখানে ওপরে ওঠা, উন্নয়ন সেখানে ওপরে তোলা। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জনগণের ক্ষেত্রে মানসম্মতভাবে বেঁচে থাকাই হলো উন্নয়ন। উন্নয়ন শব্দটি ইবনে খালদুন সর্বপ্রথম তার বিখ্যাত গ্রন্থ AL- Muqaddimah'তে প্রয়োগ করেন। তিনি উন্নয়ন শব্দটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ইতিবাচক পরিবর্তনকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেন। সাধারণত উন্নয়ন বলতে বুঝি মানুষের সঠিক অবস্থার পরিবর্তন। একটি স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিশেষ অবস্থায় উপনীত হওয়াকে বুঝায়। ILO এর মতে,"বেঁচে থাকার জন্য মানুষের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণই হলো উন্নয়ন" অমর্ত্য সেন এর মতে, "মানুষের ক্ষমতার বিকাশই উন্নয়ন" UNDP এর মতে, "উন্নয়ন হলো একটি দেশের বা অঞ্চলের জনসমষ্টির গড় আয়ু, শিক্ষা ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি"। উন্নয়নের সূচক হিসেবে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু গড় আয়ের কথা বিবেচনা করা হলেও উৎপাদনের সঙ্গে বণ্টন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন বিবেচনায় আনা হয় না। বিবেচনায় আনা হয় না মানুষের ব্যক্তিত্বের অবস্থা, সামাজিক শিথিলতা ও অবক্ষয়, নৈতিক পতনশীলতা, জাতীয় হীনম্মন্যতাবোধের মতো বিষয়গুলো। একইভাবে যাদের জন্য উন্নয়ন সেসব উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা ও সম্ভাবনাকে ইতিহাসের দিক থেকে- উদ্ভব, বিকাশ ও সম্ভাব্য পরিণতির দিক থেকে বিবেচনা করা হয় না। আবার ৯০ এর দশকে UNDP কর্তৃক আয়ুষ্কাল, শিক্ষা ও মৌলিক ক্রয় ক্ষমতার

সম্মিলিত পরিমাপের দ্বারা মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index, HDI) তৈরি করা হয়। এছাড়া গিনি সহগ (Gini coefficient) অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক যা কোনো দেশের আয় বা সম্পদ বণ্টনের অসমতা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি একটি অনুপাত বা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা হয় যার মান ০ থেকে ১-এর মধ্যে হবে। গিনি সহগকে ১০০ দিয়ে গুণ করে শতকরা হারে প্রকাশ করলে তাকে গিনি সূচক (Gini index) বলা হয়।

পল্লী উন্নয়ন

ড. আখতার হামিদ খানের মতে-"পল্লী উন্নয়ন হলো একটি ধীমান মানুষ চালিত প্রক্রিয়া যা পল্লীর সর্বস্তরের জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং সার্বিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।" হাসানাত আব্দুল হাই এর মতে- 'পল্লী উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পল্লীবাসীর পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং নিয়ন্ত্রণের এ দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সুফল লাভ নিশ্চিত করা যায়।'

সাধারণ অর্থে পল্লী উন্নয়ন বলতে পল্লীর জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে পল্লী উন্নয়ন বলতে পল্লী এলাকার জনগণের জীবন ধারণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত কারিগরি দিক সমূহের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে বুঝায়। উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি, যে প্রক্রিয়ায় পল্লীর জনগণের উৎপাদন, আয়, বণ্টন, ভোগ, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়ন সাধন হয় তাকে পল্লী উন্নয়ন বলে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ধারণা

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পল্লী উন্নয়নকেই দেশের উন্নয়নের প্রাথমিক কার্য হিসেবে বিবেচনা করেন। সংবিধানে এবং ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়নকে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনায় প্রমাণিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২য় ভাগের ১৬ নং অনুচ্ছেদে গ্রামের উন্নয়ন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

'শহরের ও গ্রামের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য পর্যায়ক্রমে দূর করার উদ্দেশ্যে- কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ কার্যক্রম এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনগণের স্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলের আমূল পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।' সংবিধানের বর্ণিত অনুচ্ছেদ হতে দেখা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শুধু গ্রামীণ উন্নয়নের কৌশলই নির্ধারণ করেননি, এর সাথে নগর ও পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূর করার নির্দেশ প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে সারা দেশে 'দ্বি-স্তর সমবায়' ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি ও দর্শনের আলোকে আইআরডিপি (IRDP-Integrated Rural Development Programme)'র মাধ্যমে বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেন। যা পরবর্তীতে বিআরডিবি'তে রূপান্তরিত হয় এবং পল্লী উন্নয়নে দেশের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণকারী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শপথ গ্রহণকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার গঠনের পর পল্লী উন্নয়নে নবযাত্রা শুরু হয়।

গত এক দশকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারি, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পল্লী জনগণের জীবনমান উন্নয়ন হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, গুচ্ছ গ্রাম, আশ্রয়ণ, সিভিডিপি, কমিউনিটি ক্লিনিক, ঘরে ফেরা ইত্যাদি কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সরকার সংবিধানের অঙ্গীকার রক্ষার্থে 'আমার গ্রাম-আমার শহর' শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে গ্রামের পিছিয়ে পড়া মানুষ বঙ্গবন্ধুর ভাষায় গ্রামের দুখী মানুষের জন্য নাগরিক জীবনের সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার ভূমিহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর এবং গৃহহীন পরিবারকে ঘর তৈরি করে দিচ্ছে। বর্তমান সরকার শুরু হতেই পল্লীর জনগণের এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে এবং তার সফলতাও অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ২০১৫ সালেই নিম্নমধ্যআয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরি হতে উত্তরণ, টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের ভিত্তি স্থাপন করেছে। দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যা বর্তমানে ২২২৭ মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাপী নভেল করোনা ভাইরাসের কবলে যখন সারা দুনিয়ার অর্থনীতি থমকে দাঁড়িয়েছে, সেখানে বাংলাদেশ ২০২০-'২১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৫.২ অর্জন করেছে, যা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

পল্লী জনগণ

বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। তবে দেশে দিনে দিনে গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ক্রমহ্রাসমান। বর্তমানে শতকরা প্রায় ৬২ জন (বিশ্ব ব্যাংক-২০১৯) মানুষের বসবাস গ্রামে। পল্লী উন্নয়নের উপরই এদেশের জাতীয় উন্নয়ন নির্ভরশীল। এদেশের শতকরা ২০.৫০ জন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের কৃষিপ্রধান দেশের এ বিরাট জনগোষ্ঠীর অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ব্যতিরেকে দেশের উন্নয়ন আশা করা যায় না।

দক্ষিণ এশিয়ার পল্লী অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য :

১। কৃষিভিত্তিক জীবিকায়ন ও জীবিকায়নের কর্ম বৈচিত্র্য কম দেখা যায়।
২। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মহীনতা/বেকারত্ব হার বেশি।
৩। জীবনযাত্রা নিম্নমানসম্পন্ন।
৪। গ্রামীণ অবকাঠামো দুর্বল।
৫। মানুষের ধর্মীয় এবং সামাজিক বিশ্বাসের দৃঢ়তা।
৬। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নতুন প্রযুক্তি/শিক্ষা গ্রহণে অপারগতা।

বিভিন্ন দেশে পল্লী উন্নয়ন

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রান্তে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে পল্লী উন্নয়ন মডেল/কর্মসূচির ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন- দক্ষিণ এশিয়া/ আরব দেশসমূহের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অনেকটা ধর্মের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু পশ্চিমা দেশে জনগণ লৌকিকতার ওপর আস্থা রাখে। বর্তমান পৃথিবীর শতকরা ৪৪.২৮ জন মানুষ গ্রামে বাস করে। এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশের মানুষ গ্রামে অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। আবার এশিয়ার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামীণ জনসংখ্যার হার বেশি যা ৬৬%। অপরদিকে আরব দুনিয়ায় ৪১% এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পল্লী জনপদে থাকে ৪০% জনগণ।

নিম্নে ভারত ও দ.কোরিয়ার পল্লী উন্নয়নের কয়েকটি মডেল/কর্মসূচি বর্ণনা করা হলো :

ভারত

ভারতে প্রায় ৬.৪ লক্ষ গ্রাম রয়েছে এবং প্রায় ৬৫.৫৩% জনগোষ্ঠী পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে ধারাবাহিকভাবে পল্লী উন্নয়নের নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে ২০১১ সালে ভারতের মোট জনগোষ্ঠীর ৬.৭% অতি দরিদ্র এবং ২১.৯% দরিদ্র ছিল। জাতিসংঘের তথ্যমতে ভারত ২০০৬ হতে ২০১৬ সালের মধ্যে ২৭১ মিলিয়ন জনগণকে

দারিদ্র্যমুক্ত করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধারাবাহিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় ভারত এই সফলতা লাভে সক্ষম হয়েছে।

পল্লী উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ১৯৮২ সালে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে যা পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় নামে পরিচিত। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়টির নাম পরিবর্তন করা হলেও ১৯৯৯ সালে পুনরায় পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়টি গঠন করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পল্লীর দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবনজীবিকা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে যারা দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে।

পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের ২টি দপ্তর রয়েছে। যথা :

১. Department of Rural Development
২. Department of Land Resource

ভারতবর্ষে বর্তমানে বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রোগ্রাম চলমান আছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

Department of Rural Development এর অধীনে চলমান নিম্নে উল্লিখিত কয়েকটি কর্মসূচির বর্ণনা করা হলো :

- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)
- National Rural Livelihoods Mission (NRLM)
- Housing for All : Pradhan Mantri Awaas Yojana -(PMAY)
- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)
- National Social Assistance Programme (NSAP)

১. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)

MGNREGA হচ্ছে মূলত শ্রম আইন। এটি একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করে। আইনটি তৎকালীন ইউপিএ (United Progressive Alliance) সরকারের আমলে ২০০৯ সালে পাস হয়।

উদ্দেশ্য

১. আইনটির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতি অর্থ বছরে পল্লী অঞ্চলের প্রত্যেক পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের অনভিজ্ঞ কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে ১০০ দিনের কর্ম পারিশ্রমিক দ্বারা জীবনজীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান করা।
২. পল্লী অঞ্চলে মূল্যবান সম্পদ নির্মাণ করা যেমন : রাস্তা, খাল, পুকুর, কুয়া ইত্যাদি।
৩. আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা করা, নারীর ক্ষমতায়ন, পল্লীবাসীকে শহরমুখী হওয়া থেকে রোধ করা ও সামাজিক সমতা আনয়ন।

কর্ম এলাকা

লোকসভায় পাশ হওয়ার পর প্রাথমিকভাবে ভারতের ৬২৫টি জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে সকল জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্ণিত কর্মসূচিটি বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ ও উচ্চাভিলাষী সামাজিক নিরাপত্তা এবং পূর্ত কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আইনটির উল্লেখযোগ্য দিক

১. সুফলভোগীর গৃহের ৫ কিলোমিটারের মধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
২. ন্যূনতম পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে।
৩. সুফলভোগীর আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে যদি কর্মসংস্থান করা না হয়, তবে বেকার ভাতা প্রদান করতে হবে।
৪. গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। কোনো কনট্রাক্টর দ্বারা কাজ সম্পাদন করা যাবে না।
৫. ব্যাংক বা পোস্ট অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এই পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়।
৬. জনপ্রতিনিধি, এনজিও ও সরকারি কর্মীদের সহায়তায় Social Audit করা।

সফলতা

১. কর্মসূচিটির আওতায় সারা ভারতের ৬৯৬টি জেলা অন্তর্ভুক্ত। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পারিশ্রমিক বাবদ প্রদান করা হয়েছে।
২. ১,২০০ কোটি ব্যক্তি-দিন কর্ম তৈরি হয়েছে।
৩. কর্মসূচি চালু হওয়ার পর থেকে প্রদেশ ভেদে ৮১% মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪. মোট শ্রমিকের ১৯.১১% Scheduled Castes and ১৬.০৪% Schedule Tribes এবং ৪৭% নারীর ব্যক্তি-দিন কর্ম সৃষ্টি হয়েছে।
৫. কর্মসূচিটি শুরুর পর থেকে ৪.৮৪ কোটি সম্পদ সৃষ্টি করেছে।
৬. এ পযন্ত ১৪.২১ কোটি জব কার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ৯ কোটি মাস্টার রোলে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
১০. ২৭.৬৯ কোটি শ্রমিক এ সুবিধা গ্রহণ করেছে।
১১. বর্তমানে সক্রিয় শ্রমিক ১৩.০৩ কোটি।
১২. ২০২০-'২১ অর্থ বছরে অনুমোদিত শ্রম বাজেট ২৮০.৭৬ কোটি রুপি এবং ২০১৯-'২০ অর্থ বছরে অনুমোদিত শ্রম বাজেট ছিল ২৭৬.৭৬ কোটি রুপি।

২. National Rural Livelihoods Mission (NRLM)

জুন ২০১১ সালে ভারতীয় পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক National Rural Livelihoods Mission (NRLM) উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়। উদ্যোগটিতে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা রয়েছে। নভেম্বর ২০১৫ মাসে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় Deendayal Antayodaya Yojana (DAY- NRLM)

লক্ষ্য

পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দক্ষ ও কার্যকর একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্লাটফর্ম তৈরি করা যেখানে আর্থিক সেবাভুক্তির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং টেকসই জীবনজীবিকা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।

এ উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে ৮ হতে ১০ বছরের মধ্যে Self Help Group (SHG) এবং রাষ্ট্রীয় প্রাতিষ্ঠানের ৭ কোটি পল্লী পরিবার, ৬০০টি জেলা, ২.৫ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৬ লক্ষ গ্রাম এর আওতাভুক্ত করা এবং তাদের জীবনজীবিকা উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করা।

মিশন

লাভজনক এবং দক্ষ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণে সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, দরিদ্রদের মধ্যে শক্তিশালী দল গঠনের মাধ্যমে টেকসই জীবনজীবিকার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন।

বৈশিষ্ট্য

১. **সর্বজনীন সামাজিক সংহতি কার্যক্রম (Universal Social Mobilization) :** প্রতিটি চিহ্নিত দরিদ্র পল্লী পরিবার হতে অন্তত একজন নারীকে Self Help Group (SHG) এর আওতায় আনা। বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জাতি গোষ্ঠীকে।
২. **দরিদ্রদের অংশগ্রহণমূলক পরিচিতি (Participatory Identification of**

Poor) : দরিদ্রদের অংশগ্রহণমূলক পরিচিতি, স্বচ্ছতা ও সমতার ভিত্তিতে টার্গেট দল গঠন করা।

৩. **সম্প্রদায়ের তহবিলের যথাযথ ব্যবহার :** এনআরএলএম দরিদ্রদের সংগঠনদের রিভলভিং তহবিল এবং কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড সরবরাহ করে, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক পরিচালনার সক্ষমতা জোরদার করতে সহায়তা করে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৪. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion) :** আর্থিক অন্তর্ভুক্তির চাহিদা ও যোগানের দিক বিবেচনা করে এনআরএলএম কাজ করে থাকে। দরিদ্রদের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত জ্ঞান প্রদান করে থাকে। এছাড়াও আইসিটি, তথ্য ব্যবহার, ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বয় করে থাকে।

৫. দলীয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ।

৬. এনআরএলএম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অন্যান্য সংস্থা (এনজিও, সিএসও) কাজ করা।

অর্জন

৩২,৩২,৭৯০টি দল গঠনের বিপরীতে ৭,৮৪,০৬১টি দল গঠন।

৩. Housing for All : Pradhan Mantri Awaas Yojana

Housing for All: Pradhan Mantri Awaas Yojana ভারতীয় সরকারের একটি উদ্যোগ। এর মাধ্যমে শহর ও পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সাশ্রয়ী আবাসন ব্যবস্থা করা হয়।

লক্ষ্য

এই স্কীমের লক্ষ্য হচ্ছে মহাত্মা গান্ধী'র ১৫০তম জন্ম বার্ষিকী ৩১ মার্চ ২০২২ এর মধ্যে সারাদেশে ২০ মিলিয়ন গৃহ নির্মাণ।

স্কীমটির স্লোগান : "সকলের জন্য আবাসন"।

বাস্তবায়ন এলাকার ওপর ভিত্তি করে এই স্কিমটির ২টি অংশ রয়েছে।

১. শহুরে এলাকার জন্য Pradhan Mantri Awas Yojana Urban (PMAY- U) : এই স্কীমের আওতায় প্রায় ৪,৩৩১টি শহর রয়েছে। এই স্কীমের আওতায় শহর পরিকল্পনা ও নিয়মনীতি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করছে শহর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বিশেষ এলাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ অন্যান্য সংস্থা।

এ উদ্যোগটি ৪টি ফেজ এ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক. ফেজ-১ : ১০০টি শহর এপ্রিল ২০১৫ হতে মার্চ ২০১৭ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

খ. ফেজ-২ : ২০০টি অতিরিক্ত শহর এপ্রিল ২০১৭ হতে মার্চ ২০১৯ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ. ফেজ-৩ : লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাকি শহর এপ্রিল ২০১৯ হতে মার্চ ২০২২ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

অর্জন

১. অনুমোদিত গৃহ ৮৩.৬৩ লক্ষ

২. নির্মাণ সম্পন্ন গৃহ ২৬.০৮ লক্ষ

৩. অধিকারভুক্ত গৃহ ২৩.৯৭ লক্ষ

এই স্কীমের আওতায় এই পর্যন্ত ৫১,৪১৪.৫০ কোটি রুপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২. পল্লী এলাকার জন্য Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY- G) : স্কীমের এই অংশটি পূর্বে নাম ছিল Indira Awas Yojana। মার্চ ২০১৬ মাসে এর নতুন নামকরণ করা হয়। ভারতের দিল্লি ও চান্দিনীগড় ছাড়া সমগ্র দেশের পল্লী অঞ্চলে সহজে আবাসন ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এই স্কীমের উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা গৃহহীন এবং যারা জরাজীর্ণ গৃহে বসবাস করছে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পাকা গৃহ নির্মাণে সহায়তা করা। যেসকল সুফলভোগী সমতল ভূমিতে বাসবাস করে তারা ১.২০ লক্ষ রুপি এবং যারা উত্তর-পশ্চিমাংশে, পাহাড়ি এলাকায়, দুর্গম এলাকায় বাসবাস করে তারা ১.৩০ লক্ষ রুপি পাবেন। বর্তমানে সারাদেশের সকল প্রদেশে ১,০৩,০১,১০৭ গৃহ অনুমোদন করা হয়েছে।

এই গৃহ নির্মাণ ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মাঝে নিম্নলিখিত হারে নির্ধারিত হবে :

১. ৬০ :৪০ হারে সমতল এলাকাবাসীর জন্য।

২. ৯০ :১০ হারে উত্তর-পশ্চিম এলাকা এবং পাহাড়ী এলাকাবাসীর জন্য।

এই স্কিমের সুফলভোগীদের নির্ধারণ করা হবে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও কাস্ট জরীপ এবং নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা হয়।

১. Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST)

২. Non- SC/ST and Minorities under (Below Poverty Line)

উঠান বৈঠক বিআরডিবি, মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি।

৩. নিবন্ধিত স্বেচ্ছাশ্রমিক

৪. আধা-সামরিক বাহিনী এবং কর্মে নিহত ব্যক্তি, প্রাক্তন-সৈনিক এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা।

৪. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)

PMGSY প্রকল্পটি ভারতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি প্রকল্প। ২৫ ডিসেম্বর ২০০০ সালে বর্ণিত প্রকল্পটি গৃহীত হয় যা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের একটি উল্লেখ্যযোগ্য কৌশল। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল হিসেবে

যেসকল এলাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই সেসকল এলাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন। রাজ্য পর্যায় পল্লী সড়কের টেকসই নেটওর্য়াক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য উন্নত প্রযুক্তি এবং আদর্শ ব্যবস্থাপনা কৌশল ও পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ভারতীয় সরকার সচেষ্ট রয়েছে।

PMGSY হচ্ছে একটি জাতীয় পরিকল্পনা যার লক্ষ্য হচ্ছে সকল আবহাওয়ায় ব্যবহারযোগ্য সড়ক নেটওর্য়াক নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন।

উদ্দেশ্য

১. যে সকল সমতল পল্লী এলাকায় ৫০০ জনের অধিক এলাকাবাসী রয়েছে এবং পাহাড়ি, মরুভূমি এলাকায় ২৫০ জনের অধিক এলাকাবাসী রয়েছে, সে সকল এলাকায় সকল আবহাওয়ায় ব্যবহারযোগ্য সড়ক নির্মাণ (প্রয়োজনীয় কালর্ভাট, (ক্রস ড্রেনসহ) নির্মাণ।

২. যে সকল পল্লী এলাকায় উপর্যুক্ত সংখ্যক পল্লীবাসী রয়েছে কিন্তু সকল আবহাওয়ায় ব্যবহারযোগ্য সড়ক নির্মাণ করা হয়নি, সে সকল পল্লী এলাকায় সড়ক উন্নয়ন।

৫.National Social Assistance Programme (NSAP)

NSAP ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত স্কীম। বয়স্ক নারী-পুরুষ, বিধবা, শারীরিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের সামাজিক পেনশন হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান এ স্কীমের উদ্দেশ্য।

স্কীমটির ৫টি উপাদান রয়েছে।

১. Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)

- ৬০ বছর ও এর বেশি।
- দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান।
- ৮০ বছরের নিচে প্রতি মাসে ৩০০ রুপি এবং ৮০ বছরের উপরে প্রতি মাসে ৫০০ রুপি।

২. Indira Gandhi National Widow Pension Scheme (IGNWPS)

- দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান।
- বয়স ৪০ হতে ৭৯ বছর
- প্রতি মাসে ৩০০ রুপি।

৩. Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)

- বয়স ১৮ ও এর বেশি
- দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান।
- ৮০% শারীরিকভাবে অসমর্থ।
- ৮০ বছরের নিচে প্রতি মাসে ৩০০ রুপি এবং ৮০ বছরের উপরে প্রতি মাসে ৫০০ রুপি।

৪. National Family Benefit Scheme (NFBS)

- পরিবারের উপার্জনকারীর মৃত্যু হলে পরিবারকে ২০,০০০ রুপি প্রদান করা হবে।
- মৃত্যুবরণকারী উপার্জনকারীর বয়স ১৮ হতে ৬৪ হতে হবে।
- ৫. Annapurna Scheme
- অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি মাসে ১০কেজি চাল প্রদান করা হবে।

বাস্তবায়ন কৌশল

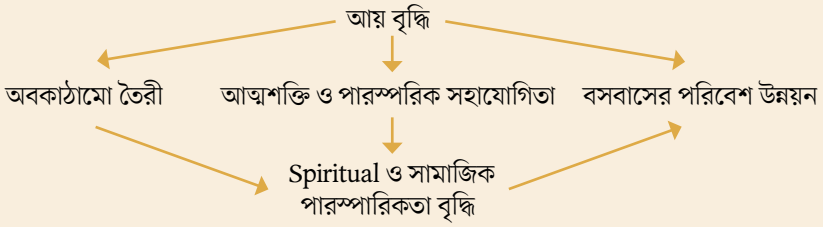

দক্ষিণ কোরিয়া

দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার ১৬.৫% মানুষ গ্রামে বসবাস করে। ১৯৬২ সালে RDA (Rural Development Administration) গঠিত হয়। RDA সবুজ বিপ্লব শুরু করে। এ সময় Saeaul Undong সবুজ বিপ্লবকে সহয়তা করে। এ সময় কেরিয়ার মাথাপিছু আয় ৮৭ মার্কিন ডলার ছিল।

Saemaul Undong

নতুন ভিলেজ আন্দোলন নামেও পরিচিত। সরকারের অর্থায়নে আয়, অবকাঠামো, কমিউনিটি বন্ধন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ কমিউনিটির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। এখানে আত্মবিশ্বাস এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির উৎসাহ প্রদান করে।

Saemaul Undong লক্ষ্য

স্বল্পমেয়াদি : ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়ন।
দীর্ঘমেয়াদি : উন্নত সমৃদ্ধ কমিউনিটি এবং কমিউনিটির মাধ্যমে শক্তিশালী রাষ্ট্র কাঠামো।

Saemaul Undong প্রকল্প/ কর্মসূচি

১। পল্লী আবাসন
২। পল্লী অবকাঠামো
৩। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি
৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা
৫। আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি

Saemaul Undong কৌশল :

১। গ্রাম হতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
২। সরকার উদ্যোগ Buttom- UP অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা।
৩। একইসাথে জাতীয় এবং গ্রাম পর্যায়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।
৪। একসাথে সকল কর্মসূচি/ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।
৫। পারস্পরিক শিক্ষণ বাস্তবায়ন করা।
৬। সরকারি সহাযোগিতা ব্যক্তি/সমাজের কার্য মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা।

ফলাফল

১। গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।
২। Spiritual অগ্রগতি।
৩। গ্রামীণ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন।

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে পল্লী উন্নয়নের গুরুত্ব হারিয়ে যায়নি। যদিও পৃথিবীর পল্লীর জনগণের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়নকেই দেশের উন্নয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মানব জাতির অগ্রগতির জন্য উন্নয়নের ১ম ধাপ হিসেবে পল্লী উন্নয়নকে বিবেচনা করা উচিত। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পল্লী উন্নয়ন সমগ্র বিশ্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

ফেরদৌস মামুন শিমুল : উপপরিচালক (ঋণ), বিআরডিবি

পল্লী উন্নয়নে প্রযুক্তি

দিপু মিয়ার রেণুপোনা চাষ, বিআরডিবি, দিঘলিয়া, খুলনা।

সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ আরিফ আসদাক

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ পল্লী এলাকায় বাস করে। তাই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উন্নয়নের প্রসঙ্গে অপরিহার্যভাবে পল্লী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। পল্লী উন্নয়ন হলো পল্লী এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক উন্নতি তথা পল্লী এলাকায় সার্বিক উন্নয়নকে বুঝায়। পল্লী উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক বিষয় যেখানে পল্লীর জনগণ ও পল্লীর জনপদের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হয় ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটে, একই সাথে পল্লী জীবনে লাগে আধুনিকতার ছোঁয়া, পল্লী জনগোষ্ঠী ভোগ করে সকল আধুনিক সেবা-সুযোগ। যেহেতু উন্নয়ন ও প্রযুক্তি একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত তাই পল্লী উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় বহুকাল আগে থেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যায়। কিছু কিছু প্রযুক্তি পল্লী জনগোষ্ঠী দ্বারা আবিষ্কৃত, আবার কিছু কিছু প্রযুক্তি গবেষণালব্ধ। পল্লী উন্নয়নের ক্রমধারায় লাঙল, গরু গাড়ি থেকে শুরু করে Harvester, Tractor সর্ব পর্যায়েই প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে আসছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা লাভের পর পল্লী উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালে দেশব্যাপী সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয় যার বহুখাতব্যাপী ও প্রযুক্তিভিত্তিক সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)'র সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে অগণতান্ত্রিক জনবিচ্ছিন্ন সরকারগুলোর অদূরদর্শী নীতির কারণে পল্লী উন্নয়নে ছন্দপতন ঘটলেও জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠনের পর তাঁর উদার ও প্রাগ্রসর নেতৃত্বে পল্লী উন্নয়নের চাকা আবারও গতি লাভ করে। তাঁর গৃহীত বহুমাত্রিক উন্নয়ন প্রযুক্তি ও উদ্যোগের ফলে আজ দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পল্লী জনগোষ্ঠীর

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে, পল্লী জীবনে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

ঐতিহাসিক বিবর্তন

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রাতিষ্ঠানিক পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। নানা সাহিত্য হতে জানা যায়, প্রাচীনকালে বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান যেমন- গ্রামভিত্তিক পঞ্চায়েত প্রভৃতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সেই গ্রামীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান ভূমিকা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আদায় ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্নকরণ।

পল্লী উন্নয়নে ভি-এইড প্রোগ্রামের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন প্রযুক্তি হস্তান্তর

পল্লী উন্নয়নের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা হিসাবে ১৯৫৩ সালের গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভি-এইড) প্রোগ্রামকে চিহ্নিত করা যায়। নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে এই উন্নয়ন প্রোগ্রামটি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম চালু করা হয়েছিল। গ্রামীণ জীবনযাত্রার বিভিন্ন সমস্যাসমূহ ভি-এইডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি কৃষি, ভূমি পুনরুদ্ধার, অবকাঠামো, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক কার্যক্রম প্রভৃতি বিষয়ের ওপর কাজ করে।

ষাটের দশকে 'কুমিল্লা মডেল' এর মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন প্রযুক্তি হস্তান্তর

'কুমিল্লা মডেল' বা 'কুমিল্লা অ্যাপ্রোচ' গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে এবং জনগণের সুফল দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য একটি বিখ্যাত উদ্যোগ ছিল। পল্লী উন্নয়নের জন্য ষাটের দশকে এই মডেলটি পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তিত হয়েছিল যা পাকিস্তান পল্লী উন্নয়ন অ্যাকাডেমি এর মাধ্যমে চালু করা হয় (পরবর্তীতে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি 'বার্ড'; নামকরণ করা হয়)। বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ও উন্নয়ন গবেষক ড. আক্তার হামিদ খান এই মডেলটি প্রবর্তন করেন।

কুমিল্লা মডেলের চারটি প্রধান উপাদান হচ্ছে-

(ক) পল্লী পূর্ত কর্মসূচি;

(খ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষি, সমবায় ব্যবস্থাপনা, জনসাধারণের সমন্বয় সাধন, ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন;

(গ) সেচ সুবিধা প্রদান এবং গ্রামীণ কৃষকদের মাঝে সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য থানা সেচ কার্যক্রম;

(ঘ) দ্বি-স্তর সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ মানব সংগঠন সৃষ্টি ও সমন্বয় এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য যৌথ প্রচেষ্টা।

স্বাধীনতা পরবর্তী আইআরডিপি কর্মসূচির (বর্তমান বিআরডিবি) মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও দারিদ্র্য বিমোচনে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

কুমিল্লা মডেলটি পরীক্ষামূলকভাবে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়। এই পদ্ধতির সাফল্যের কথা বিবেচনা করে ১৯৭০-৭১ সালে 'ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আইআরডিপি)' নামক একটি জাতীয় কর্মসূচি'র মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। নবগঠিত স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশেষ এবং সরাসরি নির্দেশনায় ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আইআরডিপি)কে সক্রিয় করা হয়েছিল। তিনি পল্লী উন্নয়নের প্রধান প্রচেষ্টা হিসেবে আইআরডিপি বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

আইআরডিপি'র প্রধান কার্যক্রম ছিল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা এবং অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, আয় উৎসারী প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ঋণ এবং উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিপণনের ব্যবস্থা করা। আইআরডিপি কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষি উৎপাদন ও পল্লী উন্নয়নে বিভিন্ন প্রযুক্তি ও কৌশলের সফলতার কারণে সারাদেশে অধিক খাদ্য ফলাও, সবুজ বিপ্লব ইত্যাদি কার্যক্রম সফল হয়। পরবর্তীতে আইআরডিপি'র সাথে বিশেষ কিছু কার্যক্রম সংযোজিত হয়। এসব কার্যক্রম ও কর্মসূচির মধ্যে নারী উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৭৩), যুব উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৭৮) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আইআরডিপি'র এই সকল কর্মসূচিগুলো অত্যন্ত সফল ছিল এবং পল্লী উন্নয়নে বিশেষভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিপুল অবদান রেখেছিল।

বীজ-সার-সেচ প্রযুক্তি

গ্রামীণ এলাকাকে স্বনির্ভর করার উদ্দেশ্যে আইআরডিপি আধুনিক সেচ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা, সার-কীটনাশক সরবরাহ, উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ, বিশেষ বাণিজ্য, পুঁজি সরবরাহের জন্য ঋণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। দুই দশকের মধ্যে বিআরডিবি-এর সরাসরি সহায়তায় ও তত্ত্বাবধানে দেশের সব উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) প্রায় দ্বিগুণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামোতে প্রচুর অবদান রেখেছে যার কারণে দেশে ধীরে ধীরে দারিদ্র্য বিমোচন শুরু হয়।

বিআরডিবির অবদান

আইআরডিপির সাফল্যের কথা বিবেচনা করে ১৯৮২ সালে একটি অধ্যাদেশে এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার এটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)' নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০১৮' পাশের মাধ্যমে বিআরডিবি প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা অর্জন করে। বিআরডিবি এখন পল্লী উন্নয়ন এবং পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত প্রধান সরকারি সংস্থা যা আধুনিক বহুমুখী প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সেচ সম্প্রসারণ, পল্লীর দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে আয় উৎসারী বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের দ্বারা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়নসহ নানামুখী পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম করে আসছে।

উন্নয়ন ধারায় দীর্ঘ পথপরিক্রমায় বিআরডিবি উল্লেখযোগ্যভাবে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিআরডিবি'র মূল অবদানগুলো নিম্নরূপ-

১. আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি
২. আধুনিক সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ
৩. স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রযুক্তি হস্তান্তর
৪. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা
৫. মানবসম্পদ উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান
৬. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি
   ক. সঞ্চয় পদ্ধতি প্রবর্তন
   খ. সুলভ ঋণ বিতরণ
   গ. দরিদ্র সুফলভোগীদের কাছে পরিষেবাগুলো সহজে পৌঁছানো
   ঘ. আর্থিক পরামর্শ
৭. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ
৮. লিংক মডেলের মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা সমন্বয়
৯. গ্রামীণ নেতৃত্ব উন্নয়ন, বিশেষ করে নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন
১০. পরিবার পরিকল্পনা

১১. স্যানিটেশন
১২. খাদ্য ও পুষ্টি, সামাজিক ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, সম্প্রসারণ সেবা ইত্যাদি।

পল্লী উন্নয়নে প্রযুক্তি

১. পল্লীর পশ্চাৎপদ জনগণের উন্নয়ন

উত্তরাঞ্চলের মঙ্গাপীড়িত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী, পার্বত্য এলাকাবাসী, উপকূলবাসী, হাওড়বাসী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রভৃতি পশ্চাৎপদ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের সমতাকরণের জন্য বিশেষ সমর্থন বা সহযোগিতা প্রয়োজন যাতে তারা উন্নয়নের মূল গতিধারায় আসতে পারে। পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ আজ সময়ের দাবি। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের স্বাবলম্বী করতে হবে অন্যদিকে তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। পল্লীর পশ্চাৎপদ জনগণের উন্নয়নের জন্য সরকার আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উন্নয়নের এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে সরকার উপকূলবাসীর জীবন রক্ষার্থে যেমন আধুনিক টেকসই বাধ নির্মাণ করছে, তেমনি হাওড়বাসীদের হঠাৎ বন্যা বা ফ্ল্যাশ ফ্লাড মোকাবেলার জন্য আগাম তথ্য ও আধুনিক কলাকৌশল বা প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। এখন হাওড় এলাকায় ফ্ল্যাশ ফ্লাড হওয়ার খবর আগেই হাওড়বাসী জানতে পারে আর আগেই হাওড়বাসী তাদের শস্য ঘরে তুলতে পারে। আধুনিক Satellite এর মাধ্যমে আবহাওয়ার আগাম বার্তা প্রাপ্তির ফলে হাওড়বাসীর শস্য ক্ষতি অনেকাংশে কমে গিয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মাণ হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির ড্যাম। উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের আগাম তথ্য প্রাপ্তির ফলে জানমালের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে আধুনিক সাইক্লোন সেন্টার। বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য নেওয়া হচ্ছে নানা উদ্যোগ। নোয়াখালীর দ্বীপ এলাকা ভাসানচরে বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের বসবাসের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে পরিবেশবান্ধব আধুনিক আবাসস্থল। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য নেয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। এ সকলই প্রযুক্তির অবদান।

সরকারের এই কার্যধারার অংশীজন হিসেবে বিআরডিবি সবসময় পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করে। উত্তরাঞ্চলের মঙ্গাপীড়িত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে হাতে কলমে আয়বর্ধনমূলক প্রযুক্তিগত জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরডিবি মূল কার্যক্রমের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত 'গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প'টি বাস্তবায়ন করছে। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত আরেকটি প্রকল্প 'IDEAL Project' বাস্তবায়িত হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা মোকাবেলায় 'উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি' নামক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। নোয়াখালীর ভাসানচরে স্থানান্তরিত বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি'ই প্রথমে উৎপাদনমুখী আধুনিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজি চাষ, মেশিনে সেলাইয়ের কাজসহ নানা ধরনের প্রশিক্ষণ হাতেকলমে প্রদান করা হচ্ছে। পার্বত্য এলাকাবাসীর জন্য বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

২. পল্লী জনপদের উন্নয়ন

বাংলাদেশ হচ্ছে কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। আর গ্রামবাংলাই হলো কৃষি অর্থনীতির মূল ক্ষেত্র। তাই গ্রামবাংলার সার্বিক উন্নয়নের ওপরই বাংলাদেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে। গ্রামীণ উন্নয়ন বলতে গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নকে বলা হয়। আর গ্রামবাংলার জনপদ যদি বলা হয়, তবে তা কৃষক আর কৃষির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ শতকরা ৮০-৯০ ভাগ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই কৃষির বিপ্লব মানে হলো গ্রামীণ জনপদের উন্নয়ন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। কৃষিকাজ এখন যন্ত্রের মাধ্যমে হচ্ছে। চাষাবাদ, বীজ বপন, নিড়ানি, সার দেওয়া, ফসল কাটা, মাড়াই, ঝাড়া ও প্যাকেটিং পর্যন্ত সবই হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে। বর্তমান সরকারের বহুমাত্রিক বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগের ফলে Tractor, Harvester, Ripper, Sprayer ইত্যাদি কৃষিযন্ত্রসমূহ আজ সারাদেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষির যান্ত্রিকীকরণের ফলে একদিকে যেমন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদন ব্যয় কমছে। শস্য ক্ষেতে কোনো রোগবালাই দেখা দিলে কৃষকরা তাদের মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তুলে তা পাঠিয়ে দিচ্ছে কৃষি বিশেষজ্ঞের কাছে। আর মিলছে সাথে সাথে এর পরামর্শ। ২৪ ঘণ্টা বিশেষ কৃষি সেবা চালু রয়েছে যেখানে কৃষকরা দিন-রাত যেকোনো সময় ফোন করে যেকোনো পরামর্শ পাচ্ছে। এ সকল প্রযুক্তির ফলে একই সঙ্গে ফসলের অপচয়ও কমছে। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ সাফল্য অর্জনের পিছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি। আজকাল কৃষিজমি ম্যাপিং-এর কাজে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। কমছে অনাবাদি জমির পরিমাণ। কৃষি, মৎস্য, পশুপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে উপরে। উদ্ভাবিত ফসলের উন্নত জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে পৌঁছানো একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষিক্ষেত্রে এই বিশাল উন্নয়ন বর্তমান সরকারের সঠিক সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্তেরই ফল।

সকল আধুনিক প্রযুক্তি বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম হলো বিদ্যুতের ব্যবহার। বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন সহজ ও দ্রুততর হচ্ছে। সারা দেশে শতভাগ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিতে বিদ্যুৎ খাতেও চলছে বর্তমান সরকারের বিশাল কর্মযজ্ঞ। দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকার প্রত্যন্ত গ্রামগুলো আলোকিত করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এখন শুধু শহরাঞ্চলেই নয়, বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হচ্ছে গ্রামীণ জনপদও।

আবহমান কাল ধরে হস্তচালিত তাঁত, তেলের ঘানি, বাঁশ-বেত ও মাটির কাজ গ্রামের মানুষের সম্পূরক আয়ের ব্যবস্থা করছে। এগুলো ধীরে ধীরে প্রযুক্তিনির্ভর হচ্ছে। পল্লীর বিভিন্ন অবকাঠামো যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, হাট-বাজার ও রাস্তাঘাটের উন্নয়ন স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করেছে। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পল্লীর প্রতিটি ঘরে ব্যাংকিং সুবিধা নিয়ে গিয়েছে। ডিজিটাল এজেন্ট ব্যাংকিং চালু হয়েছে, হাট বাজারে রয়েছে বুথ। পল্লী জনগোষ্ঠী ঘরে বসেই এজেন্টের সহায়তায় টাকা লেনদেন করতে পারে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে উপজেলা পর্যায় গড়ে উঠেছে কম্পিউটার সেন্টার। গ্রামের মানুষের কাছে ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে গিয়েছে। ঘরে বসেই তারা কথা বলতে পারছে প্রবাসী কোনো আত্মীয়ের সাথে। জানতে পাচ্ছে সারা বিশ্ব সম্পর্কে।

বিআরডিবি'র মাধ্যমে পল্লী জনপদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হচ্ছে। বিআরডিবি'র মাধ্যমে কৃষক সুফলভোগীদের আধুনিক কৃষি উৎপাদন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান ও কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হচ্ছে। অপ্রধান শস্য কর্মসূচির আওতায় দেশের সকল জেলায় আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি হস্তান্তরের মাধ্যমে অপ্রধান শস্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশীদারিত্বমূলক পল্লীর উন্নয়ন প্রকল্প-৩ এর মাধ্যমে পল্লীর জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু

ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র অবকাঠামো তথা রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, সুপেয় পানির ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পল্লী অঞ্চলে সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন, সুস্বাস্থ্য রক্ষায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে।

৩. নারীর ভাগ্যোন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই নারী এবং তারা উন্নয়নে অর্ধেক অংশীদার। আর এই গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে মূল স্রোতধারায় আনয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বর্তমান সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যাতে দেশের উন্নয়নের চাকা আরও বেগবান হয়। পল্লীর নারীরা উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের শামিল করতে পারছে। তথ্যপ্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লীর নারীরা একদিকে যেমন নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করছে তেমনি তাদের ক্ষমতায়নেও তা সহায়ক ভূমিকা রাখছে। আইসিটির ক্রমবর্ধমান বিকাশের সাথে সাথে পল্লীর নারীরা আজ সকল তথ্য আর জ্ঞান নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নারীর নতুন প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা ও আইসিটি পেশায় প্রবেশের সুযোগ হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে ঘরে বসে নারীরা কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেদের দক্ষ করে তুলছে এবং স্বাবলম্বী হচ্ছে। এতে অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়নের পথ সুগম হচ্ছে। পথের দূরত্বকে অতিক্রম করে প্রযুক্তির কল্যাণে পল্লী নারীরাও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সক্ষম হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ ও সফল নারীকর্মীগণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হচ্ছে।

বিআরডিবি গ্রামীণ পিছিয়ে পড়া নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। এগুলোর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত একটি প্রকল্প হচ্ছে 'দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান প্রকল্প'। এই প্রকল্পের আওতায় পল্লী নারীদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে। বিআরডিবি'র নারী সুফলভোগীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য মার্কেটিং লিংকেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এছাড়া বিআরডিবি'র মূল কার্যক্রম ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নারী ক্ষমতায়নে অবদান রেখে চলেছে।

৪. তারুণ্যের উজ্জীবন

দেশে অর্থনীতির চাকা গতিশীল করার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো ভূমিকা রাখছে গ্রামীণ শিক্ষিত তরুণদের মধ্যকার একটি বড় অংশের উদ্যোক্তা হিসেবে এগিয়ে আসার বিষয়টির মধ্যে অন্যতম। শিল্প ও কৃষি খাতের ব্যাপক উন্নয়ন, রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের দ্রুত বিকাশ সাধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে পল্লীর শিক্ষিত তরুণদের অবদান ও অংশগ্রহণ শুধু ব্যাপক ও বিস্তৃতই নয়— তাদের এই অংশগ্রহণ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন গুণগত মাত্রা সৃষ্টিতেও সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সরকার তরুণদের দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতে আনয়নের জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। বিআরডিবি সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে দেশের যুব সমাজের কল্যাণের জন্য যুব কর্মসূচি চালু করে। বিআরডিবি পল্লীর তরুণ ও যুব সমাজকে সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন দলের আওতায় সংগঠিত করে কৃষি উন্নয়ন; হাঁস-মুরগি পালন; গাভি পালন; ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, কম্পিউটার, মোবাইল সার্ভিসিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষিত এ সকল তরুণ-যুবকদের আর্থিক সহায়তা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে আয় উৎসারী কর্মসৃজনের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করে আসছে। তরুণদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি তাদের মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সম্প্রতি বিআরডিবি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা পল্লীর দক্ষ তরুণদের সফল উদ্যোক্তা হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৫. উদ্যোক্তা উদ্দীপন

প্রযুক্তির অবারিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশের পল্লী অঞ্চলে অনেক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। শহরের সমান সুযোগ গ্রামে নিশ্চিত করতে পারলে গ্রামেও আরও বেশী সংখ্যক উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার গ্রামীণ তরুণদের আধুনিক প্রযুক্তির ওপর আয় উৎসারী প্রশিক্ষণ প্রদান করছে এবং তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ করে দক্ষ জনবল, প্রযুক্তির সুবিধা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা গেলে আরো বেশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি হবে। বিআরডিবি'র অনেক সুফলভোগী দারিদ্র্য সীমা অতিক্রম করে বিআরডিবি'র গ্রাজুয়েট সদস্যে পরিণত হয়েছে। যারা এখন উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করতে পারে এবং নিজের ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প বা উদ্যোগের মাধ্যমে আরও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে। বিআরডিবি ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তা ঋণ বা এসএমই ঋণ চালু করেছে যার মাধ্যমে পল্লী উদ্যোক্তারা ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এর ফলে এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন পল্লী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে, পল্লীর স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে, পল্লীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে, অন্যদিকে পল্লী জনগোষ্ঠী জাতীয় উৎপাদনে আরও অবদান রাখতে পারবে।

৬. গ্রামে সরকারি পরিষেবার জবাবদিহিতা

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং সেবা সরবরাহে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমানে তথ্য বাতায়নে সরকারি দপ্তরসমূহের ওয়েবসাইট রয়েছে যেখানে সরকারের প্রতিটি পরিষেবার সকল তথ্য রয়েছে। পল্লীর জনগণ অনলাইনে সকল তথ্য পেতে পারে এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে। এর মাধ্যমে তারা যেমন নিজেদের অভিযোগ অনলাইনে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে, তেমনি অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়টিও অবগত হতে পারে। বর্তমানে ইনফরমেশন টেকনোলজি গ্রামে সরকারি পরিষেবার জবাবদিহিতা অনেকাংশে নিশ্চিত করেছে।

গ্রামে সরকারি পরিষেবার জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে বিআরডিবি'ও কাজ করে যাচ্ছে। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত 'পিআরডিপি-৩' প্রকল্পের আওতায় লিংক মডেল এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ের সেবা গ্রহণকারী অর্থাৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার মধ্যে লিংকেজ স্থাপন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহি করতে হয় যা জনবান্ধব সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের প্রতিটি প্রশাসনিক স্তরে এই মডেলের বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে আরও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

৭. আধুনিক প্রযুক্তি ও অংশীদারিত্বমূলক স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে পল্লীর সমন্বিত উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীর অংশীদারিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আধুনিক প্রযুক্তির সাথে অংশীদারী সমন্বয় ঘটালে উন্নয়ন আরও টেকসই হবে। বিআরডিবি পল্লীর জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

পরিচালনা করছে। অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ৩ এর আওতায় গ্রামবাসী, ইউনিয়ন পরিষদ ও প্রকল্প সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রামবাসীদের অতি প্রয়োজনীয় ক্ষুদ্র ভৌত অবকাঠামো যেমন- পাকা রাস্তা, কালভার্ট, সাঁকো, স্কুল মেরামত, ড্রেনেজ, টিউবওয়েল স্থাপন, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ইত্যাদি বাস্তবায়ন করছে। সারা দেশে এ ধরনের অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

৮. পল্লীর জন্য তথ্যপ্রযুক্তির প্রক্ষেপন

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সকল উন্নয়নকে গতিশীল ও দ্রুত ফলপ্রসূ করে। পল্লীর সকল কার্যক্রম ও সকল উন্নয়ন কর্মসূচিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পল্লীর উন্নয়নকে আধুনিক রূপধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ এ লক্ষ্যে কাজ করছে। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী প্রগতি প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ শিক্ষিত নারী-পুরুষদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, কইকা'র আর্থিক সহায়তায় রংপুর জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/ কর্মসূচি অনলাইন সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত ও মনিটরিং হচ্ছে যা পল্লী উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে।

৯. পল্লী শিক্ষার নতুন বাতায়ন

পল্লীর জনগণের বয়স, পেশা, আর্থিক সক্ষমতার তারতম্য প্রভৃতি বিবেচনা করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমুখী সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যাতে সকল স্তরের পল্লী জনসাধারণ এ শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গ্রামীণ প্রতিটি পরিবারকে চিহ্নিত করে পরিবারের শিক্ষা কার্যক্রম বহির্ভূত সদস্যকে মৌলিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সাফল্য বয়ে আনছে। দুর্গম এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভিডিও কন্সফারেন্সের মাধ্যমে সকল বয়সের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে পল্লী অঞ্চলসহ সারাদেশে স্কুল-কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায়, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। ঘরে বসেই শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোনো বই সংগ্রহ করা যায়।

বিআরডিবি'র সুফলভোগী আলমগীর হোসেন এর হাঁসের খামার, রামভদ্র জানপাড়া, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

১০. পল্লী আবাসন ও স্থাপত্য কৌশল

প্রতিটি গ্রামে আধুনিক শহরের সুবিধাদি পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে পল্লী আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। সরকার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও স্বল্প খরচে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনশীল গ্রামীণ আবাসনের ব্যবস্থার লক্ষ্যে বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ আবাসনের স্থাপত্য কৌশলের উন্নয়ন একদিকে যেমন অধিক সংখ্যক গ্রামীণ জনগণের জন্য শহরের সুবিধা যেমন- সুপেয় পানি, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সুবিধা প্রভৃতি ভোগের আয়োজন করতে পারে অন্যদিকে কৃষি জমি ক্রমশ সংকুচিত হওয়ার বিষয়টি রোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মতো আধুনিক সকল নাগরিক পরিষেবাসম্পন্ন মডেল ভিলেজ গঠন করা যেতে পারে। মডেল ভিলেজ ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি পল্লীর জনগণকে একটি বহুতল ভবনে বা একই জায়গায় আবাসনের ব্যবস্থা করলে তাদের উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান করা সহজ হবে এবং একইসাথে কৃষি জমি রক্ষা পাবে ও দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

১১. পল্লীর লোক শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন

সংস্কৃতির ভেতর দিয়েই সভ্যতা, মানবতা, বিশ্বজনীনতা ও জাতীয়তা বিকশিত হয়। পল্লী উন্নয়নের সাথে পল্লীর লোক শিল্পকলা ও সংস্কৃতি গভীরভাবে সম্পর্কিত। বাংলা ভাষার সাহিত্য, চারু ও কারুকলা, সংগীত, যাত্রা, নাটক, সৃজনশীল প্রকাশনাসহ পল্লী শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। একসময় আমাদের পল্লী সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। পল্লী জনগোষ্ঠীর বিনোদনের সাথে পল্লী সংস্কৃতি নিবিড়ভাবে জড়িত। পল্লী গান উৎসব, যাত্রাপালা, পিঠা উৎসব, পল্লী ক্রীড়া, পল্লী মেলা, পল্লী পণ্যের সমাহার প্রভৃতি আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে। অথচ যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করলে এ সকল বিষয় হতে পারে আনন্দের মূল কেন্দ্রবিন্দু যা পল্লী উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে আরও গতিশীল করতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী শিল্পকলা ও সংস্কৃতি যেমন পল্লী গান উৎসব, যাত্রাপালা, পিঠা উৎসব, পল্লী ক্রীড়া, পল্লী মেলা প্রভৃতিসহ সকল পল্লী বিনোদন ও উৎসবগুলো আয়োজন ও দেশ-বিদেশে

প্রচার প্রচারণা করা হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, দেশে পল্লী সংস্কৃতির আরও উন্নতি সাধিত হচ্ছে অন্যদিকে পল্লীর জনগোষ্ঠীর বহুমুখী উন্নয়ন ঘটছে।

১২. পল্লী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ এলাকা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসকল দেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ, বাংলাদেশের অবস্থান তার মধ্যে শীর্ষে। কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হলে সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয় পল্লীর জনগণ। আর এই পল্লীর জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম করে গড়ে তুলতে সরকারও সচেষ্ট। এ লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার সারাদেশে সবুজ বনায়ন ও উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। হাওড় এলাকায় ফ্ল্যাশ ফ্লাড হওয়ার খবর আগেই হাওড়বাসী জানতে পারে আর আগেই হাওড়বাসী তাদের শস্য ঘরে তুলতে পারে। আধুনিক সেটেলাইটের মাধ্যমে আবহাওয়ার আগাম বার্তা প্রাপ্তির ফলে হাওড়বাসীর শস্য ক্ষতি অনেকাংশে কমে গিয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের আগাম তথ্য প্রাপ্তির ফলে জানমালের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। আর একমাত্র আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

১৩. এলাকাভিত্তিক বিশেষ উন্নয়ন

আমাদের বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এদেশের ভৌগোলিক এলাকার বৈচিত্র্য রয়েছে। এক এক এলাকার জীবন-জীবিকা এক এক রকমের হয়ে থাকে। তাদের সমস্যারও ভিন্নতা রয়েছে। কাজেই আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এসকল এলাকা চিহ্নিত করা হচ্ছে এবং এলাকার সমস্যাভেদে এলাকার জনগণ ও জনপদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে সারাদেশে উন্নয়নের সমতা নিশ্চিত হচ্ছে।

১৪. আধুনিক প্রযুক্তিতে কৃষি-অকৃষি পণ্যের সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকার্যের সাথে জড়িত, তাদের জীবন-জীবিকা কৃষিনির্ভর। পল্লী জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত কৃষি-অকৃষি পণ্যের সঠিক সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন পদ্ধতি না থাকায় তারা উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। পল্লী কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য দ্রুত পচনশীল হয়ে থাকে। দ্রুত ও সঠিক সময়ে বিক্রয় করতে না পারলে উৎপাদিত কৃষি পণ্য নষ্ট হয় ও মূল্য হ্রাস ঘটে। কাজেই পল্লী জনগণকে কৃষি-অকৃষি পণ্যের সঠিক সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্ভব। বর্তমান সরকার কৃষি পণ্যের সঠিক সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যাতে উৎপাদিত কৃষি পণ্য ফসল মৌসুমে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করে সারা বছর বিক্রয় করা যায়। কৃষক ও কৃষি পণ্য সংরক্ষণের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

১৫. পল্লী বিপণীর মাধ্যমে বাজার সংযোগ বৃদ্ধি

প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকরা বিভিন্ন ফড়িয়ার কাছে কৃষিপণ্য বিক্রি করায় তারা ন্যায্য মূল্য হতে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া পল্লী অঞ্চলে এ সকল কৃষিপণ্যের কোনো সংরক্ষণাগার না থাকায় তারা তা সঠিকভাবে সংরক্ষণও করতে পারে না। কাজেই প্রান্তিক কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত কৃষিপণ্য দ্রুত ও সহজ পদ্ধতির বিপণনের মাধ্যমে বাজার সংযোগ বৃদ্ধি একান্তই প্রয়োজন। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এখন চাল, ডাল, শাক-সবজি, ফলসহ সকল কিছুই অনলাইনে কেনাকাটা করা যাচ্ছে। মানুষ ঘরে বসেই সকল কৃষিপণ্য ক্রয় করতে পারছে। ইদানীং আমরা অনেকেই চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমবাগান হতে ঘরে বসেই সরাসরি আম সংগ্রহ করতে পারছি।

বর্তমানে অনেক অনলাইন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যার সাথে সরাসরি উৎপাদনকারীরা সম্পৃক্ত রয়েছে। ওয়েবসাইটে কৃষিপণ্য দেখে ক্রেতারা পণ্য অর্ডার করছে আর উৎপাদনকারীরাও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে দ্রুত পণ্য সরবরাহ করছে। পণ্য মূল্য পরিশোধ হচ্ছে ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারের মাধ্যমে।

১৬. পল্লী জনগণের স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়ন

একসময় পল্লী জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। পল্লী অঞ্চলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি। সরকার এখন প্রতিটি উপজেলায় আধুনিক চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণ করছে। এখন প্রায় প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র। রোগী পরিবহণের জন্য রয়েছে অ্যামবুলেন্স। এর ফলে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের গড় আয়ু। স্বাস্থ্যসেবায় আধুনিক প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে অনলাইন চিকিৎসা ব্যবস্থা। পল্লীর যে কোনো প্রান্তে থাকা কোনো লোক হাই স্পিড ইন্টারনেট ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যে কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে নিতে পারছে চিকিৎসা সেবা।

১৭. পল্লী পর্যটন

গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী পর্যটন একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গ্রাম বাংলার আবহমান রুপ, দেশীয় খাবার, দেশীয় সংস্কৃতি, গ্রামীণ খেলা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি, বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সমাহার, বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, বিরল জীববৈচিত্র্য প্রভৃতি বিশ্ব পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত সেবা প্রদানের মাধ্যমে পল্লীর এ সকল বিষয় পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরা হচ্ছে।

ওয়েবসাইটসহ আধুনিক প্রচার মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক প্রচারণা করা হচ্ছে। শহরের ক্লান্তিময় যান্ত্রিক জীবন থেকে বের হয়ে গ্রামীণ জীবন, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি উপভোগের জন্য গ্রামে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে Village Tourism Home গড়ে উঠেছে।

১৮. ক্ষুদ্র গ্রামীণ জাতিসত্তার উন্নয়ন

বাংলাদেশে অনেকগুলো ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে ১১টি জাতিসত্তা অনেক বছর আগে থেকে বসবাস করে আসছে। এরা হচ্ছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো,তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখুয়া, চাক, খ্যাং, খুমি এবং লুসাই। বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশের বৃহত্তর ময়মনসিংহে রয়েছে গারো, হাজং, কোচ এবং বৃহত্তর সিলেটে রয়েছে খাসি, পাত্র ও মণিপুরি জনগোষ্ঠী। আবার বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশের দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি এলাকায়ও বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। যেমন- সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহালি, মালো, মুণ্ডা, মালপাহাড়ি ইত্যাদি। এছাড়াও দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় বসবাস করেন রাখাইন জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস রয়েছে। যেমন- রাজবংশী, সূর্যবংশী বর্মণ, ডালু, হদি, মাহাতো, বানাই, পাথর, কোল ইত্যাদি। এ সকল ক্ষুদ্র গ্রামীণ জাতিসত্তা উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন টিভি, রেডিও, পত্র-পত্রিকা, ওয়েবসাইটসহ অন্যান্য মাধ্যমে এ সকল ক্ষুদ্র গ্রামীণ জাতিসত্তার কৃষ্টি-কালচার, সংস্কৃতিসহ তাদের জীবন বৈচিত্র্য জীবনের বিভিন্ন বিষয় সর্বত্র প্রচার করা হচ্ছে। তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য

উদকনিক প্রকল্পের ডিসপ্লে সেন্টার পরিদর্শন করছেন সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং মহাপরিচালক, বিআরডিবি।

বিভিন্ন আয় উৎসারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে, উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর করা হচ্ছে।

১৯. গ্রামীণ কুটির শিল্প উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প শুধু অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে তা নয়, এটি আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। এ দেশে বেশ কয়েক ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে। এগুলোর মধ্যে চামড়া শিল্প, সাবান শিল্প, তামাক শিল্প, তাঁত শিল্প, রেশম শিল্প, মৃৎ শিল্প, কাঁসা শিল্প, কাঠ শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী এই কুটির শিল্পের সাথে সরাসরি নিযুক্ত থেকে নিজেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করছে। সারাদেশে শত শত বছর ধরে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মিটিয়ে আসছে। এ সকল কুটিরশিল্প আধুনিকায়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামে হস্তচালিত তাঁতকল খুব একটি দেখা যায় না। বৈদ্যুতিক যন্ত্র চালিত তাঁতকলের ব্যবহার হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে রেশম উৎপাদন করা হচ্ছে। সকল প্রকার কুটির শিল্পের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এসেছে।

উদ্যোক্তাদেরকে ঋণদান, শিল্প পণ্যের নকশা ও নমুনা সরবরাহ, দক্ষতা উন্নয়ন, শিল্পনগরী স্থাপন করে প্লট বরাদ্দ, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি ইত্যাদি সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কুটির শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হচ্ছে।

২০. নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Solar Panels, Wind Mills, Water Turbines)

নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলতে আমরা বুঝি প্রকৃতিগতভাবেই যে শক্তি তৈরি হয় এবং যা কখনও শেষ হয় না। যেমন সূর্যের আলো, পানি, বায়ু, ভূগর্ভস্থ শক্তি ইত্যাদি। পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার্থে এখন নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার অপরিহার্য। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা রয়েছে সৌর শক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের। এছাড়াও রয়েছে পানি বিদ্যুৎ, বায়ু বিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস, ধানের তুষ, ইক্ষুর ছোবড়া, বর্জ্য, শিল্প প্রক্রিয়ার অব্যবহৃত তাপ হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইত্যাদি। সারাদেশে বিশেষ করে দেশের পল্লী অঞ্চলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কাজে লাগানের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামের প্রায় অনেক বাড়িতে দেখা যায় সোলার প্যানেল। সোলার প্যানেলের মাধ্যমে সৌর শক্তি সংরক্ষণ করে রাতেও বাড়িতে বাড়িতে বৈদ্যুতিক লাইট জ্বলছে। অনেক পল্লী অঞ্চলে বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের দেখা মেলে। এ ছাড়া গরুর গোবর, ধানের তুষ, ইক্ষুর ছোবড়া প্রভৃতি ব্যবহার করে জ্বালানি চাহিদা মেটানো হচ্ছে।

২১. পল্লীর তথ্য বাতায়ন

সরকার বিভিন্ন সেবা পল্লীর জনগণের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে পল্লীর নাগরিকেরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, পর্যটন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে পল্লী তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কেন্দ্রে গ্রামের সকল পেশাজীবী মানুষ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। সকল ধরনের তথ্য পল্লী জনগোষ্ঠীর কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য।

বর্তমান সরকার বিশ্বব্যাপী গৃহীত ও অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-কে সুবিবেচনায় রেখে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণ, ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে 'সোনার বাংলার' রূপায়ণ, ২০৭১ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ এবং ২১০০ সালে নিরাপদ ব-দ্বীপের অন্বেষায় কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই দেশের সমৃদ্ধির এ অগ্রযাত্রায় পল্লী উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বহুমাত্রিক পল্লী উন্নয়ন প্রযুক্তির পরিচিতি ও প্রসার ঘটিয়েছেন।

সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ আরিফ আসদাক : উপপরিচালক (সেচ), বিআরডিবি

পল্লী উন্নয়নে
শেখ হাসিনার সরকার

ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান, ফারুক জোয়ার্দ্দার
মোঃ দেলোয়ার হোসেন, মোঃ আসাদুজ্জামান,
মনিরুল ইসলাম

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার যখন দেশকে পুনর্গঠন করে সমৃদ্ধির সোপান তৈরি করেছিলেন তখন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসের করুণতম বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটে যায়। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এমন এক সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন যেখানে দেশের সকল মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করবে। মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আইনের শাসন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সকলে সমানাধিকার ভোগ করবে।

পল্লী উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের অবদান নিম্নরূপ :

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম;
- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন;
- কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব সাধনে এবং গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার প্রদান করা হয়েছে;
- দেশের সকল প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ;
- কৃষি ও ভূমিসংস্কার ১৯৭৪; কৃষিজমির সিলিং ১০০ বিঘা নির্ধারণ;
- সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি যা কুমিল্লা পদ্ধতি নামে সমধিক পরিচিত তাকে

সারা দেশে সম্প্রসারণ;
- গ্রামীণ রাস্তা সংস্কার ও সম্প্রসারণ;
- যুদ্ধে বিধ্বস্ত রেল, সমুদ্রবন্দর, এয়ারপোর্ট সহ যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন;
- প্রতিটি গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায় সংগঠন যার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র ও সমবায় আন্দোলনকে কেন্দ্রবিন্দু করার অঙ্গীকার ছিল;
- ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় অ্যাসোসিয়েশন বা মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগ সরকারের পল্লী উন্নয়নে অবদান (১৯৯৬-২০০১)

নানামুখী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন জনগণের সমর্থনভিত্তিক সাংগঠনিক দক্ষতায় বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশের মাটিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ক্ষেত্রে কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার (১৯৯৬-২০০১) বাংলাদেশের সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় কিছু মাইলফলক তৈরি করেন। যথা :

- কৃষিক্ষেত্রে প্রণোদনা প্রদান, কৃষি ভর্তুকি বৃদ্ধি সাধন ও বাংলাদেশকে ধান ও দানাদার খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।
- গ্রামীণ জনগণের জন্য কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা।
- সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে সম্প্রসারণ করে বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা চালুকরণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ভাতা সম্প্রসারণ।
- দেশে প্রথমবারের মতো মোবাইল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ যা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামকে সংযোগ সাধন করে।
- একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচির যাত্রা আরম্ভ।
- ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি- যা কৃষিকাজ, নদীর নাব্যতা, কৃষি সেচ, পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত হয়।
- খাদ্য শস্য উৎপাদনে সাফল্য লাভ করে।
- যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ।
- ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্য মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সফল হয়।
- জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০০ সালে বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সাথে উক্ত দলিলে স্বাক্ষর প্রদান করেন।
- ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

নির্বাচন মেনিফেস্টো : দিনবদলের সনদ এবং সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার (রূপকল্প ২০২১) একটি যুগান্তকারী সনদ। এতে উল্লেখ করা আছে যে, ২০২০-'২১ সাল নাগাদ এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন এ জাতি দেখছে যেখানে একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচিয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করবে। শুধু তাই নয়, এতে নিশ্চিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ। গড়ে উঠবে এক প্রগতিশীল উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে সরকারের সকল কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এ রূপকল্পের বৈশিষ্ট্য। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর অধীনস্থ সংস্থাগুলো বদ্ধপরিকর।

দিনবদলের সনদ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর ২০১৮ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। এতে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর, ২০৪১ সালে উন্নত দেশ সোনার বাংলা, স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে ২০৭১ সালে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানো এবং ২১০০ সালে নিরাপদ ব-দ্বীপ নিশ্চিতকরণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এ সনদে ১৯টি বিষয়ে সাফল্য অর্জনের টার্গেট নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য নির্মূল, ডিজিটালাইজেশন, কৃষির আধুনিকায়ন, দরিদ্র-বান্ধব টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অন্যতম। ইশতাহারে দুটি বিশেষ অঙ্গীকার করা হয়। প্রতিটি গ্রামে শহরের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে 'আমার গ্রাম আমার শহর' এবং তরুণ যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তায় 'তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি' ধারণা বাস্তবায়ন।

জনবান্ধব উন্নয়নকামী গণতান্ত্রিক সরকার ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে যে মহাপরিকল্পনা, সুদূরপ্রসারী কৌশল ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এ বিভাগ তার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বিগত এক যুগের সমৃদ্ধির পথযাত্রাকে সময়ানুক্রমিক বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হলো।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান (২০০৯-২০১৪)

২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দলীয় মহাজোট সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সরকার গঠিত হবার পর ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নযাত্রা শুরু হয়। কৃষির পাশাপাশি অকৃষিখাতে কর্মসংস্থানে আওয়ামী লীগ সরকার নানা প্রাতিষ্ঠানিক প্যাকেজ তৈরি করে। সরকারি নীতি সহায়তায় গ্রামীণ বাংলাদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও খামারি গড়ে ওঠে। গ্রামে নারী উদ্যোক্তাদের পদচারণা উল্লেখযোগ্য হারে শুরু হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তিনি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্যতম লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন। যেকোনো কৃষক মাত্র ১০.০০ (দশ) টাকায় ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারছে। এতে কৃষকদের ব্যাংক প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উন্নয়নের মহাসোপানে উপনীত হয়। কোভিড-১৯ এর অভিঘাতে কৃষকের ক্ষতি পুষিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার ৪ শতাংশ সুদে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিসহ অন্যান্য কৃষকদের এবং ফুল, ফল, মৎস্য চাষি, ডেইরি ও পোল্ট্রি খামারিদের ১৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ প্রদানের এক যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।[১]

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান (২০০৯-'২০)

২০০৯-'২০ সময়কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রিত্বকালে

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ-এর নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবন।

শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর-এর নবনির্মিত প্রশাসনিক ভবন।

মহাজোট সরকার পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে :

বিগত সময়ে (২০০৯-'২০) বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাসে কিছু মাইলফলক তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ একটি রূপান্তরের মধ্য দিয়ে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হচ্ছে। তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম সময়ে বাংলাদেশ একটি নিম্ন আয়ের দেশ থেকে অথবা স্বল্প উন্নত দেশের পরিচয়কে পদচূর্ণ করে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৭ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছে। মায়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে (১৪ লাখ) বাংলাদেশে মানবিক দৃষ্টিকোণে থেকে আশ্রয় প্রদান করেছে। বিশ্ববাসী এ কারণে শেখ হাসিনাকে মাদার অব হিউম্যানিটি হিসেবে অভিহিত করেছে।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে কাজ শুরু হয়। নিজস্ব অর্থায়নে চীনের কারিগরি সহযোগিতায় সেতুর নির্মাণ কাজ পূর্ণোদ্যমে এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও দ্বিতীয় মেঘনা গোমতী সেতু নির্মাণ, কাঁচপুর শীতলক্ষ্যা সেতু সম্প্রসারণ প্রভৃতি নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সমাপ্ত করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে গ্রামের মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে। কৃষিপণ্যে মূল্য সংযোজন হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে গ্রামীণ রাস্তাঘাটের উন্নতির মাধ্যমে বাংলাদেশের দারিদ্র্য ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

আত্মমর্যাদায় বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ নয় বরং বাংলাদেশ তৈরি করেছে সমৃদ্ধি ও বড় হবার মনমানসিকতা। সরকারি নীতির সহায়তায় বাংলাদেশে তরুণ উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে উঠেছে। সহায়ক ব্যবসা করার পরিবেশ বাংলাদেশ গড়ে তুলেছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ব্যতীত বাংলাদেশ সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করেছে, যেখানে মূলত বাংলাদেশের গ্রাম থেকে উঠে আসা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দক্ষ জনশক্তি কর্মে নিয়োজিত হচ্ছে এবং হবে।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিকভাবে সফলতা দেখিয়েছে। ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যা, পরবর্তী পর্যায়ে সাম্প্রতিককালের আইলা, মহাসেন, বুলবুল প্রভৃতি ঘূর্ণিঝড় পূর্ব ও পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম বাংলাদেশ সফলতা দেখিয়েছে। সরকারের ঘরে ফেরা কর্মসূচি দ্বারা শহরাঞ্চলের বস্তিতে বা নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাতকারী গ্রামের প্রান্তিক ও দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীতে গ্রামে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়নে ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুদ্র সঞ্চয় ধারণার মাধ্যমে গ্রামের দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর নিকট আমার বাড়ি আমার খামার তথা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ একটি দান অনুদান নির্ভর দেশ থেকে নিজের পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে। স্যানিটারি সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। মাতৃত্ব, শিশুমৃত্যু হ্রাসে বাংলাদেশ বিশ্বে সফল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। বিগত ১০ বছরে বাংলাদেশ মূল অর্থনৈতিক সামাজিক এবং মানব উন্নয়ন সূচিতে উল্লেখযোগ্য প্রগতি অর্জন করেছে। ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ব্যাপক ডিজিটালাইজেশন ঘটেছে। খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। গ্রামীণ পণ্যের বিপণনে ডিজিটালাইজেশন সুফল বয়ে এনেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান সরকার ২০১৯ থেকে করোনা ভাইরাসজনিত

গত ২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেডের প্রতিনিধি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নিম্নলিখিত কার্যক্রম হাতে নিয়েছে :

বাংলাদেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির ক্ষতি কাটাতে এ পর্যন্ত ১ লাখ ২৮ হাজার কোটি টাকার বেশি আর্থিক প্রণোদনার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে সরকার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৫ এপ্রিল ২০২০ করোনাভাইরাসের আর্থিক ক্ষতি কাটাতে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেন।[২] এর মধ্যে শিল্প ঋণের জন্য ৩০ হাজার কোটি টাকা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের ২০ হাজার কোটি টাকা, রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি নিম্ন আয়ের মানুষ ও কৃষকের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা, রপ্তানি উন্নয়ন ফান্ড ১২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, প্রিশিপমেন্ট ঋণ পাঁচ হাজার কোটি টাকা, গরিব মানুষের নগদ সহায়তা ৭৬১ কোটি টাকা, অতিরিক্ত ৫০ লাখ পরিবারকে দশ টাকা কেজিতে চাল দেওয়ার জন্য ৮৭৫ কোটি টাকা। এছাড়াও করোনাভাইরাস মোকাবিলায় স্বাস্থ্যখাতে বাজেটের অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর আগেও বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতি আনতে সরকারের তরফ থেকে প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়েছে। তবে কোভিড ১৯ সময়কালীনের মতো এত বড় আকারের প্রণোদনা প্যাকেজ এর আগে আর দেওয়া হয়নি।

মুজিব বর্ষে গৃহহীনদের গৃহ প্রদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিব বর্ষে গৃহহীনদের গৃহ প্রদানের অঙ্গীকার করেছেন। মুজিব বর্ষে ঘর পাচ্ছে ৯ লাখ পরিবার।[৩] প্রধানমন্ত্রী ২৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রথম ধাপে ৬৯ হাজার ৯০৪ জন গৃহহীনদের নিকট বাড়ি হস্তান্তর করেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর উপহার হিসেবে এ পর্যন্ত ১ লাখ ১৮ হাজার গৃহহীনদের মধ্যে বাড়ি হস্তান্তর করা হয়েছে। সারা দেশে ভূমি ও গৃহহীন ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২ পরিবারকে বাড়ি নির্মাণ করে দিচ্ছে সরকার। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষে' এটিই হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উপহার। ২০২০ সালের ৭ মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে দেশের একটি মানুষও গৃহহীন বা ভূমিহীন থাকবে না। তার এই মহান ব্রতকে সামনে রেখেই মুজিব বর্ষে প্রতিটি গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবারই পাচ্ছে দুর্যোগ সহনীয় আধাপাকা ঘর, আর দুই শতাংশ জমির মালিকানা। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দুই শতক জমির মালিকানাসহ সুদৃশ্য রঙিন টিনশেডের আধাপাকা বাড়ি পাবেন গৃহহীন ও ভূমিহীনরা। সারা দেশে গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণের এই মহাযজ্ঞ প্রতিনিয়ত মনিটরিং করছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিম্নলিখিত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছে :

আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গৃহীত একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। সমাজের আশ্রয়হীন, ভূমিহীনদের পুনর্বাসন, আত্মকর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে সচেতন ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই 'আশ্রয়ণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। বিগত ৩০ জুন ২০০২

সালে প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে আবাসন প্রকল্প নামে আরেকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে মে,২০০৯ সালে এর নাম পরিবর্তন করে 'আশ্রয়ণ প্রকল্প ফেইজ-২' নামকরণ করা হয়। ২০১৩ সালে 'আশ্রয়ণ-২' নামক আরো একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালু আছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭,২১৫টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৩টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৫৮,৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। বর্ণিত প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় জুলাই, ২০১০ জুন, ২০২২ (সংশোধিত) মেয়াদে ২.৫০ লক্ষ ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২,৯৩২.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৯২,৩৩৬টি পরবিার পুনর্বাসন করা হয়ছে। (তন্মধ্যে ৪৮,৩২৫টি ভূমিহীন পরিবার ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে, ভিক্ষুক পুনর্বাসনসহ 'নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ র্কমসূচির' আওতায় ১৪৩,৭৭৭টি পরিবারকে তাঁদের নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারের জন্য ২৩৪টি টং ঘর ও বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩টি ফেইজে মোট প্রায় ৪ লক্ষ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। সারা দেশে জুন ২০২০ পযর্ন্ত ১,৪৭০টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে, সদস্য সংখ্যা ১,৫৯,৬৮২ জন, শেয়ার মূলধন ১০৪.৭৯ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৫৪০.৪০ লক্ষ টাকা।

উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উদকনিক), বিআরডিবি, রংপুর এর আওতায় ১০ তলা বিশিষ্ট ডিসপ্লে-কাম-সেল্স সেন্টার ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

গৃহায়ন তহবিল[৫]

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-'৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তহবিল থেকে গৃহ প্রতি ৭০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত এনজিওসমূহকে ১.৫ শতাংশ সরল সুদে এবং এনজিওগুলো সর্বোচ্চ ১০ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৫.৫ শতাংশ সরল সুদে উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান করে থাকে। ৬১৬টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪০৪টি উপজেলায় গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম[৬]

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১ এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা-সামাজিক নিরাপত্তাবিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

আমার বাড়ি আমার খামার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ আমার বাড়ি আমার খামার (পূর্ব নাম একটি বাড়ি একটি খামার) প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিল জুলাই, ২০০৯ মাসে। দীর্ঘ এক যুগ পরে এটি আগামী ৩০ জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। এর বহু পূর্বে ২০০০ সালে দেশের পল্লী এলাকার প্রতিটি বাড়িকে উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলতে পাইলটিং আকারে শুরু হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন হলো পল্লী এলাকার প্রতিটি বাড়িকে উৎপাদনমুখী খামারে পরিণত করতে হবে। তাঁর অভিপ্রায় বাস্তবায়নে দেশের ৪৮২টি উপজেলার প্রতিটিতে ২০টি গ্রাম সংগঠন তৈরি করে ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। প্রতিটি বাড়িকে খামারে পরিণত করে কৃষিজ উৎপাদনের এক একটি ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়। সময়ের পরিসরে প্রকল্পটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে এখন বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রাম সংগঠনের আওতায় প্রায় ৫৭ লক্ষ দরিদ্র পরিবার এখন এ প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করছে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে।

২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তাঁর যুগান্তকারী ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন প্রদান করেন। এ দর্শন ধারণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশলে আমূল পরিবর্তন আনা হয়। দরিদ্র মানুষকে সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহিত করতে সরকার হতে সমপরিমাণ উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদান প্রদান করে প্রতিটি গ্রাম সংগঠনের জন্য স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন দরিদ্র মানুষের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। তাই প্রকল্প মেয়াদ ও পরিসর বারবার বৃদ্ধি করতে হয়েছে। দরিদ্র সদস্যগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে এ পর্যন্ত সঞ্চয় করেছেন ২ হাজার কোটি টাকার বেশি। সরকারি অনুদান সহায়তায় এখন প্রতিটি গ্রাম সংগঠনের জন্য ৭ থেকে ৯ লক্ষ টাকার স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। সর্বমোট ৭ হাজার ৮ শত কোটি টাকার তহবিল সৃষ্টি হয়েছে, যা দরিদ্র সদস্যগণ স্থায়ীভাবে নিজ বাড়িতে খামার স্থাপনে ব্যবহার করছেন। সদস্যরা উঠান বৈঠকে বসে নিজেরা সমিতির তহবিল হতে ঋণ গ্রহণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণের বিপরীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র অর্থায়নে একটি বিকল্প মডেল হিসেবে রহমানের হয়েছে। এ মডেল এখন দেশে বিদেশে ব্যাপক প্রশংসা পাচ্ছে। আফ্রিকার দেশ কঙ্গো প্রজাতন্ত্র এ মডেল সে দেশে বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজ

এ প্রকল্পের অন্যতম সফলতা হলো এর অনলাইন ডাটাবেজ। ১.২০ লক্ষ গ্রাম

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) আয়োজিত বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের (২০২০-'২১) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বার্ডের সাম্প্রতিক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করছেন প্রধান অতিথি জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; আ.ক.ম. বাহাউদ্দিন বাহার, জাতীয় সংসদ সদস্য, কুমিল্লা-৮; জনাব মোঃ রেজাউল আহসান, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; সিরডাপের মহাপরিচালক ড. চার্ডস্যাক ভিরাপাত এবং বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

সংগঠনের প্রায় ৫৭ লক্ষ সদস্যের সকল তথ্য এ অনলাইন ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলে গ্রাম সংগঠনের জন্য তহবিল গঠন, এ তহবিল হতে বিনিয়োগ, অর্থ লেনদেন ইত্যাদি সকল সংক্রান্ত তথ্যাদি এ ডাটাবেজে সংরক্ষিত হচ্ছে। সরকারের এরূপ প্রকল্পে এ ধরনের অনলাইন ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ এ প্রকল্পেই প্রথম শুরু হয়েছে। দেশের যেকোনো ব্যক্তি এ ডাটাবেজ হতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এটি অর্থ লেনদেনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

গ্রাম সংগঠনের স্থায়ী তহবিল

প্রকল্পের অন্যতম বিশেষত্ব হলো গ্রাম সংগঠনের জন্য স্থায়ী তহবিল গঠন। যা দেশে প্রথমবারের মতো এ প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শন অনুসরণে দরিদ্র সদস্যদের অংশগ্রহণে সরকারি সহায়তায় স্থায়ী তহবিল তৈরি হয়েছে যা সংগঠনের সদস্যগণ স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারবেন।

অনলাইন এজেন্ট ব্যাংকিং ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ সদস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা, উহার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান বিতরণ, গ্রাম সংগঠনসমূহকে ঘূর্ণায়মান তহবিল বিতরণ, গড়ে ওঠা তহবিল হতে ঋণ প্রদান ও ঋণের কিস্তি জমা ইত্যাদি আর্থিক কর্মকাণ্ড প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়্যার ও ৩টি বেসরকারি ব্যাংকের কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যারের সাথে ইন্টারফেসিং করে ২০১২ সালে একটি বিশেষ ব্যাংকিং সেবার উদ্ভাবন করা হয় এ প্রকল্পে। যা পরবর্তীতে দেশে এজেন্ট ব্যাংকিং হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এ বিশেষ ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আর্থিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব

সরকারের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থ বছরে পরিচালিত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় দেখা যায় প্রকল্পে যোগদানের পরে সদস্যদের আয় গড়ে ৫১.৫৭% বৃদ্ধি পেয়েছে, ৯০.৮০% সদস্যের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব হলো উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, পারিবারিক দারিদ্র্য হ্রাস এবং বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিতায়ন।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

প্রকল্পের কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ তথা টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। দেশে এই প্রথমবারের মতো কোনো প্রকল্প ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে। এ ব্যাংকের ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার এবং বাকি ৪৯% শেয়ারের মালিক আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের গ্রাম সংগঠনগুলো। অর্থাৎ এটি দরিদ্র মানুষের মালিকানার প্রথম ব্যাংক। প্রকল্পের কাজকে ব্যাংক আরো সামনে অগ্রসরে নিয়ে যাবে। দরিদ্র সদস্যদের সুবিধাজনক আর্থিক সেবা প্রদান করে আস্তে আস্তে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলবে। টেকসই দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিত করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ অব্যাহত থাকবে ব্যাংকের মাধ্যমে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)- ৩য় পর্যায়

দেশের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০,০৩৫টি সমিতি গঠনের মাধ্যমে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৩.৫ লক্ষ লোকের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি বা সিভিডিপি প্রকল্প, সমবায় অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড বা বিআরডিবি বাংলাদেশ,

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা; পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবাদের ৩০ দিনব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষিত তরুণরা স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। কেউ কেউ চাকরিতে নিয়োজিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি উদ্যোগ- এ উদ্যোগসমূহ অত্যন্ত ভিশনারি, বহু আকাঙ্ক্ষিত ও বাস্তবানুগ যা দেশে বিদেশে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ-

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ[১০]

	বিশেষ উদ্যোগ	অন্যতম উদ্দেশ্য
১	**আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প** (এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক)	• দরিদ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তি। • স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার। • দরিদ্র পরিবারের পুঁজি গঠনে সহায়তা। • প্রয়োজনের নিরিখে জীবিকায়ন। • তথ্যপ্রযুক্তির সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্তকরণ। • সকল বাড়ি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু এবং এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান। • উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব। • মাইক্রো-ক্রেডিটের ফাঁদ থেকে মুক্তি।
২	**আশ্রয়ণ প্রকল্প** আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার	• প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত আশ্রয়হীন মানুষের পুনর্বাসন। • ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন • আশ্রয়হীন মানুষের ভূমিসহ আবাসন এবং দারিদ্র্য বিমোচন। • বিপন্ন মানুষকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা। • ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা। • আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।
৩	**ডিজিটাল বাংলাদেশ** শেখ হাসিনার উদ্যোগ ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল সবাই করছে ভোগ	• এটুআই প্রোগ্রাম, ই-প্রশাসন এবং ভোগান্তিহীন, দুর্নীতিমুক্ত এবং স্বচ্ছতার সাথে স্বল্প সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা। • অনলাইন ব্যাংকিং সেবা, মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা, সরকারি তথ্য সেবা, ডিজিটাল কনটেন্ট এবং শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার। • সামগ্রিক সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার শিল্পের বিকাশ। • আইটিআইএসভিত্তিক বিপিও-কেপিও শিল্পের প্রসার। • গ্রামীণ জনপদে আইটিইএস ব্যবসার প্রসার এবং স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরিকরণ এবং তাদের মাধ্যমে জনগণের নিকট বিভিন্ন সেবা পৌঁছে দেওয়া। • সচেতন এবং দক্ষ জনশক্তি - সর্বোপরি ডিজিটাল সিটিজেনশিপ।
৪	**শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি** শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ	• শতভাগ শিশুকে স্কুলে আনা। • মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই। • মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ। • মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি। • মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান। • পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ। • শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার এবং এ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নিশ্চিতকরণ।
৫	**নারীর ক্ষমতায়ন** সর্বক্ষেত্রে নারীর অর্থবহ অংশগ্রহণ	• সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ। • পারিবারিক সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি। • নারীর প্রতি বৈষম্য এবং সহিংসতা দূরীকরণ। • সামরিক বাহিনী এবং পুলিশের শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জিং বিভাগ, যেমন কমব্যাট সাপোর্ট ইউনিট, এসএসএফ কিংবা আর্মড পুলিশে নারীদের নিয়োগ। • নারীর সার্বিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্য আইন এবং বিধিবিধান প্রণয়ন।
৬	**ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ** শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ	• গ্রামীণ পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ। • নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ। • শিল্প এবং কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিদ্যুৎ। • গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সরবরাহ। • পরিবেশ রক্ষায় গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুতায়ন।

৭	**কমিউনিটি ক্লিনিক এবং শিশু বিকাশ (মানসিক স্বাস্থ্য)** শেখ হাসিনার উদ্যোগ, কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ	• গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ। • সকল জনগণের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা। • সন্তানসম্ভবা মায়েদের প্রসূতি সেবা। • প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ সেবা। • স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সেবা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ। • মা এবং শিশুর খাদ্য এবং পুষ্টি সহায়তা। • ছোঁয়াচে রোগবালাই থেকে দূরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করা। • সময়োপযোগী পরামর্শের মাধ্যমে প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণের উদ্যোগ।
৮	**সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি** অসহায় নাগরিকদের সুরক্ষা	• বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান। • বিধবা, তালাক-প্রাপ্ত নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান। • গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পুষ্টি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ। • আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে পিছিয়ে পরা মানুষদের মনোবল জোরদার করা। • বৃত্তিমূলক ও প্রয়োজনভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। • অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা। • ভূমিহীন এবং ছিন্নমূল পরিবারের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা।
৯	**বিনিয়োগ বিকাশ**	• ভারত, চীন, জাপান, কোরিয়ার জন্য পৃথক অর্থনৈতিক অঞ্চল সংরক্ষণ ঘোষণা। • ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। • ৩০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন। • রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি। •বিনিয়োগের স্বার্থে বিদ্যুৎ ঘাটতি দূরীকরণ, যোগাযোগ এবং নিরাপত্তা উন্নয়ন এবং সরকারি পেপার ওয়ার্ক সহজীকরণের জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস।
১০	**পরিবেশ সুরক্ষা (কর্মসূচি)** শেখ হাসিনার অবদান, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড	• টেকসই পরিবেশ এবং বন নিশ্চিতকরণ। • জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপখাওয়ানো। • দুর্যোগ মোকাবেলা। • বনায়ন এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ। • বনভূমির আকার সম্প্রসারণ। • স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সংরক্ষণ। • বিভিন্ন প্রকার দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ। • পরিবেশ সুরক্ষায় আইন এবং বিধিবিধান প্রণয়ন।

সূত্র : বাংলাদেশ বেতারে রংপুরের সুবর্ণজয়ন্তী (২০১৭) উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুভ্যেনির / ম্যাগাজিন থেকে সংগৃহীত।

উল্লিখিত ১০টি উদ্যোগ ও বর্তমান সরকারের গণমুখী নীতি বিশ্বে বহুল প্রশংসিত হয়েছে ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে যা বাংলাদেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত প্রেরণাময়। এ ছাড়াও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প তথ্য আপা গ্রাম গ্রামান্তরে সরকারের উন্নয়ন তথ্য গ্রামের নারীসহ সকলের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে। উক্ত ১০টি উদ্যোগের পাশাপাশি যে সকল মেগা প্রকল্প বর্তমান সরকার প্রায় সম্পন্ন বা প্রায় সম্পন্ন করেছে তা নিম্নরূপ :

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সফলতার সাথে স্থাপন
- পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ
- পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ
- মেট্রো রেল স্থাপন
- কর্ণফুলি নদীর তলদেশে যাতায়াত টানেল নির্মাণ
- ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন
- কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রভৃতি

উন্নয়নের রূপকার, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, মানবিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বই উৎসব আমাদেরকে আকৃষ্ট করে। অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিনির্মাণে, জাতীয় নিরাপত্তা বিধানে কূটনৈতিক প্রয়াসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের উন্নয়নে ও কর্মসংস্থান সৃজনে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রসারে এসএমই ব্যাপক অবদান রেখে যাচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্পায়নে এ খাতের অবদান ১০ শতাংশেরও বেশি। সমৃদ্ধির পথে পরিবর্তিত বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন নতুন রূপ নিয়েছে। অপার সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। গ্রাম-শহরের সংযোগ বেড়েছে। গ্রামে শিল্পপণ্যের প্রসার ঘটছে। পল্লী উন্নয়নের সাথে ক্ষুদ্র, মাঝারি, কুটির, লোকজ, হস্তশিল্প প্রভৃতি নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে বাংলাদেশের পুষ্টিমান উন্নীত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য - এর উন্নয়ন ঘটেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রসারিত হয়েছে।

দেশের মানুষের জীবন প্রত্যাশা বেড়েছে। বাংলাদেশের গড় আয়ু ৭২.৬ বছরে উন্নীত হয়েছে (২০২১)। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে ২য় সাবমেরিন কেবল স্থাপিত হয়েছে। যশোরে সফটওয়্যার পার্ক স্থাপিত হয়েছে। বিশ্ব সক্ষমতায় বাংলাদেশ ছয় ধাপ এগিয়ে ৯৯তম স্থান অর্জন করেছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে বাংলাদেশ বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো উন্নয়ন করছে এবং ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করেছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ ১৯৭১ ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জামদানির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, ইউনেস্কো কর্তৃক শীতল পাটির বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি বর্তমান সরকারের উদ্যোগের ফসল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিকভাবে অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছে গ্লোবাল ওমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড। সাফল্যের সাথে শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১০ সালে তিনি জাতিসংঘ এমডিজি অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। জাতিসংঘ চ্যাম্পিয়নস অব দ্যা আর্থ অ্যাওয়ার্ড ২০১৪ সালে গ্রহণ

করেন। তিনি ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন।

বাংলাদেশ বিগত এমডিজির অনেকগুলো লক্ষ্য পূরণ করেছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্যের হার বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে ১২ শতাংশ কমিয়ে আনা হয়েছে। প্রায় ৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্য সীমারেখা অতিক্রম করেছে। সাক্ষরতার হার ৭৪.৭% দাঁড়িয়েছে (২০২১)।

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও রূপান্তর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যাদের অধিকাংশ নারী, কিষাণি, ক্ষুদ্র কৃষক, উদ্যোক্তা তাঁদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বেড়েছে। জীবনযাপনের উপায় ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। মানুষের গড় আয় ও মানব উন্নয় প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামসমূহ এক ইতিবাচক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

অর্থনৈতিক উন্নতি : বিশ্ব অবাক তাকিয়ে রয়

জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন ও সহযোগিতাপুষ্ট শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশকে অদম্য গতিতে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিতে দুঃসাহসী ও উদ্ভাবনী সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এর অনিবার্য ফল জাতি ভোগ করছে। বিগত বছরগুলো যাবৎ ক্রমবর্ধমান হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮.১৫%। বিগত কয়েক বছরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার অবিশ্বাস্য। ২০০৮ সালের তুলনায় মাথাপিছু আয় প্রায় তিনগুণ বেড়ে ২০২১ সালে মে মাসে এসে ২,২২৭ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয়ে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বিগত দশ বছরে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের জিডিপি'র আকার চারগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ লাখ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এইচবিএসসি'র প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বিশ্বের ২৬তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে। দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের কার্যক্রম প্রশংসনীয়। বর্তমানে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৫ শতাংশ। কেবল তাই নয়, ২০২১ সালে এসে অতি দারিদ্র্যের হার কমে হয়েছে ১০.৫%। এই সময়ের মধ্যে পাঁচকোটি মানুষকে নিম্নবিত্ত অবস্থা থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন

আর্থসামাজিক সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে আজকের বাংলাদেশ আমূল 'বদলে যাওয়া' এক দেশের নাম। এই বাংলাদেশ কেবল আর্থিক দিক দিয়েই শক্তিশালী নয়, মানসিকতার দিক দিয়েও যথেষ্ট বলীয়ান। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক ও জীবনমান উন্নয়নে বিগত বছরগুলোতে শেখ হাসিনার সরকার অধিক মনোযোগ প্রদান করেছে। বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা সম্প্রসারণ এবং এ সংক্রান্ত কর্মসূচিসমূহ আরও শক্তিশালীকরণে সরকার কাজ করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ৬.৫ মিলিয়ন বয়স্ক নারী-পুরুষ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়মিত ভাতা পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ মানুষ স্যানিটেশন এবং ৮৮ শতাংশ মানুষ সুপেয় পানির সুবিধা পাচ্ছেন। দেশের ৯৯ শতাংশ জনগণ এখন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। হতদরিদ্রদের বসতবাড়িতে ২.৫৮ লক্ষ সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। পল্লীর জীবন মান উন্নয়নে বিদুৎ দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'সবার জন্য বাসস্থান' যোগানোর প্রতিশ্রুতির আওতায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৩.৭৪ লক্ষ ভূমিহীন পরিবারকে জমি প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। কৃষিজমির অপচয় রোধ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন ধরনের আবাসন ব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান সরকার। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় নির্মাণাধীন 'পল্লী জনপদ' এমনই একটি উদ্যোগ। এর আওতায় প্রাথমিকভাবে আটটি বিভাগে একটি করে কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রতিটিতে ২৭২টি পরিবার বসবাস করতে পারবে।

সারাদেশে ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে যেখানে ৩০ রকমের ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে 'শেখ হাসিনা হেলথ কার্ডে'র প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২০ পর্যন্ত ৩৩১ কোটি ৪৭ লাখ পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ করেছে সরকার (দৈনিক ইত্তেফাক ২০২১)। ২০১৯ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার ১৮.৬ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে, ফলে শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরে জনগণের গড় আয়ুতে পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে। ২০২১ সালে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.৬ বছর। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে নিম্নআয়ের দেশ থেকে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে গর্ব করার মতো অবস্থান তৈরি হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়কালে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। এর স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউএন উইমেন 'প্লানেট ৫০ :৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড-২০১৬' প্রদান করে। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীশিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারের জন্য প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে ইউনেস্কোর 'পিস ট্রি' পুরস্কার পান এবং গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ডে-২০১৮ এ ভূষিত হন।

২০১৫ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন বিশ্বে ৬ষ্ঠ স্থানে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ। নারীদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা, তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯ এর মাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং নারীনির্যাতন প্রতিরোধ সেলের মাধ্যমে নির্যাতিতা, দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, ৪০টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রবর্তন করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষায়িত মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পাশাপাশি বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ নারীদের নিয়ে মোট প্রায় ৯০ হাজার সমবায় সমিতি ও পল্লী উন্নয়ন দল পরিচালনা করছে। এর আওতাধীন উপকারভোগী সদস্য সংখ্যা ২৭ লাখের বেশি।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশ

জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ কেবল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণই নয়, বরং রপ্তানিকারক দেশে উন্নীত হয়েছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান এখন দশম। ২০১৯ সালে দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি মেট্রিক টন। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য়। এক ও দুই ফসলি জমি অঞ্চল বিশেষে

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি লালমাই-ময়নামতি (আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের বার্ড অংশ) প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করছেন।

চার ফসলি জমিতে পরিণত করা হয়েছে এবং দেশে বর্তমানে ফসলের নিবিড়তা ১৯৪%। সরকার সার, ডিজেল, বিদ্যুৎ খাতে আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।

আইসিটি যুগে বাংলাদেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। শত বাধা-বিপত্তি মোকাবিলা করে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে ২০১৮ সালের ১১ মে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করে। বর্তমানে প্রায় শতভাগ বয়স্ক নাগরিক মোবাইল ফোন এবং ৫৩% মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এখন গ্রাহকরা মোবাইল ফোনেই বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসসহ বিভিন্ন ইউটিলিটি সেবার বিল প্রদান করতে পারেন। শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশে ফোরজি ইন্টারনেট চালু করেছে এবং ফাইভজি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) চালু করা হয়েছে। ১,১১০টি ইউনিয়ন পরিষদে এবং ৩৪০টি উপজেলা পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এ ডিজিটাল সেন্টারগুলো থেকে ৬ লক্ষ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভাতা বিতরণ করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনার সরকারের নিবিড় উদ্যোগে নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৫ হাজারেরও বেশি অফিসের তথ্য সংবলিত বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন এবং ৩৩৩ কলসেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে ১৮,৪৩৪টি সররকারি অফিসকে একীভূত পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। অসম্ভব মনে হলেও সত্য, বাংলাদেশ আইসিটি খাতে রপ্তানি শুরু করেছে। ২০২১ সালে আইসিটি খাতে রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে (প্রথম আলো)।

গ্রামীণ কর্মসৃজন

সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ করা হচ্ছে যেখানে কর্মসংস্থান হবে ১ কোটি লোকের। এসব অঞ্চল ঘিরে ২০৩০ সালের মধ্যে রীতিমতো শিল্পবিপ্লব ঘটবে বলে আশা করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় গ্রাম ও শহরের মধ্যে কর্মসংস্থান ও আয়বৈষম্য হ্রাস পাবে উল্লেখযোগ্যভাবে।

গত দশ বছরে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বেড়েছে আশাতীতভাবে। ২০১৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে জননেত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার অনুসারে প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজনের নিয়মিত রোজগার নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য হাসিল করতে বর্তমান সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

ডেলটা প্ল্যান

বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের মতো এগিয়ে নিতে গ্রহণ করা হয়েছে ১০০ বছরের 'ডেলটা প্ল্যান'। উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে একীভূত করে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ শীর্ষক মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ একটি জনকেন্দ্রিক, বহুমুখী এবং টেকনো-ইকনমিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। স্থানীয় ভূতাত্ত্বিক এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যা কি না দীর্ঘ ৮২ বছর মেয়াদি এই

নবনির্মিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), রংপুর এর নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

নবনির্মিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর, প্রশাসনিক ভবন।

পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

উপসংহার

একটি প্রগতিশীল আধুনিক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অতীতের পুঞ্জীভূত সমস্যা, চরম অব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বমন্দার পটভূমিতে আওয়ামী লীগ সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে যে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে তা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দৃশ্যমান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সকল ধরনের বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে একটি একীভূত, ন্যায়সংগত ও পক্ষপাতমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে।

এ বছরই আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি। ২০২০-'২১ সালকে 'মুজিব বর্ষ' ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিক্রমায় এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজ থেকেই বাংলাদেশ প্রগতির নতুন এক সোপানে পদযাত্রা শুরু করছে। আমরা বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে যত বাধাই আসুক, যতই দুর্যোগ দুর্বিপাক আমাদেরকে আঘাত করুক, বাংলাদেশের অসীম সাহসী মানুষ অতীতের সকল সময়ের ন্যায় বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথেই থাকবে।

সূত্র

১. নিতাই চন্দ্র রায়, কৃষিঋণ করুণা নয়, কৃষকের বেঁচে থাকার অধিকার, বনিক বার্তা, ২০ জুন, ২০২০।
২. তথ্য উৎস : সায়েদুল ইসলাম, করোনা ভাইরাস : আর্থিক প্রণোদনা কী? কারা, কেন, কীভাবে পাবেন এই প্রণোদনা? বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ১৭ জুন ২০২০
৩. মেহেদী হাসান, মুজিব বর্ষে ঘর পাচ্ছে ৯ লাখ পরিবার, প্রধানমন্ত্রী শনিবার প্রথম ধাপে ৬৯ হাজার ৯০৪ জনের কাছে বাড়ি হস্তান্তর করবেন। দৈনিক ইত্তেফাক, ২১.১.২০২১।
৪. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
৫. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
৬. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
৮. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।
৯. বাসস পরিবেশিত সংবাদ, কালের কণ্ঠ অনলাইন থেকে সংগৃহীত, উন্নয়ন সোপানে বাংলাদেশ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগ, ২ অক্টোবর, ২০১৮
১০. বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ বেতার রংপুরের বিশেষ প্রচারণা - শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ।
১১. টিএইচএম জাহাঙ্গীর সম্পাদিত 'দেশরত্ন শেখ হাসিনা' বাংলা টাইমস প্রকাশিত ২০১৭
১২. আহমেদ আমিনুল ইসলাম রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা (জন্মস্মারক ৭০), ভাষাচিত্র, ২০১৬

- **ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান**, পরিচালক, বার্ড, কোটবাড়ি, কুমিল্লা।
- **ফারুক জোয়ার্দ্দার**, পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বিআরডিটিআই, সিলেট
- **মোঃ দেলোয়ার হোসেন**, যুগ্ম-পরিচালক আরডিএ, বগুড়া।
- **মোঃ আসাদুজ্জামান**, উপ-পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।
- **মনিরুল ইসলাম**, সহকারী পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া।

বঙ্গবন্ধু ও পল্লী উন্নয়ন

মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য

১. উপক্রমণিকা

বাংলাদেশ রাষ্ট্রপরিচালনার ভিত্তি হচ্ছে এর সংবিধান যার নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'। যে মূল চেতনাসমূহকে ধারণ করে বাঙালি জাতি মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রাণ উৎসর্গ করেছেন সেগুলোই এই সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার ৪টি মূলনীতি হচ্ছে- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। জাতির পিতা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতিতে জাতিকে এ চারটি মূলনীতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ও রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রমগুলোর বাস্তবায়নে অনমনীয় ছিলেন। জাতির জনকের নেতৃত্বে যে জাতীয়তাবাদের চেতনায় বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এটি এক অখণ্ড জাতিসত্তা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। শোষণমুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজ গঠনের জন্য এবং বহুজনের সুখ ও কল্যাণ সাধনে সক্ষম একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজতন্ত্রের মূল চেতনাকে এ সংবিধানে ধারণ করা হয়েছে। সকলেই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করবে, মানবাধিকার ও মানবসত্তার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করবে এবং রাষ্ট্রীয় কাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতিফলন থাকবে- এটিই সংবিধানে গণতন্ত্রের চেতনা। বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এদেশকে স্বাধীন করেছে। এদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আবহমান কালের। স্বাধীন বাংলাদেশেও আপামর জনসাধারণ স্ব-স্ব ধর্মপালনের পাশাপাশি এ সংস্কৃতি লালন করবে। এটি বাংলাদেশের অমূল্য সামাজিক সম্পদ (Social Capital) যা রাষ্ট্র গঠনে ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে এক মহাশক্তি। আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাও তাই অন্যতম স্তম্ভ। জাতির পিতার পল্লী উন্নয়ন চিন্তা ও কর্মে সংবিধানের এ চার মূলনীতি নিঃসৃত চেতনাগুলো শতধারায় উৎসারিত। তাঁর সংগ্রামী জীবনের শুরু থেকেই শেষ অবধি

বাঙালি জাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে যা কিছুই তিনি ভেবেছেন ও করেছেন তার সবটুকুই এ চার মূলনীতির সঞ্জীবনী রসে জারিত। রাজনীতিতে তিনি যতই পরিপক্ক হয়েছেন ততই এই চেতনাগুলো তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছে। এ প্রবন্ধের মূল উপজীব্য বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ভাবনা ও কর্ম। সময়ানুক্রমিকভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত হলো। পাকিস্তানের জন্ম থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্ব পেরিয়ে ৭৫ অবধি বঙ্গবন্ধুর গ্রাম উন্নয়নের বিচিত্র ভাবনা ও কর্মপ্রবাহ একসূত্রে গ্রথিত করে এই নিবন্ধে বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হলো। এছাড়াও জাতির পিতার গ্রাম উন্নয়ন দর্শন ও কর্ম বর্তমান প্রেক্ষাপটে কতটুকু প্রাসঙ্গিক সে দিকেও আলোকপাত করা হলো।

২. বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ভাবনা ও কর্ম : পাকিস্তান অধ্যায়

২.১ স্বপ্নের পাকিস্তান- জন্মতেই দুঃস্বপ্নের কবলে

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে ভৌগোলিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। বাঙালি একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেল। এ ভৌগোলিক স্বাধীনতা হয়তো বা অনিবার্য হতো না যদি পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে বাঙালি মুসলমানদের যে প্রধান আকাঙ্ক্ষাটি ছিল সেটি পূরণ হতো। এ আকাঙ্ক্ষার নাম অর্থনৈতিক মুক্তি। পূর্ব বাংলার শতকরা ৯৫ জন লোকই গ্রামে বাস করত। তাঁদের অধিকাংশই ছিল কৃষক। পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাদের জোরালো সমর্থন ছিল, কারণ তাঁরা বহুযুগের শাসন-শোষণ থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল। চাষ করার জমি পাবে, নিষ্পেষণমূলক ঋণের জাল থেকে মুক্ত হবে, জমিদারের নির্যাতন থেকে বাঁচবে, ছেলেমেয়ে লেখাপড়া শিখবে, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে, কাজ পাবে- এগুলোই ছিল তাঁদের স্বপ্ন। কিন্তু অত্যাচারী ও প্রবঞ্চক স্বামীর সংসারে এসে নববধূর স্বপ্ন যেমন ভেঙে খান খান হয়ে যায়, সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রও অচিরে তাঁদের কাছে প্রবঞ্চক ও অত্যাচারীরূপে আবির্ভূত হলো। দেশ কার্যত উপনিবেশ থাকল, মালিকানার পরিবর্তন হলো মাত্র।

২.২ রাজনীতিতে জাতির পিতার অভিষেক : অভিষেকেই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে স্বপ্রণোদিত বঙ্গবন্ধু

বঙ্গবন্ধু কৃষি ও কৃষক অধ্যুষিত ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থেকে শৈশব ও কৈশোর পার করে এসেছেন। গ্রামের দুঃখ দারিদ্র্য তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। ১৯৪২-এ কলকাতাতে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হয়ে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৪৩ সালে তিনি প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সদস্য নির্বাচিত হন। ৪৩ ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়। এ বছর লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যাচ্ছিল। এর নাম ৪৩-এর মন্বন্তর। বঙ্গবন্ধু অভাবী অনাহারী লোকদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে গেলেন। বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগের ফলে সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব রাতারাতি সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট খুললেন। গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খুললেন। বঙ্গবন্ধু এই দুর্ভিক্ষের চাক্ষুষ বর্ণনা দিচ্ছেন এভাবে-

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মির্জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, একজন মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারতো। সেই বাংলাদেশের এই দুরবস্থা দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মায়ের দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে- 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম আর পারি না, কিছু ফেন দাও'- এই কথা বলতে বলতে ঐ দুয়ারের কাছে পড়ে মরে আছে।

এই দুঃসময়ে বঙ্গবন্ধু লেখাপড়া বাদ দিয়ে এই দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষগুলোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বহুমুখী কর্মকাণ্ড ও সংগঠন করেছিলেন। অট্টালিকায় থেকে নয়, দারিদ্র্যের পঙ্কের মধ্যে ডুবে ডুবে তিনি দরিদ্রদের উদ্ধার করতে চেয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে দারিদ্র্যকে চাক্ষুষ দেখেছেন বলেই তিনি এই কষ্টটা অন্তরে, শোণিতে ধারণ করেছেন। এই শোণিতেই তিনি বড় হয়েছেন। রিলিফের অর্থ সংগ্রহের জন্য এক পর্যায়ে তিনি কলকাতা থেকে গ্রামে এসে বিত্তবানদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছেন। সেই দুঃসময়েও তিনি জীবন গঠনের সঞ্জীবনী রস গ্রহণ করছেন তাঁর বাবার কাছ থেকে। বাবা বললেন- ''বাবা, রাজনীতি করবা আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ এ তো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না, লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না''। আর একটা কথা মনে রেখ, ''Sincerity of purpose, Honesty of purpose থাকলে জীবনে পরাজিত হবা না'' বঙ্গবন্ধু অতঃপর লিখলেন, ''এ কথা আমি কোন দিন ভুলি নাই''।

২.৩ বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধি : গরিব কৃষকেরা শোষিত, বৈষম্য পাহাড় সমান

১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন, অনতিক্রম্য সাহসিকতার সাথে সাধারণ মানুষের সাথে ক্ষমতার ও সমাজের শীর্ষ পর্যায়ের বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সাথে তাঁর তুলনাটি এখানে প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি- গান্ধী লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের শুরুতে ভারতের ভাইসরয় তথা বড়লাটকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি বৈষম্যের প্রসঙ্গ টেনে লিখেন-

আপনি আপনার বেতনের কথা ভাবুন। মাসিক ২১ হাজার ভারতীয় রুপি (প্রায় ৭ হাজার মার্কিন ডলার)। এর সাথে পরোক্ষভাবে আরো অনেক সংযোজন তো আছেই। আপনি প্রতিদিন ৭০০ রুপির বেশি অর্থাৎ প্রায় ২৩৩ ডলার বেতন আহরণ করছেন যেখানে গড়পড়তা একজন ভারতীয় লোক দৈনিক দু'আনারও কম পাচ্ছে। এর অর্থ হলো আপনি একাই ৫ হাজার ভারতীয় লোকের সম্মিলিত উপার্জনের চেয়েও বেশি বেতন আহরণ করছেন। আমি জানি হয়তো বা এত টাকা আপনার প্রয়োজন হয় না কিংবা সম্ভবত আপনার আয়ের পুরোটা আপনি চেরিটিতে দান করেন। কিন্তু এ ধরনের একটি ব্যবস্থা সহসা বন্ধ করা উচিত। আপনার বেতন থেকে ভারতবর্ষের পুরো প্রশাসনের একটি চিত্র উঠে আসে (Fisher, 1954)।

এবার বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে আসি। ১৯৫৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রাদেশিক গভর্নরদের বেতন প্রসঙ্গে সংসদে দাঁড়িয়ে ডেপুটি স্পিকারকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, 'মহোদয়,... এটাকে কি ইসলামি আদর্শ বলবো যখন আমরা গভর্নরদের ৬,০০০ টাকা করে বেতন দিচ্ছি আর দেশের গরিব লোকজন অনাহারে এবং ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে? মহোদয়, আমার দেশের লোকজনের মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই। তারা অন্ন পায় না, বস্ত্র পায় না এবং কখনো কখনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহের জন্য ইজ্জত খোয়াতে হয়। তাহলে বলুন, আমরা কাদের অর্থ ব্যয় করতে যাচ্ছি? এটা হচ্ছে দেশের গরিব চাষীদের অর্থ, পাট ও তুলা চাষীদের অর্থ এবং তা হচ্ছে করদাতা সাধারণ মানুষের অর্থ এবং ওই করের অর্থ থেকে আমরা গভর্ণরদের মাসে ৬,০০০ টাকা করে দিতে যাচ্ছি।'

২.৪ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা : কৃষকের স্বার্থের অনুকূল দাবিসমূহ বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ উদ্যোগের ফসল

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবি

মোটামুটি ৪টি শ্রেণির দাবিকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছিল: (১) কৃষক, (২) বুর্জোয়া তথা উদীয়মান স্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, (৩) শ্রমিক, (৪) মধ্যবিত্ত। ২১ দফায় কৃষকদের স্বার্থের বিষয়টি ৩টি দাবিতে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। এ দাবিগুলো অন্তর্ভুক্তিতে বঙ্গবন্ধু বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। দাবিগুলো হচ্ছে-

১। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি স্বত্বের উচ্ছেদ করা হবে। বাড়তি জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যুক্তিসংগত হারে খাজনার পরিমাণ নামিয়ে আনা হবে। সার্টিফিকেটযোগ্য খাজনা আদায়ের প্রথা (ঋণের দায়ে জমি নিলাম) উচ্ছেদ করা হবে (২নং দাবি)।

২। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ, পাট চাষিদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান ও ফটকাবাজি বন্ধ করা হবে (৩নং দাবি)।

৩। কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে (৪নং দাবি)।

বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন চিন্তা ও দর্শনের বিষয়টি বিবেচনায় নিলে ২১ দফাতে দুটি বিষয় খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠে: (১) তিনি কায়েমী ভূমিস্বার্থবাদী তথা সামন্তবাদী গোষ্ঠীর হাত থেকে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের বাঁচাতে ভূমি মালিকানায় পরিবর্তন আনতে চান, (২) ভূমির ব্যবহারে তিনি সমবায়ী কৃষির প্রবর্তন চান।

২.৫ কৃষক ও ভূমিহীনদের স্বার্থ রক্ষায় আপসহীন মুজিব, অপ্রতিরোধ্য তাঁর কণ্ঠ

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের সময়ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জমিদারদের উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের নীতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে বলেন-

পূর্ব বাংলায় ৩০ বছর আগে এক আন্দোলন হয় এটা ছিল কৃষক আন্দোলন। আমার নেতা মওলানা ভাসানী সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তখন জমিদার ছিল ৯০% হিন্দু। তবে হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক গরিব মানুষের শোষক ও শাসক হিসেবে তাঁদের পরিচয় একই। হিন্দু জমিদারগণ কলকাতা, রাজশাহী ও মধুপুরে ফূর্তি করছিলেন। মুসলমান জমিদারগণ দার্জিলিং ও শিলং-এ একই কাজ করছিলেন। উভয়ে গরিবদের শোষণ করছিলেন।

তিনি আরও বলেন-

স্যার, তাঁরা ইসলামের কথা বলেন। কোথায় মাওলানা আতাহার আলী- আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে চাই, যে ব্যবস্থায় একজনের মালিকানায় থাকবে ৫০ হাজার একর জমি... অন্যদিকে তাঁরই বাড়ির পাশে একজন ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে মারা যাবে তাকে কি ইসলামি গণতন্ত্র বলে? এটাই কি ইসলাম? দয়া করে ইসলামের অমর্যাদা করবেন না।

এভাবে সহজ, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি গ্রামের দারিদ্র্যপীড়িত কৃষকদের স্বার্থের কথা নির্ভয়ে বলেছেন। তিনি তাঁর রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত নয় নিম্নবিত্ত, হতদরিদ্র শ্রেণিকেই সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন।

এই শ্রেণিটা যে দারিদ্র্য বংশ বংশ ধরে বহন করে এসেছে সে দারিদ্র্যের উৎস অনুসন্ধানে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, ১৯৫০-এর দশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত হলেও বর্গাচাষিদের কোনো ভূমি অধিকার দেওয়া হয়নি, জমিদারি প্রথা উঠে গেলেও ভূমিহীনদের সংখ্যা অবিরাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, আমলা ও সেনা কর্মকর্তারা স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে শুরু করল। ১৭৫৭ সালের পর ভারত যেভাবে ব্রিটেনের উপনিবেশ হলো তেমনিভাবে ১৯৪৭-এর পর পূর্ব বঙ্গ পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ ও একচেটিয়া বাজার হলো, কৃষক ন্যায্যমূল্য পেলো না। উপনিবেশ হওয়া মানে সম্পদ কলোনি থেকে কলোনাইজারদের দেশে পাচার হওয়া ও পুঞ্জীভূত হওয়া। একটি হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭/৫৮ পর্যন্ত গড়ে প্রতিবছর ২০ কোটি টাকার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের কাঁচামাল পানির মূল্যে পশ্চিম পাকিস্তানে গেছে।

আইয়ুব খান তাঁর মৌলিক গণতন্ত্রের আমলে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন কর্মসূচি (V- AID) চালু করেছিলেন। এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। ৯ বছর অতিক্রান্ত না হতেই এ কর্মসূচির অপমৃত্যু হয়েছিল। সরকারের পল্লী উন্নয়নের বাগাড়ম্বর যে হৃদয়ের বার্তা নয় তা শেখ মুজিব ভালোভাবে জানতেন। তিনি ১৯৬৬ সালে ৬ দফা নিয়ে আসলেন। ৬ দফায় পল্লী উন্নয়নের বিষয়টি সরাসরি না আসলেও সমস্যার মূলে বঙ্গবন্ধু আঘাত করতে চাইলেন। ৫ নং দফায় বলা হলো দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি চলবে। বস্তুত এ দাবিটি পূরণ হলে কৃষি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারতো। ১৯৬৮ সালের ১১ দফা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দাবি হলেও সেখানেও ১৯৫৪-এর ২১ দফায় অন্তর্ভুক্ত কৃষকের স্বার্থ রক্ষার দাবি প্রতিধ্বনিত হলো। ১১ দফার ৬নং দাবিতে কৃষকের ভূমি রাজস্ব ও কর হ্রাসকরণ, বকেয়া কর মওকুফ, ঋণ মওকুফ, পাট ও আখের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের দাবি করা হলো।

৬ দফার পরেই আসল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার খরগ। ২৮ অক্টোবর ১৯৭০-এ মুক্ত হয়ে বেতার ভাষণে ভূমি রাজস্বের চাপে নিষ্পিষ্ট কৃষকের ঋণের ভার লাঘবের জন্য অবিলম্বে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা বিলোপ ও মওকুফের প্রস্তাব করলেন। ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা নির্ধারণ করে দিতে বললেন। তিনি আরও বললেন- নির্ধারিত সীমার বাইরের জমি এবং সরকারি খাস জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। অবিলম্বে চাষিদের বহুমুখী সমবায়ের মাধ্যমে ভূমি সংহতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

১৯৭০ সালে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তান আয়োজিত রাজনৈতিক সম্প্রচার শীর্ষক বক্তৃতামালায় বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা, শিল্পকারখানাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পাট ব্যবসার জাতীয়করণ, পাটের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, পাট গবেষণা এবং চা, তামাক, আলু ও তুলা-সহ অন্যান্য অর্থকরী ফসলের উৎপাদন ও মানোন্নয়নের ওপর জোর দেন। তিনি গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ওপর জোর দিয়েছিলেন। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে পিছিয়ে পড়া উত্তরবঙ্গের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের স্বপ্নও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের। ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও তিনি পুঁজিবাদী শোষণ কীভাবে দরিদ্র জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে সে দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

৩. বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ভাবনা ও কর্ম : বাংলাদেশ অধ্যায়

৩.১ বাংলাদেশের সংবিধানে পল্লী উন্নয়নের দিকনির্দেশনা

অনেক ভাবনা, অনেক স্বপ্ন নিয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২-এ স্বাধীন বাংলাদেশের মাটি স্পর্শ করলেন। সে বছরেই স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হলো। বঙ্গবন্ধু এতদিন গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য যে স্বপ্নগুলো লালন করেছেন সেগুলোকে সংবিধানে নিয়ে আসলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের ১০ম অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হলো: 'মানুষের ওপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে'। ১৩

নং অনুচ্ছেদে নির্দেশিত হলো : 'উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালিসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ' এবং এই উদ্দেশ্য পূরণে তিন প্রকারের মালিকানার স্বীকৃতি দেওয়া হলো যেখানে সমবায়ী মালিকানাও অন্তর্ভুক্ত হলো। ১৪ নং অনুচ্ছেদে লেখা হলো : রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে- কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা। ১৬ নং অনুচ্ছেদে লেখা হলো : নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হলো : জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

৩.২ স্বাধীন বাংলাদেশের ১ম বাজেট ও ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পল্লী উন্নয়ন

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেটেই কৃষি ও শিক্ষা খাত-কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হলো। ৩১৮ কোটি টাকার উন্নয়ন বাজেটের মধ্যে ১০৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলো কৃষি খাতে। ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি খাত সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার লাভ করলো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার কর্তৃক প্রথম যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হলো সেখানে বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক উদ্ভাবিত কয়েকটি মডেল বিশেষ করে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি), দ্বি-স্তর সমবায় ও পল্লী পূর্ত কর্মসূচির অব্যাহত প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেওয়া হলো ও এসব কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রস্তাব থাকলো। শুধু তাই নয়, বার্ডের সক্ষমতা ও ল্যাবরেটরি এরিয়া সম্প্রসারণ এবং বার্ডের সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২টি আঞ্চলিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (একটি দেশের উত্তরে) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও করা হলো। এতে বুঝা যায় বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন চিন্তায় বার্ড কর্তৃক সূচিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়োজনটি স্বীকৃত হয়। উল্লেখ্য, জাতির পিতা বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তার কথা জোরালো কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। কুমিল্লা পদ্ধতির পল্লী উন্নয়নের ভিত্তিও সমবায়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় বঙ্গবন্ধু ব্যাপকভিত্তিক 'বিশেষ গ্রাম প্রকল্প' পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সমবায় পদ্ধতিকে এ প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করে গ্রাম সমবায় সংগঠনের বিস্তৃত রূপরেখা প্রদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল, আনুমানিক দশ বছরের মধ্যে সারা গ্রাম বাংলায় বিশেষ গ্রাম সমবায় গড়ে উঠবে ও এর ফলে শ্রেণিবৈষম্য কর্মে গিয়ে দুস্থ ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত হবে। সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় নির্দেশ করা হয়েছিল।

৩.৩ কৃষি ও কৃষকের জন্য গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সমূহ

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতীয়করণের নীতি ঘোষণা উপলক্ষ্যে বেতার-টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমাদের সমাজে চাষিরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে।" সদ্য স্বাধীন দেশে ১৯৭৩ সালের মধ্যে হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো-লিফ্ট পাম্প, ২ হাজার ৯ শত গভীর নলকূপ ও ৩০ হাজার অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়; বিনামূল্যে জরুরি ভিত্তিতে এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্যে ধান বীজ, পাট বীজ সরবরাহ করা হয়; ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেওয়া হয়; তাঁদের বকেয়া ঋণ সুদসহ মওকুফ করে দেওয়া হয়। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে রহিত করা হয়; গরিব কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনা খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়। ভূমিসংস্কার ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য ও সাহসী পদক্ষেপ। পাকিস্তানি আমলে ৩৭৫ বিঘার স্থলে জমির সিলিং ১০০ বিঘা করা হয়। উদ্বৃত্ত জমি দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বণ্টনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই কৃষকদের মাঝে ১০ কোটি টাকার তাকাভী ঋণ ও পাঁচ কোটি টাকার সমবায় ঋণ বণ্টন করা হয়। ১ লক্ষ হালচাষের বলদ সরবরাহ করা হয় নামমাত্র মূল্যে; ৫০ হাজার দুগ্ধবতী গাভি সরবরাহ করা হয় ভর্তুকি মূল্যে। বেসরকারি মালিকানার কলকারখানা ও ব্যাংক-বিমা কোম্পানি জাতীয়করণ করা হয়। জাতির পিতার উদ্দেশ্য ছিল মুষ্টিমেয় ধনীদের হাত থেকে সম্পদ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া।

৩.৪ বঙ্গবন্ধুর ভাবনা ও কর্মে সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন

গ্রাম বাংলার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল সমবায়। সংবিধানের ১৩নং অনুচ্ছেদে নির্দেশিত সমবায়ী মালিকানার বাস্তবায়নে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। ১৯৭২ সালের ৩০ জুন তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে তাঁর সমবায় ভাবনা বিস্তারিত তুলে ধরেন :

"সমবায়ের মাধ্যমে গরিব কৃষকরা যৌথভাবে উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা লাভ করবে। অন্যদিকে অধিকতর উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষুদ্র চাষি গণতান্ত্রিক অংশ ও অধিকার পাবে। জোতদার ধনী চাষির শোষণ থেকে তারা মুক্তি লাভ করবে সমবায়ের সংহত শক্তির দ্বারা। একইভাবে কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি একজোট হয়ে পুঁজি এবং অন্যান্য উৎপাদনের মাধ্যম একত্র করতে পারেন তবে আর মধ্যবর্তী ধনিক ব্যবসায়ী-শিল্পপতির গোষ্ঠী তাদের শ্রমের ফসলকে লুট করে খেতে পারবে না। সমবায়ের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলায় গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র শিল্প যার মালিক হবে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষ।... আজ সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামে গ্রামে, থানায়, বন্দরে গড়ে তুলতে হবে মেহনতি মানুষের যৌথ মালিকানা। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে পাবে ন্যায্যমূল্য, শ্রমিকরা পাবে শ্রমের ফল ভোগের ন্যায্য অধিকার।

কিন্তু এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছতে হয় তবে অতীতের ঘুণে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে এক সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারি স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশে ঐ ধরনের ভুয়া সমবায় কোনোমতেই সহ্য করা হবে না। আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন। কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।...

আপনারা জানেন সমবায় সংস্থাগুলোকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি ঘোষণা করেছি যে, সংস্থার পরিচালনা-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর, কোনো আমলা বা মনোনীত ব্যক্তির ওপরে নয়। আমার সমবায়ী ভাইয়েরা এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করেছেন। এই গণতন্ত্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তাদের দায়িত্ব। তাদের দেখতে হবে যে সমবায় সংস্থাগুলো যেন সত্যিকারের জেলে, তাঁতি, কৃষকের সংস্থা হয়, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বা ধনী কৃষক যেন আবার এই সমিতিগুলোকে দখল করে অতীত দুর্নীতির পুনরাবৃত্তি না করে। যদি আবার সেই কোটারি স্বার্থ সমবায়ের পবিত্রতা নষ্ট করে, তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে আমরা সমস্ত পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল

করে দেব। আমার প্রিয় কৃষক মজুর জেলে তাঁতি ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন ও সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারি স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে। ...

বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে সোনার বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচে কানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লির কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে। ভাইয়েরা আমার- আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি। নব-সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।...''

উল্লেখ্য আজকের বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) বঙ্গবন্ধুরই অবদান। ১৯৭৩ সালে ''সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প'' গ্রহণের মাধ্যমে দেশের পাঁচটি এলাকায় কারখানা স্থাপন করা হয়। দুগ্ধসেবা সহজলভ্য করা ও দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নই ছিল বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ অতীতের ধারাবাহিকতায় দুই ধরনের সমবায় ব্যবস্থা লাভ করে : ১. সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে চিরায়ত সমবায়, ২. সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইডিপি)-এর অধীন দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়। বঙ্গবন্ধু বিদ্যমান দু ধরনের সমবায়কে কেন্দ্র করে বহুমুখী সহায়তা কার্যক্রম চালু করেন। এসব কার্যক্রম দেশব্যাপী সবুজ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে।

বঙ্গবন্ধুর গ্রাম-কেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনায় কৃষি ও দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি শিক্ষা অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় ছিল। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে একটি জনমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যুদ্ধ-বিপর্যস্ত দেশের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু শিক্ষার উন্নয়নের জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেন; পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ এবং ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করেন। এ ছাড়াও ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং একটি জনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা সুপারিশের জন্য দায়িত্ব গ্রহণের ৫ মাসের মধ্যেই ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিরক্ষরতামুক্ত গ্রাম গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল।

১৯৭৩ সালে বিজয় দিবসের আগের দিন জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে জাতির জনক বলেন-

''পাকিস্তানি শত্রু আত্মসমর্পণ করেছে, কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে আরেকটি শক্তিশালী শত্রু আর তা হচ্ছে অভাব, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, অশিক্ষা, বেকারত্ব, দুর্নীতি। কিন্তু এই যুদ্ধে জয় সহজ নয়। আমাদের এবারের সংগ্রাম অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। আমি যে সুখী সমৃদ্ধিশালী শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি ও দুঃখ নির্যাতন বরণ করেছি সেই বাংলাদেশ এখনও আমার স্বপ্নই রয়ে গেছে। গরিব কৃষক ও শ্রমিকের মুখে যত দিন না হাসি ফুটবে ততদিন আমার মনে শান্তি নাই। এই স্বাধীনতা আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে সেইদিন, যে দিন বাংলাদেশের কৃষক, মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।''

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ১ম বৈঠকে সমবায় প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি ধীরে চলো নীতিতে বিশ্বাসী। শুরুতে বড় ধরনের মুভমেন্ট প্রয়োজন নেই, ৭৫টি, ১০০টি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। এগুলো সফল হলে দেশের মানুষকে একতাবদ্ধ করা যাবে অর্থাৎ তিনি সমবায় কার্যক্রমকে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করতে আহবান জানান। জমি গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন- জমি কেড়ে নেওয়া হবে না, সকলের জমি একসঙ্গে চাষ করা হবে, ফসল ভাগ করে নেওয়া হবে, তবে আইন করা হয়েছে ১০০ বিঘার বেশি কেউ রাখতে পারবে না। একই বৈঠকে তিনি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্পর্কে বলেন, ''ইমপোর্ট করে এনে কোনো ইজম চলে না।... আমার মাটির সাথে, মানুষের সাথে, আমার কালচারের সাথে, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড-এর সাথে, আমার ইতিহাসের সাথে যুক্ত করেই আমার ইকনমিক সিস্টেম গড়তে হবে।... আমরা একটা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই।... বাট সিস্টেম ইজ আওয়ার্স। উই ডোনট লাইক টু ইমপোর্ট ইট ফ্রম এনিহোয়ার ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড।''

১৯৭৫ সালে ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণাকালে তিনি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেন ''যুবক ভাইয়েরা, আমি যে কো-অপারেটিভ করতে চাচ্ছি গ্রামে গ্রামে, তার ওপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে। আপনাদের ফুলপ্যান্টটা একটু হাফ প্যান্ট করতে হবে, পাজামা ছেড়ে লুঙ্গি পরতে হবে, আর গ্রামে গ্রামে গিয়ে এই কো-অপারেটিভকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য কাজ করে যেতে হবে''।

৩.৫ বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ও গ্রাম উন্নয়ন

১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু তাঁর ২য় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ''আমি এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানিদের। আমি আঘাত করতে চাই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে''। উল্লেখ্য, এই আঘাতটি দেওয়ার জন্যই তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে-গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ৫ বছরের প্ল্যান। এ বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই কো-অপারেটিভ-এ জমির মালিকের জমি থাকবে। বেকার অথচ কর্মক্ষম প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে কো-অপারেটিভ-এর সদস্য হতে হবে, এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের হাতে, ফার্টিলাইজার যাবে তাদের হাতে, টেস্ট রিলিফ যাবে তাদের হাতে। ওয়ার্কস প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিল থেকে টাউটদের বিদায় দেওয়া হবে, তা না হলে দেশকে বাঁচানো যাবে না। পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি নিয়ে কম্পালসরি কো-অপারেটিভ হবে।... আপনার জমির ফসল আপনি নেবেন, অংশ যাবে কো-অপারেটিভ-এর হাতে, অংশ যাবে গভর্নমেন্ট-এর হাতে।''

দ্বিতীয় বিপ্লব বাস্তবায়নের জন্য তিনি বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেছিলেন। এ বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল শোষণমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণ। জাতির পিতা এ বিপ্লবের মাধ্যমে তাঁর পল্লী উন্নয়ন ভাবনা ও দর্শনকে বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতে তিনি পল্লী উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরেন :

- প্রতিটি গ্রাম হবে সমবায়ী গ্রাম।
- প্রত্যেকটি গ্রামে বাধ্যতামূলক কো-অপারেটিভ হবে।
- এটি হবে মাল্টিপারপাস তথা বহুমুখী কো-অপারেটিভ।
- গ্রামের প্রতিটি লোক এই সমিতির সদস্য হবে।
- গ্রামের সকল জমি যৌথভাবে চাষ হবে।
- জমি জমির মালিকেরই থাকবে। উৎপাদিত ফসলের তিনটি ভাগ হবে। ১) মালিকের, ২) সমিতির, ৩) সরকারের।
- প্রতিটি গ্রামের জন্য গ্রাম তহবিল গঠন করা হবে। এ তহবিলের আয়ের দুটি উৎস থাকবে। যৌথ চাষের এক তৃতীয়াংশ গ্রাম তহবিলে জমা হবে (অভ্যন্তরীণ উৎস)। উন্নয়ন কার্যক্রমের সরকারি অর্থ

গ্রাম তহবিলে যাবে।

- স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম ও থানা তথা বর্তমান উপজেলা-এ দুটো স্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। গ্রামে থাকবে সমবায়, আর থানায় থাকবে থানা কাউন্সিল। এই থানা কাউন্সিলে থাকবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সরকারি কর্মচারী, রাজনৈতিক কর্মী, যুব প্রতিনিধি ও কৃষক প্রতিনিধি।

বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা ছিল পাঁচ বছরের মধ্যে ৬৫ হাজার গ্রামে কো-অপারেটিভ চালু করা। কর্মক্ষম প্রতিটি মানুষ এ সমিতির সদস্য হবে। পাঁচশ থেকে এক হাজার পরিবার নিয়ে সমিতি গঠিত হবে। বঙ্গবন্ধু অনুভব করেছিলেন, প্রতিবছর জনসংখ্যা বাড়ছে, অন্যদিকে চাষের জমি হ্রাস পাচ্ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় যৌথ চাষের কোনো বিকল্প নেই। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি মাল্টিপারপাস সমিতির মাধ্যমে তিনি গ্রামের সকল ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের প্রথম ধারা তথা 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' অংশে 'কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি ও অনগ্রসর জনগণের ওপর শোষণ অবসানের জন্য পূর্ণ অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শোষণমুক্ত ও সুসম সাম্যভিত্তিক এক সমাজ প্রতিষ্ঠাকরণ, সর্বাঙ্গীণ গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও যান্ত্রিকীকরণ ও সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ পদ্ধতির প্রচলন, কৃষি ও শিল্পের প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণে কৃষক-শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান, মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও অধিকতর কর্মসংস্থান, বিপ্লবোত্তর সমাজের প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গণমুখী সর্বজনীন সুলভ গঠনাত্মক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন, অন্ন বস্ত্র আশ্রয় স্বাস্থ্যরক্ষাসহ মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারণের মৌলিক সমস্যাবলির সুষ্ঠু সমাধান, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্ভর অর্থনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ' ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। বস্তুত জাতির পিতার স্বপ্ন-লালিত সোনার বাংলার ছবিটি এর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বঙ্গবন্ধু এমন একটি সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে কৃষক-শ্রমিকসহ জনগণের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হবে, সমবায়কে কেন্দ্র করে কৃষিব্যবস্থার সংস্কার ও যান্ত্রিক চাষাবাদ প্রচলনসহ সর্বাঙ্গীন গ্রামীণ উন্নয়নের প্রয়াস থাকবে এবং সকলের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে।

৪. জাতির পিতার স্বপ্নের গ্রাম ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'আমার গ্রাম আমার শহর'

জাতির পিতা সুখী-সমৃদ্ধ "সোনার বাংলা" বিনির্মাণে গ্রামকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন। কৃষি গ্রামীণ অর্থনীতির চালিকাশক্তি বিধায় পল্লী উন্নয়নে কৃষিকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু একই সাথে শহর ও গ্রামের ব্যবধান কমিয়ে আনার প্রয়োজনও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। আমাদের পবিত্র সংবিধান জাতির পিতার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাগুলোকে ধারণ করেছে। এ সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্য কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমূল পরিবর্তন সাধনের নির্দেশনা রয়েছে।

জাতির পিতার কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম প্রধান নির্বাচনি অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বিনির্মাণ। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে নাগরিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। এর মাধ্যমে সংবিধানে প্রতিশ্রুত নগর ও গ্রামাঞ্চলের ব্যবধানও কমে আসবে। 'আমার গ্রাম আমার শহর' বস্তুতপক্ষে জাতির পিতার সুখী-সমৃদ্ধ গ্রামেরই একটি প্রতিচ্ছবি। এ বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যে গ্রামের বিকাশে বঙ্গবন্ধু কৃষিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কৃষি বিপ্লবের জন্য তিনি সমবায়ী গ্রাম চালুর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গ্রাম সমবায়ের লক্ষ্য ছিল যৌথ চাষের মাধ্যমে গ্রামের ধনী-গরিব, ভূমির মালিক ও ভূমিহীন সকলকে সুবিধা দেওয়া। জাতির পিতা উপলব্ধি করেছিলেন যেখানে জমি এক ইঞ্চিও বাড়ছে না, অথচ জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, সেখানে যৌথ চাষের কোনো বিকল্প নেই। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সফল করতে হলে গ্রামের সকল জমি যৌথ চাষের আওতায় আনতে হবে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারও কৃষিকে লাভজনক করার জন্য কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) যৌথ চাষ চালুর উদ্যোগ নিয়েছে।

৫. উপসংহার : বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন দর্শন ও কর্ম থেকে শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর পুরো রাজনৈতিক জীবনে পল্লীর মানুষের জন্য তাঁর চিন্তাভাবনা, বক্তব্যসমূহ ও গৃহীত কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দুটি প্রয়োজনকে তিনি পল্লী উন্নয়নের জন্য একেবারে অপরিহার্য মনে করেছেন : (১) ভূমিসংস্কার, (২) সমবায়। তিনি যে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন তাতে সমবায়ের অতীতের অভিজ্ঞতা যেমন ছিল তেমনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনাও ছিল। অতীতের কোনো সমবায় মডেলকে তিনি পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। বঙ্গবন্ধুর সমবায় একটি বহুমুখী সমবায় যা অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণীত। কিন্তু তিনি কখনও কারো জমি ছিনিয়ে নিয়ে সমবায় করতে বলেননি। পুরো গ্রামকেই সমবায়ে রূপান্তরের কথা বলেছেন। অর্থাৎ গ্রামের সকল ধরনের সম্পদ একই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে। অবশ্য এর প্রশাসনিক অবকাঠামো বিস্তৃতভাবে বলার তিনি সুযোগ পাননি, যার কারণ আমরা সকলে অবগত আছি। ৭৫'-এর ১৫ আগস্ট তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁরই স্বপ্নপ্রসূত পল্লী উন্নয়নের এক উদ্ভাবনী কর্মযজ্ঞকেও থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন চাষ হবে যৌথভাবে সমবায় পদ্ধতিতে, ভাগ পাবে জমির মালিক, চাষি ও সরকার। এ সমবায়ের অধীনে একটি তহবিল থাকবে, সরকারি সাহায্য গ্রাম সমবায়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। এভাবে গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে তিনি সরকারের ধারণাকে গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন এভাবেই গ্রামের লোক প্রতারকদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। সমবায়-গ্রামের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু ভূমিসংস্কারের বিষয়টিও বিবেচনায় নিয়েছিলেন। এ লক্ষ্যে ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেছেন। জমির সিলিং ১০০ বিঘা পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছেন। অবশ্য তিনি বুঝেছিলেন বিদ্যমান বাস্তবতায় বড় ধরনের ভূমিসংস্কার আপাতত সম্ভব নয়। এজন্য তিনি একটি আপসমূলক ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। এটিই হচ্ছে বহুমুখী গ্রাম সমবায়। গ্রাম সমবায়কে বঙ্গবন্ধু তৃণমূলের সরকার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি ইউনিয়ন কাউন্সিল-এর চেয়েও সমবায় গ্রামকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় একটি প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গ্রামের সকল ধরনের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। সমাজতন্ত্রের শক্তিতে তাঁর যে বিশ্বাস তাকে তিনি সমবায়ের মাধ্যমে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি পশ্চিমা সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে হুবহু গ্রহণ না করে বাংলাদেশের উপযোগী করে চালু করার

উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ব্যাংক, কলকারখানা জাতীয়করণ, গ্রাম সমবায় প্রতিষ্ঠা ও বাকশাল গঠন শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর তিনটি বলিষ্ঠ প্রয়াস ছিল।

বঙ্গবন্ধুর সকল প্রয়াসের কেন্দ্রে ছিল সোনার বাংলা। ১৯৭২-এ বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছেন এভাবে- "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন"। গ্রামই ছিল তাঁর এ স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু। দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে ঘুণে ধরা সমাজকে তিনি জাগাতে চেয়েছিলেন। এর মাধ্যমে একটি 'নতুন সিস্টেম' প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। এই সিস্টেম পরিবর্তন যাদের জন্য তারা এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষ তথা সাধারণ জনগণ যাদের বেশিরভাগের ঠিকানা গ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের গ্রাম বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৬৫ ভাগ এখন তরুণ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। অর্থনীতির ভাষায় এ জনগোষ্ঠীকে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বলা হয়। এ অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে। তরুণ জনগোষ্ঠীকে এ বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য তথ্যপ্রযুক্তি গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। জমি কমে আসছে, লোক বাড়ছে। এ পরিস্থিতিতে যৌথ চাষের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। একই সাথে শহরের মতো গ্রামেও বিক্ষিপ্ত আবাসনের পরিবর্তে সংহত আবাসনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নাগরিক সুবিধা সরবরাহের প্রয়োজনে এ জাতীয় আবাসনের কোনো বিকল্প নেই। অথচ ভূমির মালিক ও গরিবদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং গ্রামের আবহমান চাষাবাদ ও আবাসন সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করে এজাতীয় কাজ করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। ফলে কৃষিজমির অব্যাহত সংকোচনজনিত সংকট মোকাবেলায় যৌথ চাষ ও সংহত আবাসন কীভাবে সম্ভব তা ভাবতে হবে।

গ্রামের নগরায়ণে সমবায় অনেকভাবেই সহায়ক হতে পারে, বিশেষ করে সমন্বিতভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদানের জন্য। জাতির পিতা তাঁর বহু রক্তক্ষরিত সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সমবায়ী গ্রাম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন ও বাস্তবায়নের রূপরেখা

বাংলার প্রাণ-প্রকৃতির মাঝে হাজার বছর বেঁচে থাকবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

দিয়েছিলেন। বর্তমান বাস্তবতায় এটি পুনরায় বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্নদাশংকর রায়-এর ভাষায় শেখ মুজিব 'ক্রান্তদর্শী পুরুষ, আপন ব্রতে নিবেদিত কর্মবীর'। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর ঊষালগ্নে স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

তথ্যসূত্র :

- আকবর, মো. শওকত (২০১৩)। বঙ্গবন্ধু : প্রজ্ঞা। সততা। দারিদ্র্য বিমোচন ভাবনা, ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী।
- আলম, মাহাবুবুল (২০১৩)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি ও জীবনধারা (১৯২০-১৯৭৫), ঢাকা : জনতা প্রকাশ।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১১)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- ইসলাম, নজরুল (২০১৭)। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম, ঢাকা : ইস্টার্ন একাডেমিক।
- খান, সলিমুল্লাহ (সম্পাদিত) (২০০৭)। বেহাত বিপ্লব ১৯৭১, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী ও এশীয় শিল্প ও সাংস্কৃতিক সভা।
- খান, হাসেম ও অন্যান্য (সম্পাদিত) (২০১১)। জাতির জনক তাঁর সারা জীবন, ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।
- পাটোয়ারী, ড. মমতাজউদ্দীন ও ইসলাম, জি এম তারিকুল (২০০৯)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-বহুমাত্রিক মূল্যায়ন, ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশ।
- চৌধুরী, কবীর (সম্পাদিত) (২০১০) বঙ্গবন্ধু : জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক, ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন।
- ফেরদৌস, হাসান (২০১৭)। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও বাংলাদেশের গ্রাম, প্রথম আলো, ২ আগস্ট।
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (২০১২)। বাংলা পিডিয়া।
- মাহমুদ, আনু (২০১৫)। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ঢাকা : ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স।
- রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
- রায়, শিবনারায়ণ (২০০৬)। মূঢ়তা থেকে মানবতন্ত্রে, কলকাতা : রেনেসাঁস।
- লিটন, কামরুজ্জামান (সম্পাদিত) (২০২০) বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত ভাষণ, ঢাকা : একাত্তর প্রকাশনী।
- সরকার, মোনায়েম (সম্পাদিত) (২০১৮) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমি।
- সাইয়িদ, অধ্যাপক আবু (২০১২)। সমাজ বদলে বঙ্গবন্ধুর ব্লু প্রিন্ট, ঢাকা : অনন্যা।
- হোসেন, মোঃ শাহাদাৎ (২০১০) বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অর্থনীতি, ঢাকা : চিত্রা প্রকাশনী।
- Fischer, Louis (1954). Gandhi: His Life and Message for the World, New York: New American Library

মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য : পরিচালক (গবেষণা), বার্ড, কুমিল্লা।

পল্লী উন্নয়ন :
একটি বহুমুখী আলোকপাত

ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা

পল্লী উন্নয়ন ও বর্তমান বিশ্ব আলোচনার ক্ষেত্রে ২০২০ ও ২০২১ সালের প্রেক্ষাপটটি গুরুত্বপূর্ণ। এক শতক পর বিশ্ব একটি মহামারির সময় পার করছে। এমতাবস্থায়, বৈশ্বিক সকল ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমনকি ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন কতটা সম্ভবপর হবে সে বিষয়েও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৯ সালে এসডিজি অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আয়োজিত জাতিসংঘের সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব হবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। কারণ, এসডিজি অর্জনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে কিছুটা শ্লথ গতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল (ইউএনডেসা, ২০২০)। সে কারণে উক্ত সম্মেলনে এসডিজি অর্জনের গতি ফিরিয়ে আনার জন্য পুনরায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। তার কয়েক মাসের মধ্যে কোভিড-১৯ মহামারি সকল হিসাব-নিকাশ, সকল অঙ্গীকারকে এবং কর্মযজ্ঞকে হঠাৎ করে থামিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উন্নয়ন কোন পথে এগুবে, বা পল্লী উন্নয়ন কোন পথে যাবে - এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

এই প্রশ্নটি পল্লী উন্নয়নের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। কারণ, সামগ্রিকভাবে বিশ্বে পল্লী অঞ্চল এমনিতেই শহারঞ্চলের চাইতে পিছিয়ে থাকা অঞ্চল। এই অঞ্চলের উন্নয়ন প্রেক্ষাপটটি কোভিড-১৯ এর কারণে কী পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তা জানার জন্য সকল দেশেরই বৃহদাকার গবেষণা পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। তবে সেই বিষয়ে আলোকপাতের পূর্বে কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী সময়টিতে পল্লী উন্নয়ন কোন পর্যায়ে ছিল তা আলোচনা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪৪.২৮% বা ৩ বিলিয়ন মানুষ

টেবিল-১ : এজেন্ডা ২০৩০ এর আলোকে পল্লী উন্নয়নের চ্যালঞ্জসমূহ

সামাজিক ও পরিবেশগত হুমকিসমূহ (Societal and Environmental Threats)	উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহ (Sectoral Approach)	পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (Synergic Effect)	উন্নয়ন ধারণা (Development Perspective)
দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা	গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন	জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন
দুর্ভিক্ষ এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কৃষি	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	খাদ্য নিরাপত্তা	টেকসই কৃষি
ভূমি অবক্ষয় এবং বন উজার	প্রাকৃতিক ভারসাম্য	জলবায়ু পরিবর্তন	পল্লী অঞ্চলের স্থিতিস্থাপকতা বা স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজমান থাকা
প্রয়োজনীয় ইউটিলিটির অভাব	বর্জ্য/বিশুদ্ধ পানি/ পয়ঃনিষ্কাশন/ জ্বালানি	পরিবেশ দূষণ	আবর্তনিক অর্থনীতি
অনুন্নত অঞ্চল	গ্রাম-শহরের মধ্যে বিভেদ	সুশাসন ও আঞ্চলিক সংহতি	বৈষম্য কমানো

গ্রামে বসবাস করে। গ্রামীণ এই জনসংখ্যার একটি বড় অংশ অতিদরিদ্র (যাদের আয় ১.৯০ মার্কিন ডলারের নিচে)। বিগত তিন দশকে বিশেষ করে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে বিশ্বে দরিদ্রতা কমে আসলেও জাতিসংঘের হিসাব মতে চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার পরিমাণ হলো ৬৮৯ মিলিয়ন বা ৬৮.৯ কোটি এবং এই জনগোষ্ঠীর শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ উন্নয়নশীল দেশসমূহের গ্রামাঞ্চলেই বাস করে। কোভিড-১৯ এর কারণে এই অতিদরিদ্র জনসংখ্যার সাথে আরো ৮৮ মিলিয়ন হতে ১১৫ মিলিয়ন দরিদ্রের সংখ্যা যুক্ত হবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে মোট ১৫০ মিলিয়ন হতে পারে। এই হিসাব মতে ২০২১ সালে বিশ্বে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হবে ৮৩৯ মিলিয়ন বা ৮৩.৯ কোটি। এই নতুন অতিদরিদ্র জনসংখ্যাকে বলা হচ্ছে 'নয়া বা নতুন দরিদ্র' জনগণ। এসব মানুষ গ্রাম হতে শহরে বা বিদেশে উপার্জনের জন্য চলে গিয়েছিল, কিন্তু মহামারির কারণে তারা চাকরি বা উপার্জনের উপায় হারিয়ে আবার গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। ফলে গ্রামের ওপর চাপ বাড়ছে। নতুনভাবে সৃষ্ট এই চ্যালেঞ্জ যুক্ত হচ্ছে গ্রামের উন্নয়ন সম্পর্কিত আদি ও অকৃত্রিম বিষয়গুলোর সাথে। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিবেদনে পল্লীর বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের পল্লী অঞ্চলের যে চিত্র পাওয়া যায় তা হলো :

১. গ্রাম বা পল্লী মানেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস।
২. পল্লীর মূল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হলো কৃষি।
৩. সামগ্রিক উন্নয়ন বিবেচনায় গ্রাম হলো শহরের চেয়ে অনেকগুণ পিছিয়ে থাকা অঞ্চল।
৪. গ্রামের মানুষ সমজাতীয় (Homogeneous) অর্থাৎ তাদের সংস্কৃতি, তাদের জীবনযাত্রার ধরন ও মান ইত্যাদি মোটামুটি একই হয়ে থাকে। সামাজিক পার্থক্য শহরের তুলনায় কম। মানুষের চাহিদাও কম।
৫. গ্রামগুলোর প্রকৃতির খুব নিকটবর্তী। গ্রামের মানুষ প্রকৃতির ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগকে তাদের প্রতিনিয়ত মোকবেলা করতে হয়।
৬. গ্রামের মানুষের সংস্কৃতি, চালচলন, ইত্যাদি সাদামাটা বা সহজ সরল হয়। তাদের জীবনের চাহিদা কম, সুযোগও কম ফলে গতিও কম।
৭. গ্রামে জনসংখ্যার হার ও ঘনত্ব শহরের তুলনায় কম। অনেক দেশে জনসংখ্যার হার বেশি হলেও গ্রামগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব কম থাকে।
৮. গ্রামে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কম।
৯. গ্রামে কর্ম বা শ্রম মোটামুটি একই। বেশিরভাগ মানুষ কৃষির সাথে জড়িত।
৯. কৃষিপ্রধান হলেও গ্রামের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নেই।
১০. পল্লী মানেই সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নেই বা কম। গভার্নেন্স সক্ষমতা এখানে তেমন গুরুত্ব পায় না। ইত্যাদি (ওইসিডি, ২০১৬; ইফাদ, ২০১৬)

তবে গ্রামের কয়েকটি শক্তিশালী বা দেশের উন্নয়নে সহায়ক দিক রয়েছে। মনে রাখতে হবে, পল্লী বা গ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই অঞ্চলই একটি দেশের খাদ্যের প্রধান যোগানদাতা। গ্রামই উন্নয়নশীল দেশগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা দেয়। গ্রামের আরেকটি দিক হলো গ্রামে বিশাল একটি তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং দেশের উন্নয়নে এই তরুণ জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। জাতিসংঘের ২০২০ সালের 'বিশ্ব যুব প্রতিবেদন' মতে বিশ্বে ১.২১ বিলিয়ন ১৫-২৪ বছর বয়সী তরুণ জনগোষ্ঠি রয়েছে যা বিশ্বের জনসংখ্যার ১৫.৫% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ১.২৯ বিলিয়ন। এই তরুণ জনগোষ্ঠীর ১ বিলিয়নই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বসবাস করে (এফএও, ২০২০)। বিশাল এই তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের পল্লী উন্নয়নে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের সুবিধা নিতে পারে। তারপরও যুগের পর যুগ ধরে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গ্রামগুলো অবহেলিত। গ্রামের মানুষ প্রযুক্তি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির পূর্ণ সুবিধাসহ), অর্থায়ন বা বিনিয়োগ সুবিধা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা বা জ্ঞান, উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং পণ্যের বাজার ব্যবস্থা বা বাজারজাতকরণ সহায়তা হতে বঞ্চিত। অন্যদিকে গ্রামগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির অনুশীলন, নগরায়ণ, অপরিকল্পিতভাবে ভূমির ব্যবহার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বনের ক্ষতি সাধন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এসব কার্যকলাপ কেবল পল্লী উন্নয়নকেই বাধাগ্রস্ত করছে না, এসব বিষয় প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে যা জলবায়ুর পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে এবং জীবনযাত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

পল্লীর এই অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশ এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের জন্য কাজ করছে। শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) এর ২০১৬ সালের প্রতিবেদন মতে পল্লী উন্নয়নে এসডিজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন উন্নয়নশীল দেশসমূহে পল্লী উন্নয়নের চাইতে নগরের উন্নয়নের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় (ওইসিডি, ২০১৬)। এভাবে উন্নয়নের

টেবিল-২ : দক্ষিণ এশিয়ার এমডিজি অর্জনের চিত্র

দেশ	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তির হার	জন্মের সময়ে গড় আয়ু	নবজাতকের মৃত্যুর হার (৫ বছরের নিচে) প্রতি ১০০০	মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি ১,০০,০০০ এ	পয়ঃনিষ্কাশন	বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির শতকরা হার	লিঙ্গ সমতা (সংসদে নারীর শতকরা হার)	দরিদ্রতার হার (১.২৫ $)
আফগানিস্তান	-	৬০.৪	৯৭.৩	৪০০	৩১.৯%	৫৫.৩%	২৭.৭%	২৬.৮%
বাংলাদেশ	৯৬.২	৭১.৬	৪১.১	১৭০	৬০.৬%	৮৬.৬%	২০.০০%	৪৩.২৫%
ভুটান	৯০.৭%	৬৯.৫	৩৬.২	১২০	৫০.৪	১০০	৮.৫%	-
ভারত	৯৮.৬%	৬৮.০	৫২.৭	১৯০	৩৯.৬%	৯৪.১%	১২%	২৩.৬৩%
মালদ্বীপ	৯৩.১%	৭৬.৮	৯.৯	৩১.০	৯৭.৯%	৯৮.৬%	৫.৯%	-
নেপাল	৯৮.৭%	৬৯.৬	৩৯.৭	১৯০	৪৫.৮%	৯১.৬%	২৯.৯%	২৩.৭৪%
পাকিস্তান	৭১.৯%	৬৬.২	৮৫.৫	১৭০	৬৩.৫%	৯১.৪%	২০.৭%	১২.৭৪%
শ্রীলংকা	৯৪.৩%	৭৪.৯	৯.৬	২৯	৯৫.১%	৯৫.৬%	৫.৮%	৪.১%

তথ্য সূত্র : জাতিসংঘ মেটা ডাটা ওয়েব সাইট

মেরুকরণের ফলে শহরে বস্তিগুলোতে গ্রাম থেকে আসা মানুষের চাপ বাড়ছে এবং শহরের উন্নয়নের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। পাশাপাশি গ্রামে রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি চাপ, পরিবেশেগত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন সমস্যা এবং দুর্বল শাসনব্যবস্থা বা গভার্নেন্স ইত্যাদি। মিহাই এবং লাটু (২০২০)[১] বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ পর্যালোচনা করে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের চারটি দিকের ওপর আলোকপাত করেছেন (টেবিল-১)।

এসব বিষয় হতে উত্তরণের জন্য পল্লী উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে এসডিজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে এসডিজি এবং পল্লী উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে। এজন্য জাতিসংঘের পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক অন্যতম সংস্থা[২] IFAD ২০১৬ সালে প্রকাশিত পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিবেদনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর এসিডিজি অর্জনে পল্লী উন্নয়নকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছে। উল্লেখ্য যে, এসডিজির মূল লক্ষ্য হলো 'কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন নয়' বৈশ্বিক এই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। কোভিড-১৯ মহামারি প্রমাণ করেছে পৃথিবীতে সবাই সবার সাথে সংযুক্ত। কাউকে বাদ দিয়ে উন্নয়নকে টেকসই করা যাবে না এবং সেক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি ২০০০-২০১৫) অর্জনের ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং সফলতাও এসেছে। যেমন দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ, শ্রীলংকা এবং নেপাল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বেশিরভাগ সূচক অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাইমারি স্কুলে অংশগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে লিঙ্গ সমতা, নবজাতক ও পাঁচ বছরের কমবয়সি শিশুর মৃত্যুর হার এবং টিকাদানে অন্তর্ভুক্তির পরিমাণ বৃদ্ধিতে এই তিন দেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে (আসাদুল্লাহ, সাভিও ও সেন, ২০২০)। এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অর্জনকে অনেকেই 'উন্নয়ন বিস্ময় (Development Surprise)' বলে অভিহিত করতে দ্বিধাবোধ করেন নাই (দেবরাজন, ২০০৫; মাহমুদ, ২০০৮; আসাদুল্লাহ, সেভিও ও মাহমুদ, ২০১৪)। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং লিংগ সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলংকা দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতাশালী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের চাইতেও এগিয়ে আছে। ভারত ও পাকিস্তান নবজাতক মৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যুর হার পূর্বে তুলনায় কমিয়ে আনলেও এই দুই দেশ বাংলাদেশ, নেপাল ও শ্রীলংকা হতে অনেক পিছিয়ে আছে। সামগ্রীকভাবে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা কয়েকটি সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অর্জন টেবিলে তুলে ধরা হলো।

২০২০ সালের জাতি সংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে (২০২০) দেখা যায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এখনো বিভিন্ন সূচকে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পিছিয়ে আছে। দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলো কেবলমাত্র সাব-সাহারা আফ্রিকার দেশগুলো থেকে এগিয়ে আছে (টেবিল-৩ দেখা যেতে পারে)। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন করতে হলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে খাত ভিত্তিক ব্যয় বৃদ্ধির প্রতি নজর দিতে হবে।

উপরে উল্লিখিত সামগ্রিক দিক বিবেচনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর পল্লী উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া বিকল্প নাই। বর্তমানে

১. Mihai, F.-C., & Iatu, C. (2020). Sustainable Rural Development under Agenda 2030. In M. J. Bastante- Ceca (Ed.), Sustainability Assessment at the 21st century (pp. 9-18). London: IntechOpen Limited. https://doi.org/10.5772/intechopen.90161

২. উল্লেখ্য যে পল্লী উন্নয়নরে জন্য জাতিসংঘের তিনটি সংস্থা Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund For Agricultural Development (IFAD) এবং World Foor Programme (WFP) এর সমন্বয়ে একটি নেটওয়ার্ক কাজ করছে। https://www.unsystem.org/content/united- nations- system-network- rural- development- and- food- security

৩. এটি ২০১৫ সালের হিসাব। তখন দারিদ্রতার মাপকাঠি ছিল সর্বনিম্ন আয় ১.২৫ মার্কিন ডলার।

সকল দেশই কোভিড মহামারি রোধ এবং দ্রুততার সাথে ২০২০ পূর্ববর্তী উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে ফিরে যাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করছে। এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য করণীয় নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। এমতাবস্থায়, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এ পল্লী উন্নয়নের সাথে জড়িত অভীষ্টগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

পল্লী উন্নয়ন ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০

আমরা জানি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট হলো ১৭টি গোল বা অভীষ্টের সমন্বয়ে গঠিত বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গীকারনামা। বিগত ২০১৫ সাল হতে সকল রাষ্ট্র ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য কাজ করছে। তবে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভীষ্ট-১, অভীষ্ট-২, অভীষ্ট - ৮ (লক্ষ্য ৮.২) কে অধিকতর সম্পৃক্ত গোল বা অভীষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবশ্য সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত Global Donor Platform for Rural Development সকল এসডিজিই পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বলে উল্লেখ করেছে। তাদের মতে, কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের সাথে এসডিজি ১৩ (জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ) সরাসরিভাবে জড়িত। অনুরূপভাবে, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন অন্যান্য এসডিজি অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেমন :

এসডিজি-১ সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান (বিশেষ করে দরিদ্রতা যখন পল্লী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সমস্যা)

এসডিজি-৫ জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন (কৃষি ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে)

এসডিজি-১০ অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

এসডিজি-১৫ স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষকতা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ।

উল্লিখিত প্রতিবেদনে ২০৩০ সালে এজডিজি অর্জনের জন্য পল্লী অঞ্চলের সামগ্রিক রূপান্তরের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং পল্লী উন্নয়নের গতানুগতিক তত্ত্ব বা ধারণার পরিবর্তে নতুন তত্ত্ব বা ধারণা প্রয়োগের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এই প্রবন্ধে পল্লী উন্নয়নের বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং বিশ্বব্যাপী পল্লী উন্নয়নের পরিবর্তিত ধারণা বা তত্ত্ব ও উদ্ভাবনী চিন্তার বিষয়গুলো নিয়ো আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আরেকটি বিষয় হলো বিশ্ব ইতোমধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ অতিক্রম করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সময় পার করছে। প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় পল্লী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে বলে মনে করা হয়। এই বিষয়ে ১৯৮০ এর দশকেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো দীর্ঘ চার দশকেও বেশিরভাগ দেশে পল্লী উন্নয়নে এই বিষয়টিকে কাজে লাগানো হয় নাই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, মেশিন লার্নিং, ইন্টারনেট অব থিংস, বায়োটেকনোলজির সঙ্গে অটোমেশন প্রযুক্তির সংমিশ্রণে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী চলছে তাকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (Fourth Industrial Revolution (4IR) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ধারণার প্রবর্তক ক্লাউস শোয়াবের মতে স্মার্টফোনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পরিবর্তন, ইন্টারনেট অব থিংস, যন্ত্রপাতি পরিচালনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, রোবোটিকস, জৈবপ্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো বিষয়গুলো চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সূচনা করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের গবেষকগণ মনে করেন যে দেশ পরিসংখ্যান এবং জ্ঞানের প্রবাহ বা নতুন নতুন জ্ঞানের সংযোজনে যত বেশি তৎপর হবে এবং উন্নয়নের কাজে লাগাবে সে দেশ তত দ্রুত উন্নতি করবে। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব যে কাজগুলো করতে শুরু করেছে তা হলো :

(১) নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান, হালনাগাদ প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যবহারিক জ্ঞান পৌঁছে দিয়ে বিভিন্ন স্তরের কৃষি পরিবারগুলোকে তাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। এই ক্ষেত্রে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সিভিল সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(২) রোবট এবং চালকবিহীন প্রযুক্তি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে,

(৩) ইন্টারনেট অব থিংস ওয়ারলেস এবং বৃহৎ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিগ ডাটা তৈরি করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে জ্ঞান নির্ভর অর্থনীতিতে পরেণত করতে পারে। ইন্টারনেট অব থিংস ব্যবহার করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা যায় এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায়,

(৪) থ্রি-ডি প্রিন্টার ব্যবহার করে বিভিন্ন দেশ ইতোমধ্যেই ফসলের চাষাবাদ এবং ফসল কাটার কাজে কৃষককে সহায়তা করছে।

তবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কাজে লাগানোর

টেবিল-২ : বিশ্ব মানব উন্নয়ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান

অঞ্চলসমূহ	মানব উন্নয়ন সূচক (ভেল্যু) (২০১৯)	মোট জাতীয় আয় (২০১১ পিপিপি ডলার)	জন্মের সময় গড় আয়ু (২০১৯)	প্রত্যাশিত শিক্ষা বছর (২০১৯)	জেন্ডার উন্নয়ন সূচক (ভেল্যু) (২০১৯)	জেন্ডার সমতা সূচক (ভেল্যু) (২০১৯)	দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার % (১.৯০ ডলার)
আরব দেশসমূহ	০.৭০৫	১৪,৮৬৯	৭২.১	১২.১	০.৮৫৬	০.৫১৮	৪.৯
পশ্চিম এশিয়া ও প্রশান্ত মাহসাগরীয় অঞ্চল	০.৭৪৭	১৪,৭১০	৭৫.৪	১৩.৬	০.৯৬১	০.৩২৪	১.৭
ইউরোপ ও মধ্য এশিয়া	০.৭৯১	১৭,৯৩৯	৭৪.৪	১৪.৭	০.৯৫৩	০.২৫৬	০.৮
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল	০.৭৬৬	১৪,৮১২	৭৫.৬	১৪.৬	০.৯৭৮	০.৩৮৯	৪.২
দক্ষিণ এশিয়া	০.৬৪১	৬,৫৩২	৬৯.৯	১১.৭	০.৮২৪	০.৫০৫	১৮.২
সাব-সাহারা আফ্রিকা	০.৫৪৭	৩,৬৮৬	৬১.৫	১০.১	০.৮২৪	০.৫৭০	৪৫.৭

তথ্য সূত্র : মানব উন্নয়ন সূচক প্রকাশনা, ২০২০, জাতিসংঘ।

জন্য দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিভিন্ন দেশ এজন্য তাদের শিক্ষা খাতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। যেমন আর্মেনিয়া প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificail Intelligent), প্রোগ্রামিং, কোডিং এবং ত্রি-ডি প্রিন্টারের ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষাদান করছে। সে দেশে ১০-১৫ বছর বয়সি ছেলে মেয়েরা তাদের এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সহায়তা করছে।

অর্থাৎ পল্লী উন্নয়নের বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন তত্ত্ব বা হাতিয়ার রয়েছে। এসব বিষয়কে কাজে লাগিয়ে সকল দেশই পল্লী উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে এবং দেশের উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করতে পারে। জাতিসংঘের পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক অন্যতম সংস্থা IFAD এই জন্য পল্লী উন্নয়ন কৌশলের কাঠামোগত রূপান্তর এর ওপর জোর দিয়েছে। সংস্থাটি পল্লী উন্নয়নের পাঁচটি ধাপ চিহ্নিত করেছে :

১. কৃষি উন্নয়ন

কৃষি উন্নয়ন বলতে কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকের জীবনমানের উন্নয়ন এবং তাদের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নকে বুঝায়। কৃষি উন্নয়ন কৃষি, পশুসম্পদ, বনজ এবং মৎস্য চাষের জন্য জমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে ওপর জোর দেয়। কৃষির উন্নয়ন তাই কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন পরিষেবা, প্রণোদনা, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ তথা জমির ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়নের বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।

২. পল্লী উন্নয়ন

পল্লী উন্নয়ন গ্রামের বা পল্লীর মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের পদ্ধতি বা ধারণা। পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তন করা হয়। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি নজর না দিয়ে, পল্লী উন্নয়ন কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি পল্লী উন্নয়ন মানবসম্পদ ও সামজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়। এজন্য পল্লী উন্নয়ন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সামাজিক সেবার উন্নয়ন বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনায় উৎসাহিত করে। অর্থাৎ পল্লী উন্নয়ন বহুমুখী উন্নয়নকে উৎসাহিত করে।

৩. গ্রামীণ রূপান্তর

গ্রামীণ রূপান্তর এর সাথে কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ এবং পণ্য উৎপাদনে বৈচিত্র্য এবং জীবন-জীবিকার বৈচিত্র্য আনয়ন বিষয়গুলো জড়িত। গ্রামীণ রূপান্তর অকৃষিজ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সহায়ক পরিবেশ তৈরি, পরিষেবা প্রাপ্তি সহজিকীকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, উন্নয়ন নীতি গ্রহণ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়। এর সবগুলোই গ্রামের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং সেই সাথে প্রাকৃতিক সম্পদকে টেকসই করে।

৪. অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রামীণ রূপান্তর

পল্লী উন্নয়নের অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তরের মাধ্যমে গ্রামের সকল মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তাদের সক্ষমতা বাড়াতে পারে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেও পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে পারে। এর ফলে ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমি দরিদ্র ও ভূমিহীন শ্রমিক, মহিলা ও যুবক, প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠী ও বর্ণ-গোষ্ঠী এবং দুর্যোগ ও সংঘাতের শিকার মানুষেরা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করতে পারে।

৫. কাঠামোগত রূপান্তর

কাঠামোগত রূপান্তরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সমস্যা, সমাধান এবং এর প্রভাব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই উন্নয়ন তত্ত্বে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নগর অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়া কৃষির আধিপত্য কমিয়ে শিল্প ও পরিষেবাভিত্তিক অর্থনীতিকে উৎসাহিত করে, গ্রামের অর্থনীতির সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততা ঘটায়, গ্রামীণ-নগর অভিবাসন হার কমায় এবং জনসংখ্যার নিম্ন হার নিশ্চিত করে। এই ধরনের রূপান্তরের জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাঠামোগত রূপান্তরকে টেকসই করতে হলে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত উন্নয়ন - সকল বিষয়গুলোর সম্মিলিত প্রয়াসের প্রয়োজন হয়।

এজন্য পল্লী উন্নয়ন দর্শনের আমূল পরিবর্তন (Paradigm Shift) প্রয়োজন রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD) ২০১৬ সালে একবিংশ শতকের পল্লী উন্নয়ন নিয়ে একটি প্রকাশনা করেছে। উক্ত প্রকাশনায় সংস্থাটি 'নিউ রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্যারাডাইম (এনআরডিপি)' এর কথা বলেছে। তবে তার আগে উন্নয়নশীল দেশের পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে দশটি শিক্ষণীয় দিক উপস্থাপন করেছে। যেমন :

১. প্রত্যেক দেশের পল্লী অঞ্চলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে

একটি দেশের পল্লী অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য আরেকটি দেশের পল্লী অঞ্চলের চাইতে ভিন্ন। সে কারণে পল্লী উন্নয়ন কৌশল দেশভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ পল্লী উন্নয়নের ইউনিভার্সাল বা সকল দেশের জন্য একই কৌশল -এমন কোনো বিষয় কার্যকর উন্নয়ন কৌশল বলে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। কারণ প্রত্যেক দেশের শাসন কাঠামো বা গভার্নেন্স, প্রতিষ্ঠান-নিয়মনীতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বাস্তবায়ন কৌশল, প্রাকৃতিক সম্পদ, সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই ভিন্ন। এসব বিষয়ের সাথে পল্লী উন্নয়নের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই পল্লী উন্নয়ন দেশভিত্তিক হলেই বেশি কার্যকর হবে।

২. গভার্নেন্স পল্লী উন্নয়নের সফলতা বা বিফলতার প্রধান একটি কারণ

এইক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের (দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম, চীন) কঠোর রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা গভার্নেন্স অধীনে সে দেশগুলোর সামগ্রিক উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়নের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক নয়া উদারতাবাদ তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা কমিয়ে মার্কেটের বা বাজারের ভূমিকার ওপর জোর দেয়। এসময় বিশ্বব্যাংক Structural Adjustment Policy (SAP) গ্রহণে উন্নয়নশীল বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ওপর শর্তারোপ করে। SAP এর অধীনে বিশ্বব্যাংকে সহায়তা প্রাপ্তির মূল শর্ত ছিল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কমাতে হবে। মার্কেটকে স্বাধীনভাবে কাজ করা সুযোগ দিতে হবে। ল্যাটিন আমেরিকা, সাব-সাহারা আফ্রিকা দেশগুলো এবং অন্যান্য অঞ্চলের কোনো কোনো দেশ SAP গ্রহণ করলেও, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো তা গ্রহণ করেনি। বরঞ্চ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের জোরালো ভূমিকার কারণে সেসব দেশ অনেক দ্রুততার সাথে উন্নতি লাভ করে। এ কারণে ১৯৯০ এর শেষের বছরগুলো থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের উন্নয়ন ভাবনায় পরিবর্তন আনে ও উন্নয়শীল দেশসমূহের উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে।

৩. জনকাঠামো বা ধরন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

পল্লী অঞ্চলের জনতাত্ত্বিক কাঠামো এবং ধারা পল্লী উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দক্ষিণ

পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর জোর দেয়। পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এসব দেশ পল্লী উন্নয়নে সফলতা পেয়েছে। অন্যদিকে সাব-সাহারা আফ্রিকা এই বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়নি বলে এই অঞ্চলের দেশগুলো উন্নয়ন সফলতা পায়নি।

৪. শহর ও পল্লীর মধ্যে সংযোগ স্থাপনকে গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করা উন্নয়ন কৌশল বা নীতি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে

শহর ও গ্রামের উন্নয়ন একই সূত্রে গাঁথা। একটিকে বাদ দিকে আরেকটির উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। যে সব দেশ এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের তাদের উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেছে সে সব দেশ তাদের উন্নয়কে ত্বরান্বিত করতে পেরেছে। কারণ শহর ও গ্রাম একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। শহর বা গ্রাম - যে অঞ্চলের উন্নয়ন হবে দেশের অভ্যন্তরীণ মাইগ্রেশন সেই অঞ্চলে হবে। ফলে, জনসংখ্যার চাপ বাড়তে থাকে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নয়নকে অস্থিতিশীল করে দেয়। দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম তাদের জাতীয় উন্নয়ন নীতিতে গ্রাম ও শহরের মধ্যকার এই যোগাযোগটিকে গুরুত্ব দিয়েছে যা তাদের উন্নয়নের জন্য সহায়ক ছিল।

৫. পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষির উন্নয়ন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ

উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৃষিই পল্লীর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কৃষি গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের মূল ক্ষেত্র। কৃষির সাথে জড়িয়ে আছে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্যের বিষয়টিও। উন্নয়নশীল দেশসমূহে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এসব দেশে কৃষি এখনও এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল দেশ সনাতন পদ্ধতিতে রয়ে গেছে। এখনও আধুনিকিতার ছোঁয়া পাচ্ছে না। উন্নত দেশগুলোর কৃষকগণ বর্তমানে 3D Printing কে ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করছে। সেখানে উন্নয়নশীল দেশের কৃষি এখনও পশু দিয়ে হাল চাষ করছে। উন্নয়নশীল দেশের কৃষি যুগের পর যুগ ধরে একই সমস্যা মোকাবেলা করছে। যেমন উন্নয়নশীল দেশে কৃষি হলো দরিদ্রদের কাজ তাই উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কৃষিকে পেশা হিসেবে নিতে চায় না। এসব দেশে কৃষকের জীবনের মূল্য কম, কৃষির উৎপাদন ব্যয় বেশি, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার ক্ষুদ্র বা মাঝারি কৃষকদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় না, জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব এবং বেশিরভাগ দেশে সরবরাহ চেইন (সাপ্লাই চেইন) কৃষক সহায়ক নয়। পল্লী উন্নয়নের জন্য এসব সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার, স্থানীয় সরকার, উন্নয়ন সংস্থা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করলে সাফল্য পাওয়া যায়।

৬. তবে, পল্লী বলতে কেবল কৃষির উন্নয়ন নয়

মনে রাখতে হবে পল্লীতে কৃষির বাইরেও অনেক বিষয় আছে। যেমন গ্রামীণ শিল্প বা অকৃষিজ শিল্পের সাথেও পল্লী অঞ্চলের মানুষ জড়িত। তাই পল্লী উন্নয়ন করতে হলে এসব বিষয়ের ওপরও জোর দিতে হবে। গ্রামের মানুষের জন্য নতুন নতুন আয়ের ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে আনার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রামে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে সরকার, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যৌথভাবে কাজ করে সফলতা পেতে পারে। যেমন থাইল্যান্ড দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চল এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক খাতসমূহের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে কৃষি-ব্যবসার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। ফলে গ্রামে নতুন নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। এইভাবে থাইল্যান্ড এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে গ্রামীণ কর্মসংস্থানে বৈচিত্র্য আনয়নকারী অন্যতম দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। ভিয়েতনাম গ্রামীণ ব্যবসায় বিনিয়োগকে সহজ করে দিয়ে গ্রামে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করেছে। ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড উভয় দেশই গ্রামে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য দুর্গম গ্রাম পর্যন্ত অবকাঠামোর উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ করেছে। কোনো কোনো দেশ বিশেষ অর্থনৈতিক জোন বা এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব অর্থনৈতিক জোনে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও, কৃষি সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কোনো কোনো দেশ বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য করিডোর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করেছে।

৭. অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো উন্নয়ন গ্রামীণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

উন্নয়নশীল দেশ হতে উন্নত দেশের পর্যায়ে যাওয়া দেশগুলোর উন্নয়ন ধারা পর্যালোচন করলে দেখা যায় এসব দেশ গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য কমানোর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন (রাস্তা, রেলপথ, নৌপথ, ব্রিজ, বিমানবন্দর নির্মাণ ইত্যাদি) করেছে। পাশাপাশি এসব দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক পুঁজি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বিনিয়োগ করেছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে পল্লী উন্নয়নের জন্য এসব বিষয়ে এশিয়ার দেশগুলো আফ্রিকার দেশগুলোর চেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে। এশিয়ার দেশগুলোর অনেক দ্রুততার সাথে উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এমতাবস্থায়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পল্লী উন্নয়নের জন্য সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করার ওপর জোর দিয়েছে।

৮. পল্লী উন্নয়নের জন্য জেন্ডার সমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

বিশ্বের অনেক দেশেই কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের অন্যান্য খাতে নারীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মতে উন্নয়নশীল দেশের কৃষি শ্রমিকদের ৪৩% নারী। নারীরাই খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবারের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিন্তু তাদের এসব ভূমিকাকে এখনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। নারীরা জমি, সার, সেচের জন্য পানি, বীজ, প্রযুক্তি, সরঞ্জাম, ঋণ সহায়তা, গবাদি পশু, সম্প্রসারণ পরিষেবা, আউটপুট মার্কেট এবং ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে বঞ্চিত। ১৯৬০ এর দশক হতে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ এবং উল্লিখিত বিষয়ে নারী সহায়ক করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। যেসব দেশ নারী সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য বিনিয়োগ করেছে সেসব দেশ উন্নয়ন দেখছে। কিন্তু উন্নয়নশীল বেশিরভাগ দেশে তেমন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। ফলে এসব দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে।

৯. গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য সামগ্রিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নীতি ও কৌশল গ্রহণ প্রয়োজন

গত কয়েক দশকের বিভিন্ন গবেষণা মতে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন করার ক্ষেত্রে গভার্নেন্স সক্ষমতা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে জনগণের সক্ষমতার উন্নয়ন এবং গ্রামের উন্নয়নে সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। এশিয়ার নতুন উন্নত দেশগুলো গ্রামের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনে রূপান্তর আনয়নের জন্য ব্যাপক হারে বিনিয়োগ করেছে। এরফলে এসব দেশ গ্রামে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্রতা কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে এসব দেশ Bottom up Approach গুরুত্ব দিয়েছে। এইজন্য সরকারের উন্নয়ন নীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারের উন্নয়ন নীতিগুলো যত বেশি সামগ্রিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিবে, যতবেশি শহর ও গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণ, বাজার ব্যবস্থাকে জনগণের উপকারমুখী করণ

এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিবে সেই দেশের উন্নয়ন তত বেশি দ্রুত হবে।

১০. পল্লী উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ একে অপরের পরিপূরক হতে হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও পরিবেশের উন্নয়ন পাশাপাশি চলবে। গত কয়েক দশক ধরে বেশ কয়েকটি দেশে দ্রুত, শিল্পায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ণের ফলে পরিবেশের ওপর ক্রমবর্ধমান হারে চাপ বাড়ছে। পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব মানুষের স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে অসহায় পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে। এর প্রভাব শহরের ওপরও পড়ছে। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়ের কারণে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হচ্ছে ফলে শহরের ওপর চাপ বাড়ছে। এজন্য পল্লী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে পরিবেশের উন্নয়নকেও গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে অতিরিক্ত সার ও ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহার করলে পরিবেশের ক্ষতি হয়। তাই সার বা কীটনাশক ব্যবহার না করে কীভাবে জৈব পদ্ধতিতে উৎপাদন বাড়ানো যায় তার জন্য গবেষণা ও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে প্যারাডাইম শিফট বা দর্শনগত পরিবর্তনের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এজন্য, ওইসিডিভুক্ত দেশসমূহ আটটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

১. গভার্নেন্স বা শাসন পরিচালনা

পল্লী উন্নয়নের জন্য গভার্নেন্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নীতি কৌশল বা প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা। আরো সঠিকভাবে বললে রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে 'গভার্নেন্স সক্ষমতা' যেকোনো দেশের উন্নয়ন এবং উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে গভার্নেন্স সক্ষমতা হলো : সমন্বয়সাধনের সক্ষমতা বিশেষ করে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন স্বার্থ বা চাহিদার একটি সামষ্টিক রূপ প্রদান এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতিকৌশল বাস্তবায়ন ও প্রচারের সক্ষমতা। বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গভার্নেন্স সক্ষমতা পল্লী উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কারণ, পল্লী উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর গভার্নেন্স সক্ষমতা নেই বললেই চলে। উন্নয়নশীল দেশের পল্লী উন্নয়নের জন্য এটি একটি বড় বাধা। এজন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গভার্নেন্স সক্ষমতার ওপর জোর দিতে হবে।

২. উন্নয়নের বহুমাত্রিকতার ওপর গুরুত্বারোপ

যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলোর পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তবু কেবল কৃষির ওপর গুরুত্ব দিলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে না, টেকসইও হবে না। তাই পল্লী উন্নয়ন নীতি করার সময় অকৃষিজ কাজ এবং কর্মসংস্থানের ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষকে তার পছন্দমতো কাজ খুঁজে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।

৩. অবকাঠামোর উন্নয়ন

গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য কমানো, জীবনযাত্রার ব্যয় কমানো এবং উন্নয়নের জন্য জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মানবিক (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) ও স্থায়ী (রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি) উভয় প্রকার অবকাঠামো উন্নয়ন সমভাবে করার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

৪. গ্রাম ও শহরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন

গ্রামের মানুষ তাদের শ্রমবাজার, উৎপাদিত পণ্যের বাজার, সেবা প্রাপ্তি, নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং সেই সাথে নতুন বিষয় বা ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য শহর বা শহরতলীর ওপর নির্ভরশীল। এজন্য পল্লী উন্নয়নকে এককভাবে দেখার সুযোগ নেই। বরঞ্চ পল্লী উন্নয়নকে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা দেশের উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত।

৫. অন্তর্ভুক্তিমূলক বা সামগ্রিকতা

পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দরিদ্রতা বিমোচন বা বৈষম্য দূরীকরণের ওপর গুরুত্ব দিলে হবে না। জনগণের পরিবর্তিত চাহিদাগুলো পূরণ করার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। গ্রামে ভিন্ন আয় (কৃষি, ব্যবসা, চাকরিজীবি), বিভিন্ন অবস্থা (উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-দরিদ্র, শিক্ষিত-অল্প শিক্ষিত-নিরক্ষর), বিভিন্ন বয়সের মানুষ বসবাস করে। পল্লী উন্নয়ন নীতি এবং কার্য-কৌশল নির্ধারণের সময় এসব বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে।

৬. জেন্ডার

পল্লীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে পল্লী উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। বিশেষ করে নারীর ভূমি ও সম্পদ প্রাপ্তি ও তা ভোগের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৭. জনসংখ্যার ধরন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হার এবং সেই সাথে বয়স্ক জনসংখ্যার হার- উন্নয়নশীল দেশগুলোর পল্লী উন্নয়নের জন্য বড় ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ। এই দুই বিষয়ে আলাদা নীতি থাকলেও আসলে এই বিষয় দুটি একই সূত্রে বাঁধা। এই উভয়মুখী সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সর্বোপরি পরিবার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পল্লী উন্নয়নের একটি পূর্বশর্ত।

৮. টেকসই উন্নয়ন

পল্লী উন্নয়ন নীতি-কৌশল তৈরি এবং কার্যক্রম গ্রহণের সময় পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি সম্ভব নয়। গ্রামের মানুষ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা দিনদিন অরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। জলবায়ুর এই পরিবর্তনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার একটি মূল কারণ। উন্নয়নের ওপর জোর দিতে গিয়ে, পরিবেশকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলা হয়েছে। তাই পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের উন্নয়নের ওপরও জোর দিতে হবে।

উপসংহার

২০২০ সালের মহামারির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব একটি ধাক্কা খেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। বিশ্বব্যাপী বন্ধ ঘোষণার ফলে মানুষের ঘরে আটকে যাওয়া, কর্মস্থল বন্ধ হয়ে যাওয়া, উৎপাদন বিশেষ করে শিল্পোৎপাদ থেমে যাওয়া, সড়ক-নৌপথ-বিমানপথ বন্ধ থাকা - এসব বিষয় অর্থনীতির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এই মহামারি উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় বিশ্বকেই বিপদগ্রস্ত করেছে। ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন কমে যাচ্ছে। এজন্য জাতিসংঘ এবং বিশ্বব্যাংকসহ উন্নয়ন সংস্থাগুলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন বিষয়ে উদ্বিগ্ন। এমতাবস্থায়, পল্লী উন্নয়ন বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশের পল্লী উন্নয়ন পিছিয়ে যেতে পারে। তারপরও হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অনেকগুলো বিষয় কাজ করছে যা পূর্বে ছিল না। বিশেষ করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলো প্রত্যেক দেশের জন্য উন্নয়নের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পূর্বের উন্নত দেশ (ইউরোপ-আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার উন্নত দেশসমূহ) গুলোর পাশাপাশি এশিয়ার অনেকগুলো দেশ উন্নয়ন সহযোগী দেশে পরিণত হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে কোনো কোনো দেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এসব বিষয়কে সমন্বিতভাবে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নকে আরো

নতুন ধারায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন। উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এসডিজি বাস্তবায়ন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে কাজে লাগানো এবং সর্বোপরি উন্নয়নের নতুন তত্ত্ব বা প্যারাডাইম শিফটের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি

১. OECD (2016), *A New Rural Development Paradigm for the 21st Century: A Toolkit for Developing Countries*, Development Centre Studies, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264252271-en

২. IFAD (2016). *Rural Development Report 2016 : Fostering inclusive rural transformation*. Rome.

৩. Barbier, E. B., & Burgess, J. C. (2020). Sustainability and development after COVID- 19. *World Development*, *135*, 105082.

৪. Cowie, P., Townsend, L., & Salemink, K. (2020). Smart rural futures: Will rural areas be left behind in the 4th industrial revolution?. *Journal of rural studies*, *79*, 169-176.

৫. Maxwell, S., Urey, I., & Ashley, C. (2001). *Emerging issues in rural development*. London: Overseas Development Institute.

৬. Mihai, F.-C., & Iatu, C. (2020). Sustainable Rural Development under Agenda 2030. In M. J. Bastante- Ceca (Ed.), *Sustainability Assessment at the 21st century* (pp. 9-18). London: IntechOpen Limited. ttps://doi.org/10.5772/ intechopen.90161

৭. Asadullah, M. N., Savoia, A., & Mahmud, W. (2014). Paths to development: Is there a Bangladesh surprise?. *World Development*, *62*, 138-154.

৮. Asadullah, M. N., Savoia, A., & Sen, K. (2020). Will South Asia Achieve the Sustainable Development Goals by 2030? Learning from the MDGs Experience. *Social Indicators Research*, *152*(1), 165-189.

৯. Mahmud, W., Ahmed, S., & Mahajan, S. (2008). Economic reforms, growth, and governance: The political economy aspects of Bangladesh's development surprise. *Leadership and growth*, *227*.

১০. Devarajan, S. (2005). South Asian Surprises. Economic and Political Weekly, 4013-4015.

১১. Drze, J., & Sen, A. (2013). An uncertain glory: India and its contradictions. Princeton University Press.

১২. UNDP (2020), Human Development Index.

ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা : যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা

পল্লী উন্নয়নে প্রযুক্তি
প্রেক্ষিত বার্ড এবং আরডিএ

আবুল কালাম আজাদ, মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা
ড. মোঃ আব্দুল কাদের, নূর মোহাম্মদ

ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। এ দেশের সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি এবং সার্বিক জীবনপ্রবাহ কৃষিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বাংলাদেশ এখনো গ্রামীণ বাংলাদেশ-পল্লী বাংলাদেশ। কেননা এ দেশের প্রায় ৬৫ শতাংশ মানুষ এখনো গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ১৩ দশমিক ৬ শতাংশ আসে কৃষি থেকে। কৃষিতে ৪১ শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থান হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও উর্বর জমি সারা বছর ধরে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। ফসলের পাশাপাশি এ দেশের কৃষক আদিকাল থেকে গবাদি প্রাণী, হাঁস-মুরগি পালন করেন এবং বাড়ির আঙিনায় পুকুর, ডোবা-নালা থাকলে সেখানে মাছ চাষ করেন। প্রাকৃতিক জলাশয়-নদী, খাল-বিল, সমুদ্রে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, কৃষি অর্থনীতির মূল উপখাত—ফসল, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য ও বন—বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্যভাবে বিদ্যমান।

কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহারে বঙ্গবন্ধুর অবদান

নয় মাসব্যাপী একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবসে তিনি বলেন, 'আমাদের চাষি হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পিছনে নিয়োজিত করতে হবে।' স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠনের পরপরই বঙ্গবন্ধু উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন। বিএডিসির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকার ভর্তুকি দিয়ে সার ও সেচযন্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে তিনি সারের ব্যবহার ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক চাষাবাদ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক পরিচালিত কৃত্রিম প্রজনন ল্যাব পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি।

পদ্ধতির জন্য প্রযুক্তি ও উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য বঙ্গবন্ধু কৃষি গবেষণার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেন এবং মেধাবী ছাত্রদের কৃষিশিক্ষায় আকর্ষণ করার জন্য কৃষিবিদদের তিনি প্রথম শ্রেণির মর্যাদা দিয়েছিলেন।

বর্তমান সরকারের অবদান

বর্তমান সরকারের আমলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও আধুনিক কলাকৌশল ব্যবহারে বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়ন ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে। পল্লী উন্নয়নে বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন বার্ড, আরডিএ ও বাপার্ড পল্লী প্রযুক্তির জ্ঞান কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন মডেল উপহার দিয়েছে। এ যাবৎ পল্লী উন্নয়ন খাতে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে এবং এখনও পরিবর্তন ঘটছে তার সবই হচ্ছে পল্লী প্রযুক্তির মাধ্যমে। এক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারে পল্লী উন্নয়নকে আরো গতিশীল করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার। তিনি স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন যে, ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্যের চাহিদা পূরণে এমন সব পদক্ষেপ নিতে হবে যার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে। তাই ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লীর জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সরকার কৃষির নতুন নতুন প্রযুক্তি কৃষকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে অল্প সময়ে অধিক চাষাবাদ করে কৃষক উপকৃত হচ্ছেন। কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এমনকি গ্রাম পর্যায়ে ছড়িয়ে গেছে যা পল্লী উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

গঙ্গা নদীর প্রবাহ থেকে অধিক পানিপ্রাপ্তি, সেচ ব্যবস্থার প্রসার, উন্নত বীজ, সার, কীটনাশকের ব্যবহার, নানা ধরনের প্রণোদনা এবং সার্বিক কৃষকদরদি নীতির ফলে কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতির যে ধারা সূচিত হয়েছিল, তার অনুসরণে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। কৃষিই দারিদ্র্য বিমোচনের সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। এ লক্ষ্যে সরকার ফসলের উন্নত জাত উদ্ভাবন ও বীজ সরবরাহ, কৃষি উপকরণে প্রণোদনা প্রদান, সারের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রবর্তন এবং ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা, কৃষি খাতের উন্নয়নে সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিজমির আওতা সম্প্রসারণ, কৃষকদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ, প্রশিক্ষণ, শস্য বহুমুখীকরণ, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতের সহায়ক পরিবেশ সৃজন, কৃষিপুনর্বাসন সহায়তা প্রদান, কৃষি গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কৃষি গবেষণার জন্য এনডাউমেন্ট ফান্ড মঞ্জুর এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার্থে জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম প্রতিবছর অব্যাহতভাবে করা হচ্ছে। ফলে, কৃষি খাতে ঈর্ষণীয় সাফল্য

অর্জিত হয়েছে। ধানের উৎপাদন ৩ কোটি ৮৭ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। গম ১২ লাখ টন, ভুট্টা ৫২ লাখ টন এবং আলু উৎপাদন হচ্ছে ১ কোটি ৫ লাখ টন। ডাল, শাক-সবজি, ফলমূল, তেল ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ধান উৎপাদনে সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়াকে পিছনে ফেলে ৩য়, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু ও পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম এবং সবজি উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দেশ। গবাদি প্রাণী ও পাখির টিকা উৎপাদন, চিকিৎসাসেবা প্রদান, কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দুধ, ডিম, হাঁস-মুরগি ও গবাদি প্রাণীর খামার, মৎস্য চাষের খামার স্থাপন কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। ফলে দুধ, ডিম, মাংসসহ অন্যান্য পুষ্টিজাতীয় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১০-'১১ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন যথাক্রমে ২৯ দশমিক ৫ লাখ টন, ১৯ দশমিক ৯ লাখ টন ও ৬০৭ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে যথাক্রমে ১ কোটি টন, ৭২ দশমিক ৬ লাখ টন এবং ১ হাজার ৬০০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। মৎস্য খাতের উন্নয়নে মৎস্যজীবীদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান, অভয়াশ্রম স্থাপন, সমবায়ভিত্তিক মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্য সম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুত নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ মাত্রা নির্ণয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ১০ বছরে মাছের উৎপাদন ২৭ দশমিক ১ লাখ টন থেকে বেড়ে ৪১ দশমিক ৩৪ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। মৎস্য ও প্রাণীসম্পদের উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাভুক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি মডেলসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বার্ড, কুমিল্লা কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

কুমিল্লা মডেল

কুমিল্লা মডেলের প্রবর্তক ও বার্ডের প্রথম পরিচালক আখতার হামিদ খান তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের নীতি ও সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন এলাকায় এটি প্রয়োগের ধারণা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে বার্ড ১৯৫৯ সালের শুরু থেকে কয়েকটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসব প্রকল্প প্রবর্তনের পিছনে দুই ধরনের উদ্দেশ্য ছিল : প্রথমত, একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাস্তব জীবন সম্পর্কে শিক্ষাদানের পরিস্থিতি সৃষ্টি এবং দ্বিতীয়ত, কর্মসূচি/প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন, যা দেশের অন্যত্রও বাস্তবায়ন করা যায়। প্রকল্পগুলোর দিকনির্দেশনা ও কার্য পরিচালনায় বার্ড প্রণীত নীতিমালা ও কৌশল প্রায়োগিক প্রকল্পসমূহের উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে এবং ফলত একটি গ্রামোন্নয়ন উদ্যোগ সৃষ্টি হয়।

কুমিল্লা মডেলের বিকাশের ক্ষেত্রে যেসব যুক্তি ও ধারণা কাজ করেছে সম্ভবত সেগুলো হচ্ছে : (১) গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পল্লী উন্নয়নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা, কেননা তারাই গ্রামীণ পরিস্থিতি ও গ্রামজীবনের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত; (২) উন্নয়নের উপকরণ যোগান দিলে গ্রামবাসীরা নিজেরাই তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে সক্ষম; (৩) গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকতর উন্নয়ন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য কৃষি উন্নয়নকে অপরিহার্য পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ; (৪) গ্রামকে উন্নয়নের মৌলিক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা এবং আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া সূচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ; (৫) গ্রামোন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয় হলো প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও নির্দেশনা এবং গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে এগুলোর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক সৃষ্টি করা।

কুমিল্লা মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো : (১) এ মডেলের চাবিকাঠি হিসেবে পল্লী উন্নয়নের পুরো প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, উন্নয়নের উৎকর্ষ সাধনের ওপর গুরুত্বারোপ, সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধিকরণ এবং এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা; (২) পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতকে সংশ্লিষ্ট করা; (৩) প্রত্যেক গ্রামে নিজেদের সংগঠন ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের একটি ক্যাডার সৃষ্টি, যেমন ম্যানেজার, আদর্শ কৃষক, নারী সংগঠক, যুবনেতা, গ্রামের হিসাবরক্ষক; (৪) গ্রামাঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের জন্য তিনটি মৌলিক অবকাঠামো (প্রশাসনিক, ভৌত ও সাংগঠনিক) সৃষ্টি; (৫) বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মকর্তা ও জনসংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকৃত ও সমন্বিত পল্লী-প্রশাসনকে অগ্রাধিকার প্রদান; (৬) বিভিন্ন পরিপূরক গ্রামোন্নয়ন ও প্রকল্প কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উপখাতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও সমন্বিতকরণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন; (৭) শিক্ষা, সংগঠন ও শৃঙ্খলা এ মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য; (৮) একটি সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সমাজ নির্মাণের জন্য অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়ের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ; (৯) কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের এবং গ্রামীণ শ্রমজীবীদের অধিকাংশের কর্মসংস্থানের উপযোগী একটি টেকসই ও প্রগতিশীল কৃষিব্যবস্থা উদ্ভাবন। এসব বৈশিষ্ট্যই সমাজ উন্নয়ন, টার্গেট গ্রুপ উদ্যোগ, নিবিড় এলাকা উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার মধ্যে কুমিল্লা মডেলকে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। (বাংলাপিডিয়া, ২০১৪)

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক উদ্ভাবিত সমবায়ভিত্তিক আধুনিক চাষাবাদের মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে জমির আইল উঠিয়ে ও সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে ব্যয় হ্রাসকরণ এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে যান্ত্রিক চাষাবাদের দ্বারা কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও জীবিকা নির্বাহের জন্য টেকসই ব্যবস্থা তৈরি করা।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য মডেল/প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে এবং তা সফলতার সাথে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছে। নিম্নে আরডিএ উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য মডেল/প্রযুক্তিসমূহ তুলে ধরা হলো :

ক) ভূগর্ভস্থ সেচ নালা

আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত ভূগর্ভস্থ সেচ নালার প্রযুক্তি ব্যবহারের পানি অপচয়রোধ সম্ভব হয়েছে (৯৫%); এবং ভূগর্ভস্থ পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে, যা কৃষি সেচ ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধিত হয়েছে। গভীর নলকূপ সেচ এলাকার এরূপ বৃদ্ধির ফলে একর প্রতি বিদ্যুৎ/জ্বালানি খরচ (৭৫%) কমানো হচ্ছে। আরডিএ'র অভিজ্ঞতার আলোকে এই ভূগর্ভস্থ সেচ নালা বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), বাংলাদেশ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক কৃষি যান্ত্রিকীকরণ পদ্ধতিতে ট্রে-তে চারা উৎপাদন পরিদর্শন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং আরডিএ-র সাবেক মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), উত্তর-পূর্ব ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (কৃষি মন্ত্রণালয়), গ্রামীণ কৃষি ফাউন্ডেশন (গ্রামীণ ব্যাংক) দেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফলভাবে ব্যবহার করছে।

খ) আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্পব্যয়ের গভীর নলকূপ

আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বল্পব্যয়ের গভীর নলকূপ ও গভীর নলকূপের বহুমুখী ব্যবহার প্রযুক্তিটি দেশব্যাপী জনপ্রিয়তার সাথে পল্লী এলাকার জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আরডিএ এই প্রযুক্তির মাধ্যমে গভীর নলকূপে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। ফলে দেশীয় সহজলভ্য মালামাল ব্যবহার করে এই গভীর নলকূপ স্থাপন ব্যয় কমায় এটি লাভজনক এবং পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গভীর নলকূপের ব্যবহার কেবলমাত্র সেচের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বছরব্যাপী চালু রেখে সেচের পাশাপাশি খাবার, গৃহস্থালি কাজসহ বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে (নার্সারি, মৎস্য চাষ, গবাদি প্রাণী পালন, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প) ব্যবহারের মাধ্যমে লাভজনককরণে বহুমুখী ব্যবহার মডেলটি গ্রাম অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়েছে। মডেলটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে গভীর নলকূপকে বছরব্যাপী ব্যবহারের মাধ্যমে লাভজনক বিনিয়োগের খাত হিসেবে জনপ্রিয় করা সম্ভব হয়েছে। সেচের পাশাপাশি বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে (নার্সারি, মৎস্য চাষ, গবাদি প্রাণী পালন, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পে) ব্যবহারের মাধ্যমে গভীর নলকূপগুলোর বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পানি সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অধিকতর সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

গ) আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ

বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ থেকে উত্তোলিত খাবার পানিতে আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব একটি জাতীয় সমস্যা। বর্তমানে দেশের প্রায় সকল জেলায় কয়েক লক্ষ লোক কম-বেশি আর্সেনিক সমস্যায় আক্রান্ত। এই ভয়াবহ সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য দুইটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যা ভূগর্ভস্থ পানি পরীক্ষাকরণের মাধ্যমে আর্সেনিকমুক্ত প্রাপ্তি সাপেক্ষে গভীর নলকূপ স্থাপন করে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে এলাকায় মাটির নিচে কোনো আর্সেনিকমুক্ত পানির স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় না সেই সকল এলাকার জন্য স্বল্পব্যয়ে আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের জন্য স্বল্পব্যয়ে পানি শোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ফিল্ট্রেশন প্ল্যান্টের উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আরডিএ'র সহযোগিতায় স্বল্পব্যয়ের গভীর নলকূপসহ ফিল্ট্রেশন প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে এবং এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ঘ) কমিউনিটিভিত্তিক বায়োগ্যাস মডেল

পল্লী উন্নয়নে কমিউনিটিভিত্তিক বায়োগ্যাস মডেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি মডেল। পারিবারিক পর্যায়ের প্রচলিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের পরিবর্তে কমিউনিটিভিত্তিক বায়োগ্যাস মডেল উদ্ভাবন। শুধুমাত্র দুধ ও মাংসের জন্য খামার স্থাপন লাভজনক নয় বরং বর্জ্যকে বায়োগ্যাস ও জৈবসারে রূপান্তরের মাধ্যমে গবাদি প্রাণীর খামার লাভজনক করা সম্ভব হয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস ও জৈব সারের যোগান নিশ্চিতকরণে মডেলটি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন রোধকল্পে মডেলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিলিন্ডারে বোতলজাতকরণসহ পরীক্ষামূলকভাবে বায়োগ্যাসকে সিএনজিতে রূপান্তর করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয়

পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ায় এলপিজি গ্যাস আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে মডেলটি সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ঙ) সৌরশক্তি নির্ভর সেচ ও দ্বি-স্তর কৃষি

আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত সৌর শক্তিনির্ভর সেচ ও দ্বি-স্তর কৃষি প্রযুক্তিটি বাংলাদেশের পল্লী কৃষির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গবেষণায় দেখা গেছে, খাদ্য নিরাপত্তার প্রধান নিয়ামক ধান চাষের পাশাপাশি অন্যান্য ফসল একত্রে চাষ করলে কৃষক অধিক লাভবান হবে। এক্ষেত্রে দ্বি-স্তর কৃষি পদ্ধতিতে একই জমিতে একই সময়ে ধান ও লতানো সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে ধানকেন্দ্রিক চাষাবাদকে লাভজনক করা হয়ে থাকে। দ্বি-স্তর কৃষি পদ্ধতির সাথে তৃতীয় স্তরে সোলার প্যানেল সংযোজন করে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছাড়াই পরিবেশসম্মতভাবে সেচ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় এবং সবার জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির ব্যবহার ও লোডশেডিংকালীন, বিদ্যুৎ বঞ্চিত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ, পল্লীর সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিটি গ্রামে চালু করা মাধ্যমে সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার ''ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো'' সহ জ্বালানির চাহিদা মেটাতে মডেলটি কার্যকরী ভূমিকা রাখছে।

চ) পল্লী জনপদ

গ্রামাঞ্চলে ভবিষ্যৎ আবাসন সংকট নিরসনে আরডিএ উদ্ভাবিত পল্লীবাসীর উন্নত আবাসন নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প তথা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সংবলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবনবিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প একাডেমি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সেখানে প্রতিটি ভবনে মোট ২৭২টি পরিবার বসবাস করতে পারবে এবং গবাদি প্রাণী লালনপালন করার সুযোগ পাবে, ফলে কৃষিজমির অপচয়রোধসহ সমবায়ভিত্তিক বসবাসে পল্লী উন্নয়নকে আরো গতিশীল করবে। এছাড়াও বর্তমান সরকার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার 'আমার গ্রাম-আমার শহর' প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগরিক সুবিধা সৃষ্টির ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। আরডিএ উদ্ভাবিত 'পল্লী জনপদ' মডেলটি পল্লীর মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ছ) আরডিএ ঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশে পৌর এলাকায় ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও দেশের পল্লী এলাকায় সরকারিভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে পানি সরবরাহের জন্য বিল পরিশোধের ক্ষমতা বা মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন ও জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়ার পানির বহুমুখী ব্যবহারের সাথে আরডিএ ক্রেডিট কার্যক্রম একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। আরডিএ'র ক্ষুদ্র ঋণের প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে এবং প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আরডিএর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পল্লীর মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি পানির বিল পরিশোধের ক্ষমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

জ) গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা

আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা মডেলটি পল্লীর মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ভালোমানের বীজ উৎপাদনের জন্য মডেলটি বিভিন্ন কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে অসংখ্য গ্রামীণ নারীকে উপকরণ সহায়তা ভিত্তিবীজ ও

'বার্ডের কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে মনোহরগঞ্জ উপজেলায় কম্বাইন হারভেস্টারের সাহায্যে ফসল কাটা।

'বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার' প্রকল্পের অধীনে পুকুরে মৎস্য চাষের আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ।

রাসায়নিক সার প্রদান করার মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের উৎপাদিত বীজ বিপণনের জন্য বীজ কোম্পানি, ডিলার ও নারীদের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলা হয়েছে এর ফলে নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী করে তুলছে।

ঝ) পল্লী ফসল ক্লিনিক

পল্লী উন্নয়নে আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক উদ্ভাবিত পল্লী ফসলের ক্লিনিক মডেলটির মাধ্যমে শতাধিক রাসায়নিক মুক্ত ও বালাইনাশক (Bio- Pesticide) ব্যবহার করে ফর্মুলা তৈরি ও কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ক্লিনিকগুলোতে সরবরাহ এবং জনপ্রিয়করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ফসল ক্লিনিক এলাকায় রাসায়নিক বিষ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষণীয়ভাবে কমে আসছে। সহজ ও সাবলীল ভাষায় লেখার কারণে কৃষকরা অনায়সে অনুসরণ করে নিজেরাই জৈব বালাইনাশক তৈরি ও সেগুলো ব্যবহার করতে পারছেন। আরডিএ উদ্ভাবিত ফেসগার্ড কৃষকদের স্বাস্থ্য-সুরক্ষায় কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। পল্লী ফসল ক্লিনিকে জৈব বালাইনাশক (Green Pharmacy) ও "কৃষকের স্বাস্থ্য তথ্য সেবা" নামক দুইটি নতুন সার্ভিস অন্তর্ভুক্ত করে ফসলের ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনপ্রিয় জৈব বালাইনাশকসমূহ ব্যবহার করে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার কৃষকরা বিষমুক্ত অর্গানিক সবজি চাষ করছেন এবং অনেক জৈব বালাইনাশক বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি করে বাড়তি আয় করছেন। এছাড়া জৈব বালাইনাশকে কেন্দ্র করে বিষমুক্ত অর্গানিক সবজি চাষিদের একটি নিজস্ব সংগঠন গড়ে উঠেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফসলের ডাক্তারগণ নিজ উদ্যোগে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দূর-দূরান্তের কৃষকদের ফসলের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। এছাড়া ফসলের স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে কৃষকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর গবেষণা কেন্দ্র থেকে মোবাইল ফোনে জেনে নিতে পারছেন।

ঞ) চর জীবিকায়ন মডেল

আরডিএ কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী উন্নয়নে চর জীবিকায়ন কর্মসূচিটি বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার চরাঞ্চলের আড়াই লক্ষ দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ সুবিধা পেয়েছে এবং পরোক্ষভাবে পরিবারের সদস্য হিসেবে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। চর জীবিকায়ন কর্মসূচির আওতায় ১,৬৮,০০০ বসতভিটা উঁচুকরণ, ১,৩৩,০২৬টি গবাদি প্রাণীসম্পদ বিতরণ, ১,৩০,২৬৪টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, ১,৫৭৪টি অগভীর নলকূপ স্থাপন, ২০,২০৩টি নলকূপের প্লাটফরম স্থাপন, ৩৯,৮৮৮টি আর্সেনিক পরীক্ষা, ৪৯,৫১৫ জনের বীজ বিতরণ, ৩১,৬৫১টি গাছের চারা বিতরণ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ৩৮,১০৭ দজনকে নদী ভাঙনের সহায়তা প্রদান, ৩২,৬৪৮টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা ও ১,৯৯,৮৮৬ জন রোগীকে পরামর্শ সেবা প্রদান, ৬৮,৮৫৮টি গবাদি প্রাণীকে টিকা দান, ২৩,১৫৯টি গবাদি প্রাণীর কৃমি মুক্তকরণ, ২,৩৬,৬০৩টি গবাদি প্রাণীকে কৃত্রিম প্রজনন সহায়তা প্রদান এবং সবজি বাগান তৈরি, জৈব সার তৈরি, গবাদি প্রাণী পালন, হাঁস-মুরগি পালন, ১৭,৫০,৮৬৬ জন/দিবস প্রশিক্ষণ প্রদান, ১,৪৯৭ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সচিবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, ৩১,৮৮৩ জনকে ঘাস চাষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, ৩,৪৮৯টি গ্রামীণ ঋণদল গঠনের মাধ্যমে ৯৬,৬২৩ জন গ্রামীণ নারী উপকৃত হয়েছে এবং সমবায়ী সুবিধার মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের উল্লিখিত সম্পদসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে চরের উন্নয়ন ঘটেছে এবং আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

- **আবুল কালাম আজাদ :** পরিচালক (প্রকল্প), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা
- **মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা :** উপ-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া এবং প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর
- **ড. মোঃ আব্দুল কাদের :** উপ-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া
- **নূর মোহাম্মদ :** সহকারী পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

পল্লী উন্নয়নে নারী

বার্ডের মহিলা শিক্ষা, আয়, পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সংগঠনভুক্ত সদস্যদের গার্মেন্টস টেইলারিং প্রশিক্ষণ।

সারাওয়াত রশীদ, নাছিমা আক্তার
মোছাঃ রেবেকা সুলতানা, মৌপিয়া আবেদীন

ভূমিকা

দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নশীল একটি গ্রামকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার দেশ হলো বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংক (২০১৯) এর হিসেবে, বাংলাদেশে প্রায় ৬৩ শতাংশ জনগণ এখনও গ্রামে বসবাস করে, যেখানে প্রায় অর্ধেকই হলো নারী। তা সত্ত্বেও সমাজ পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আচরণকে ধারণ করে, ফলে নারীরা পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়। কিন্তু অপরদিকে আমরা দেখি, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে বাংলাদেশের নারীরা হিমালয় জয় করছে, ছত্রীসেনা হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে, গৃহাঙ্গনে বিনা পারিশ্রমিকে পুনঃউৎপাদনমূলক ভূমিকা পালনে অধিকতর সময় দেওয়ার পাশাপাশি শিল্প, বাণিজ্য, প্রশাসন, রাজনীতিসহ সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক অবদান রাখছে। নারীর মর্যাদা, অধিকার রক্ষা, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরুষের সাথে নারীরাও যাতে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে অংশীদারি হয়ে উঠতে পারে সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগ অনুযায়ী অগ্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হলো দারিদ্র্য বিমোচন ও দুর্নীতি নির্মূল, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গসমতা ও শিশু

কল্যাণ, মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রবীণ ও অটিজম কল্যাণের লক্ষ্যে টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ইত্যাদি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী এবং দেশের দারিদ্র্য হার ২০.৫ এবং হতদারিদ্র্য হার ১০.৫ (বিবিএস ২০১৯-২০২০)। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি, জেন্ডার সমতা অর্জন, সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসানের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ একটি অন্যতম কর্মপরিকল্পনা। গত দুই দশকে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ অর্জনেও বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর (এসডিজি ২০১৭)। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে দারিদ্র্য দূরীকরণে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান ও আয়বৈষম্য হ্রাসপূর্বক জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি অর্জন এবং সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ নারীর অবদান কোনোভাবেই খাটো করে দেখা যায় না।

বঙ্গবন্ধু, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা-উত্তর পল্লী উন্নয়নে নারী

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত মা বোনদের বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত করে মর্যাদা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর মন অসহায় নারীদের জন্য যথেষ্ট উদার ছিল। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে নির্যাতিত নারী ও শিশুর সঠিক তথ্য আহরণ এবং তাদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি চাকরি লাভের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর চিকিৎসা ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রথা এবং দুস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল এবং গ্রামীণ মহিলা ক্লাব চালু করেন। সরকারি সহায়তায় গণশিক্ষা ও ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং পরবর্তীতে সরকারিভাবে নারী সমবায় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে বঙ্গমাতা ও নারীর মর্যাদা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। পারিবারিকভাবে বাল্যকালে যে বালিকাকে বিয়ে করেছিলেন সেই গৃহবধূ বঙ্গবন্ধুর জীবনের বড় কর্মপ্রেরণা ও পরিপূরক ছিলেন। একজন নেতা হয়ে ওঠা এবং জেল জুলুমের মধ্যে আদর্শকে সমুন্নত রাখা ও সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর জীবনে সুখ সমৃদ্ধি ও পারিবারিক ঐক্য বজায় রেখে বিপুল পারিবারিক দায়িত্ব পালনে বেগম মুজিব ছিলেন অতুলনীয়, তাই তো তিনি বঙ্গমাতা। বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের প্রচেষ্টায় বীরাঙ্গনা নারীদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদা প্রদান এবং দশ জন বীরাঙ্গনা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও নারী উন্নয়ন

সংবিধান ও নারী উন্নয়ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭২ সালে প্রণীত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের মহান সংবিধান এবং একটি আধুনিক শিক্ষানীতির জন্য কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন, যা জাতির সামনে একটি মাইলফলক ও ভবিষ্যৎ ঠিকানা হিসেবে বিবেচ্য। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ও ছিন্নমূল নারীর জন্য আর্থিক বরাদ্দ, দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-৮০) এবং তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) এবং ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় নারী সম্পৃক্তি এবং জেন্ডার সমতা অর্জনের কার্যক্রমকে অব্যাহতভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে নারী সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বোচ্চ আইন হিসেবে সংবিধানের ১৯(৩), ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৯, ৬৫(৩) ধারায় রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে সমান সুযোগ প্রদান, নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা এবং নারীদের জন্য সংসদে পঞ্চাশটি আসন বরাদ্দসহ আইনের দ্বারা স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা রয়েছে।

নারী উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ

সিমোন দ্য বোভোয়ার তাঁর বিখ্যাত 'দ্বিতীয় লিঙ্গ' বইয়ে বলেছেন, নারী হয়ে কেউ জন্ম নেয় না, নারী হয়ে ওঠে। এই হয়ে ওঠার পর যে মানবসত্তা তৈরি হয় তাকে বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে টিকে থাকতে হয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, চাকরি সর্বক্ষেত্রেই এখনো নারীর অংশগ্রহণ রয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নারী উন্নয়ন কার্যক্রম হিসেবে ১৯৯৬-৯৭ সালে প্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেন। সেটি পরবর্তীতে ২০১১ সংশোধিত ও পরিমার্জিত করা হয়। তাছাড়া জাতীয় মহিলা পরিষদ, নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট ইত্যাদির পাশাপাশি ১৬-১১ ২০১১ সালের ১৬ নভেম্বরে ঢাকার হোটেল রূপসী বাংলা থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জয়িতা কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে ১৬,০০০ এর অধিক নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি রয়েছে। সরকারের চল্লিশটি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট চালু হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নেতৃত্বে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নারী ক্ষমতায়নে সমবায়ের ভূমিকা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals- SDG) এর ৫ নং অভীষ্টে নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আমরা বিশ্বনেতাদের অঙ্গীকার পাই এভাবে :

Women - Achieve gender equality and empower all women and girls
জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন।

সমবায় অধিদপ্তরের নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্প

উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জনে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায় বিভাগও নারী উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে আসছে। সমবায়ভিত্তিক বেশকিছু প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ও হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে :

(১) সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি;

(২) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) (Copmprehensive Village Development Programme- CVDP)

(৩) Family Welfare and Income Generation Activities Through the Rural Co- operatives''

(৪) গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন।

(৫) সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।

(৬) 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে'র আওতায় পরিচালিত 'সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন কম্পোনেন্ট'।

(৭) বৃহত্তর ফরিদপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলে দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণ প্রকল্প।

(৮) দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গঙ্গাচড়া উপজেলায় ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।

এসব প্রকল্পের কয়েকটি শুধুমাত্র নারীদের জন্য পরিচালিত। অন্যগুলো নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে সমবায়ভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে।

বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নারীর উন্নয়নে গৃহীত একটি প্রকল্প "উন্নত জাতের গাভি পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প"। দেশের ৭টি বিভাগের ২৫টি জেলার ৫০টি উপজেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রাক্কলিত টাকা ১৫১.৫৭০৩ কোটি। মেয়াদ জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০২১। উপকারভোগী ১০,০০০ জন সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ নারী। প্রত্যেককে ২টি করে বকনা /গাভি কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা এবং খাদ্য ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য ২০ হাজার টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ, তদারকি, গবাদি পশুর চিকিৎসা বিনামূল্যে পেয়েছেন। এই প্রকল্পভুক্ত ১৩,৯৬৮টি গাভি বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ৬.৫০ লিটার দুধ দিচ্ছে। দৈনিক উৎপাদন ২৮,৩০৬ লিটার। প্রতি লিটার ৪০ টাকা দরে দুধ কিনে নেয় মিল্কভিটা। দৈনিক দুধ বিক্রয়লব্ধ অর্থ আসছে ১১.৩২ লক্ষ টাকা। এটি একদিকে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলছে, সংসারে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। প্রকল্পটি এখন রিভলভিং ফান্ডের অর্থ থেকে সমাপ্তি-উত্তর পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমির উদ্যোগে মুজিববর্ষকে সামনে রেখে 'নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় : অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা' শিরোনামে একটি গবেষণা সম্পাদিত হয়েছে।

বার্ডের নারী উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নে এবং নারীর ভূমিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এবং গঠনতান্ত্রিকভাবে সর্বপ্রথম বার্ড কাজ শুরু করে। ড. আখতার হামিদ খান ষাটের দশকের শুরুতেই বলেছেন, 'যে সকল দেশের নারীগণ শিক্ষিত ও স্বেচ্ছায় পারিবারিক গন্ডি থেকে বের হয়ে সমাজের উন্নয়নে কাজ করে, সেসব দেশই উন্নত হয়েছে (খান, ১৯৯৬)।' এরূপ প্রেক্ষাপটে ড. খান নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য তাদেরকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা নেন।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ১৯৬২ সাল থেকেই কুমিল্লা এলাকার নারীদের উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রকল্প চালু করে। পরবর্তীতে এর মধ্যে সফল কর্মসূচিগুলো নিয়ে দেশের নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়। তৎকালীন বার্ড পল্লী উন্নয়নের একটি কৌশল হিসেবে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রায়োগিক

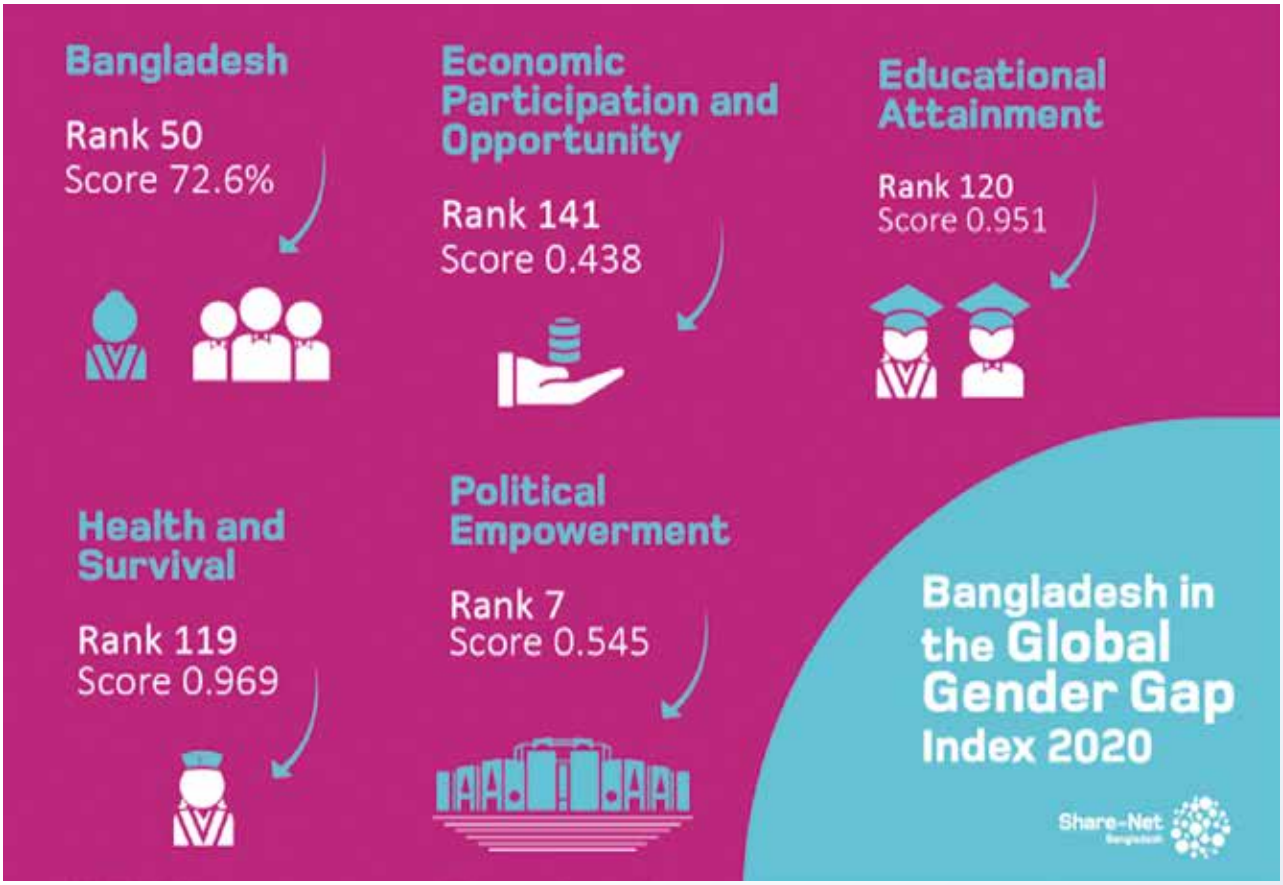

উৎস : ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (২০২০)

গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সাংগঠনিক ও ভৌত অবকাঠামো ও সম্পদসমূহের ব্যবহার এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে। পরবর্তীতে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ড. আখতার হামিদ খানের নেতৃত্বে কুমিল্লা মডেলের নীতি, কৃষক সমবায়, নারী মুক্তির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। বার্ডের মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন (মশিআপুউ) প্রকল্পটি ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস হতে শুরু হয়ে কুমিল্লা সদর, বুড়িচং, সদর দক্ষিণ ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রামে বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। গত চার দশক ধরে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত নারীর প্রতি সংবেদনশীল ও বিশেষভাবে প্রণীত কার্যক্রম হিসেবে সামাজিক, স্বাস্থ্য-পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়গুলো নিয়ে বার্ডের মোট বাজেটের বর্তমানে নারীর হিস্যা অনুযায়ী মশিআপুউ প্রকল্পটি প্রতিবছর গড়ে ১০ লক্ষ টাকা বাজেট দ্বারা কুমিল্লা জেলার ৪টি উপজলোর ১৩টি ইউনিয়নের ২৪টি গ্রামে ১,১০৮ জন উপকারভোগী নিয়ে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে এনজিও এর ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি দেশের এনজিওগুলো বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এই সকল কর্মকাণ্ডের মাঝে নারীবান্ধব ঋণ এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, যার ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ মহিলাদের প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য ও ইতিবাচক পরিবর্তনের দ্বারা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে। এক্ষেত্রে ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকার নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচিগুলোর কথা উল্লেখ করা যায়।

কর্মক্ষেত্র ও শ্রমবাজারে নারীর ভূমিকা

স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ে নারীর অংশগ্রহণ দেশের শ্রমবাজারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, কিন্তু নারীর এই অংশগ্রহণ অনানুষ্ঠানিক বা নিম্ন আয়ের ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজেই বেশি নিয়োজিত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৪ সালে দেশে কর্মক্ষেত্রে নারী ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। এই হার ১৯৮০ সালের দিকে ৮ শতাংশ ও ২০০০ সালে ২৩ দশমিক ৯ শতাংশে ওঠে। বিশ্বব্যাংকের বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন, বাংলাদেশ যদি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শ্রমশক্তিকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করতে পারে, তবে জিডিপিতে প্রবৃদ্ধি আরও ১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গতবছর (২০২০) এক গবেষণায় বলা হয়, মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদান প্রায় ২০ শতাংশ। তবে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের অবদান সমান বলা হলেও শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৩ এর হিসাব অনুযায়ী ৮.৪ মিলিয়ন নারী (কাজে নিয়োজিত নারীর ৪১ শতাংশ) মজুরিবিহীন পারিবারিক শ্রম, যেমন : হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুপালন, বীজ বপন, হাল-চাষ, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাকসবজি উৎপাদন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রয়েছেন যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছে না।যদি সংসারের ভেতর ও বাইরের কাজের মূল্য ধরা হয়, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর মোট অবদান হবে ৪৮ শতাংশ। যা ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা : ০৫ অর্জনে কর্মশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ দেশকে অনেকাংশেই এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

দেশের শ্রমশক্তিতে ৪ কোটি ২২ লাখ পুরুষ আর নারী ১ কোটি ৮৭ লাখ। বিবিএসের সর্বশেষ ২০১৬-'১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপে নারীশ্রম ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশের কথা বলা হয়েছে। ঐ জরিপ অনুযায়ী, দেশে শ্রমশক্তির আকার ৬ কোটি ৩৫ লাখ। এর মধ্যে ৬ কোটি ৮ লাখ মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন। শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ২০১০ সালে বেড়ে ৩৬ শতাংশ হয়। ২০১৩ সালে অবশ্য কিছু কমে ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশে নামে, কিন্তু বর্তমানে যা ঊর্ধ্বমুখী।

তৈরি পোশাক খাতে নারীর ভূমিকা

সত্তরের দশকের শুরুতে তৈরি পোশাক খাতে নারীর অংশগ্রহণের সূচনা হয়। বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) পোশাক খাতের অবদান ১১ দশমিক ১৭ শতাংশ। মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৩ শতাংশই আসে পোশাক খাত থেকে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি)। তৈরি পোশাকখাতে বর্তমানে প্রায় ২ দশমিক ৮ মিলিয়ন নারী নিয়োজিত রয়েছে। এশিয়ান সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এই খাতে কাজ করা ৪০ লাখ শ্রমিকের ৫৯ দশমিক ১২ শতাংশ নারী। বিবিএসের সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ বলছে, পোশাকশিল্প খাতে পুরুষ এখন ৫৩ দশমিক ৮২ শতাংশ; বিপরীতে নারী আছেন ৪৬ দশমিক ১৮ শতাংশ। গত সাত বছরে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প তার বার্ষিক আয় ১৯ বিলিয়ন ডলার থেকে ৩৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে- যা পূর্বের তুলনায় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি)

প্রযুক্তি ও দক্ষতায় ঘাটতি, বেতন বাড়ায় পুরুষদের আগ্রহ বৃদ্ধির কারণে তৈরি পোশাক খাতে (গার্মেন্টস) নারী শ্রমিকেরা পিছিয়ে পড়ছেন। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নারীদের দক্ষ করতে এখনই পদক্ষেপ না নিলে নারীদের কয়েক যুগের এই পেশা টিকিয়ে রাখা কঠিন বলে মনে করছেন এই খাতের বিশেষজ্ঞরা।

বিগত চার বছরের ব্যবধানে পোশাকশিল্প খাতে নারীর অংশগ্রহণ ১০ দশমিক ৬৮ শতাংশ কমেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তির দুটি পৃথক জরিপ বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। বেসরকারি একাধিক জরিপেও নারী শ্রমিক কমে যাওয়ার এই প্রবণতা উঠে এসেছে। এই দুটি জরিপ আরও বলছে, পোশাক খাতে ২০১৩ থেকে ২০১৬-১৭ সালে কর্মসংস্থানের গড় প্রবৃদ্ধি পুরুষের ক্ষেত্রে ১১ দশমিক ৫৪ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে নারীদের কর্মসংস্থানের গড় প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ কমেছে।

প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে সেলাই জানার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পোশাক খাতে নারীদের রাজত্ব করার সুযোগ নেই। কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখতে নারীদের দক্ষ হতে হবে। তাই, বর্তমান বাংলাদেশ সরকারও দেশের অর্থনৈতিক কেন্দ্রীয় এই স্তম্ভটিকে নারীবান্ধব করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

পল্লী উন্নয়নে নারীর অবদান

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা, অংশীদারিত্ব এবং শহর ও গ্রামে আয়বৈষম্য কমিয়ে আনা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এই নিয়ামকের প্রেক্ষিতে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (২০২০) তথ্য মতে, জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্সে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ০.৭২৬ স্কোর করে জেন্ডার নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে, যেখানে ১৫৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশর অবস্থান ৫০তম। এই রিপোর্টের আরও তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ২০০৭ সাল থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৭২ শতাংশ জেন্ডার গ্যাপ কমিয়ে এনেছে। যা থেকে বুঝা যায় বাংলাদেশে নারীর অবস্থান, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণেও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয় এবং এর স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৯ সালের ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এম্পপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' এ ভূষিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের মূলে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মধ্যে নারীবান্ধব বাজেটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; যেখানে ৩০ শতাংশেরও বেশি বাজেট প্রত্যক্ষভাবে নারী উন্নয়নে অগ্রাধিকারকে বিবেচনা করে করা হয়। ১৯৯০ থেকে ২০২০ গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের শ্রমশক্তি বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ শতাংশ হয়েছে (Census and Economic Centre, ২০২০), এই নারী শ্রমশক্তির ঊর্ধ্বমুখিতার প্রতিফলন পাওয়া যায় জাতিসংঘের প্রতিবেদনেও। জানা যায়, ১৯৯০ সালে মোট শ্রমশক্তিতে নারীর অবদান ছিল ১৯.৯৫ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯.১৪ হয় এবং বর্তমানে ২০২০ এ ৩৬.৪১৫ শতাংশ হয়েছে (আইএলও, ২০২০)। "Employment, Labour Force Participation and Education: Towards Gender Equality in Bangladesh" এর তথ্যে, বাংলাদেশের উল্লিখিত মোট নারী শ্রমশক্তিতে গ্রামীণ নারীশক্তি ২০১০ এ ছিল ৩৬.৪ শতাংশ, যেটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ তে ৩৮.৩ শতাংশে পৌঁছায়।

বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় সংবাদপত্র 'দৈনিক প্রথম আলো' (২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০) প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, ৪৩

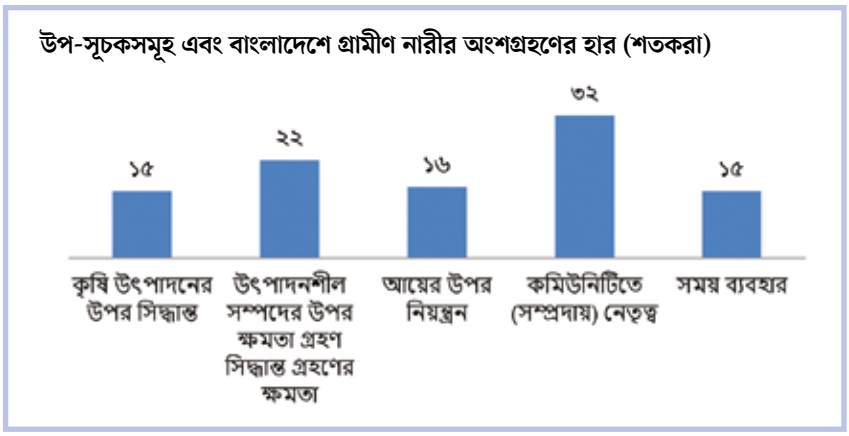

(উৎস : IFPRI, ২০১৫)

শতাংশেরও বেশি নারীরা এখনো শুধুমাত্র গৃহস্থালির কাজেই নিজেদের সংযুক্ত রেখেছে। গৃহস্থালি কাজে দেশের নারীরা বছরে ব্যয় করে ১৬ হাজার ৬৪১ কোটি ঘণ্টা, যার আর্থিক মূল্য ২ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা। এই কাজকে ন্যাশনাল ইনকাম মেজারিং সিস্টেম এর অন্তর্ভুক্ত করা হলে জিডিপিতে নারীদের ভূমিকা প্রায় ৪৮ শতাংশ হবে যা বর্তমানে ২০ শতাংশের মতো রয়েছে। নারীদের পারিবারিক কাজ অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না এবং এক্ষেত্রে বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীদের এই অবৈতনিক শ্রম অদৃশ্য ও উপেক্ষিত। যার প্রেক্ষিতে ১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে প্রথমবারের মতো গ্রামীণ নারীদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করে '১৫ অক্টোবর' কে গ্রামীণ নারী দিবস ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে নিউইয়র্কে ২০০৮ সালে দিবসটি প্রথমবারের মতো উদযাপন করা হয়েছিল। উক্ত সম্মেলনে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে নারীর ভূমিকা, খাদ্য সুরক্ষা ও পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণে আদিবাসী নারীসহ সকল গ্রামীণ নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পল্লী উন্নয়নে নারীদের শ্রম অবদানকে নিম্নোক্ত তিনটি বৃহত্তর ভাগে বিভক্ত করা যায়-

- কৃষিকাজে নারীর ভূমিকা;
- খাদ্য সুরক্ষা;
- পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণে নারীর ভূমিকা।

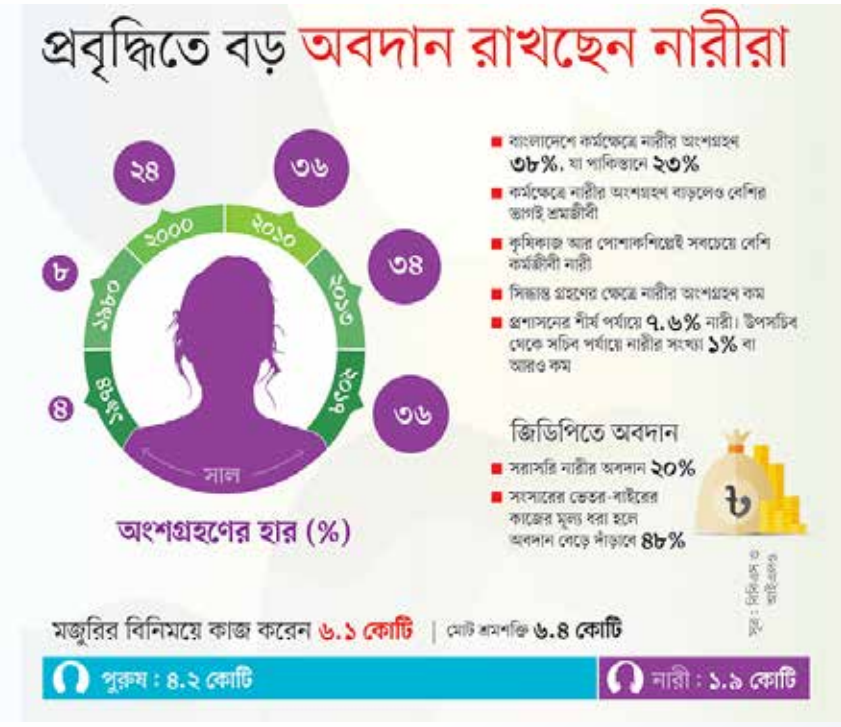

সূত্র : বিবিএস (২০১৬-১৭) ও আইএলও (২০২০)

নারী, কৃষি ও সবুজ বিপ্লব

কৃষি শুমারি-২০১৯ এর ফলাফলে "জিডিপিতে বর্তমানে বৃহত্তর কৃষির সমন্বিত অবদান শতকরা ১৩.৩১ শতাংশ। আর মোট শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশের বেশি কৃষিতে নিয়োজিত।" আইএলওর শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট ১ কোটি ২০ লাখ নারী শ্রমিকের মধ্যে ৭৪ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৯২ লাখ নারীই কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ ও সামাজিক বনায়নের সঙ্গে জড়িত। ২০১৬ সালের সিএসআরএলের (ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড) প্রতিবেদন অনুযায়ী, কৃষি খাতের ২১ ধরনের কাজের মধ্যে ১৭ ধরনের কাজেই গ্রামীণ নারী অংশগ্রহণ করে থাকেন। ফসলের প্রাক্-বপন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের অনেক কাজ নারী এককভাবে করেন। এছাড়াও গতানুগতিক এই কাজের পাশাপাশি বাংলাদেশের কৃষিতে নারীরা নতুন ধরনের কৃষি উৎপাদনে এগিয়ে যাচ্ছে। দৈনিক প্রথম আলো (সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২০) তথ্যমতে, দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কিছু এলাকায় সূর্যমুখীর

রংপুর জেলার উদকনিক প্রকল্পের টেইলারিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

চাষ হয় এবং এই চাষে অংশগ্রহণ করে তুলনামূলকভাবে দরিদ্র কৃষক পরিবারের নারীরা। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়, নারীরা গতানুগতিক কৃষিকাজের পাশপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নতুন কর্মকাণ্ডের সাথেও নিজেদের সংশ্লিষ্ট করছে এবং এই ক্ষেত্রকে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

ইন্টারন্যাশনাল ফুড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে (২০১৮) কৃষিকাজে গ্রামীণ নারীর অংশগ্রহণের ইতিবাচক চিত্র প্রতীয়মান হয়। সারাদেশে ৪,০০০ পরিবারের ওপর পরিচালিত এই গবেষণায় দেখা গেছে, প্রশিক্ষণ পেলে নারী কৃষকেরা পুরুষ কৃষকদের চেয়ে অনেক ভালো করেন। গবেষণাটির মাঠ তথ্যমতে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ কৃষকদের মধ্যে সবজি চাষে উন্নতি করেছেন ২২ শতাংশ, কীটনাশক ও রোগ প্রতিরোধে ভালো উপকরণ ব্যবহারে ২৭ শতাংশ এবং ভালো বীজ ব্যবহারে ২৩ শতাংশ। অন্যদিকে একই প্রশিক্ষণ নিয়ে নারী কৃষকেরা উন্নতি করেছেন যথাক্রমে সবজি উৎপাদনে ৪৮ শতাংশ, কীটনাশক ও রোগ প্রতিরোধ সামগ্রীর ব্যবহারে ৪৩ শতাংশ এবং ভালো বীজ ব্যবহারে ৪০ শতাংশ। আর পুষ্টি ও কৃষি উৎপাদন উভয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া নারীরা ভালো করেছেন ৫৭ শতাংশ। "The U.S. Government's Global Hunger and Food Security Initiative: Feed the future' কৃষিতে অবদানের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে নারীর ভূমিকা পরিমাপ করার জন্য সারা বিশ্বব্যাপী Women's Empowerment in Agriculture Index (WEAI) ব্যবহার করে থাকে, যার অন্যতম দুটি কম্পোনেন্ট -

1. Five Domains of Empowerment (5DE)
2. Women's Gender Parity Index (GPI)

Feed the Future এর সর্বশেষ ২০১৫ এ ইনডেক্স অনুসারে, জিপিআই স্কোর ৯০ অর্থাৎ ৪৩.৬৩ শতাংশ গ্রামীণ নারী Gender Parity অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

উল্লিখিত দুটি উপ-সূচকের সমন্বয়ে WEAI এর র‍্যাংকিংয়ের ঊর্ধ্বগামিতা কৃষিতে গ্রামীণ নারীর পল্লী উন্নয়নের অবদানকে প্রতীয়মান করে।

Women's Empowerment in Agriculture Index (WEAI)

সাল	5DE স্কোর	GPI স্কোর	WEAI
২০১১	০.৬৭	০.৮১	০.৬৮
২০১৫	০.৭৮	০.৯০	০.৭৯

Feed the Future (২০১৫) এর তথ্য মতে, বিগত চার বছরে গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে কৃষির অবদান প্রায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গবেষণা হতে আরও জানা যায়, কৃষি ও গৃহস্থালি কাজে নারীর অংশগ্রহণ, শিশু পুষ্টি, খাদ্য বৈচিত্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবারকে দারিদ্র্য হতে উত্তরণে ভূমিকা রাখছে বলে বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয় একমত পোষণ করেছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার নারী কৃষকদের উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপও নিয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে সরাসরি নারী কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। 'কৃষাণী' হিসেবে ১২ লাখ ৫৮ হাজার ৬৪৭ জন নারী এই কার্ড পাচ্ছেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারে নারীদের আলাদা ক্যাটাগরি রাখা হয়েছে।

খাদ্য সুরক্ষায় নারী

নারী-পুরুষের একই কাজে সমান মজুরি দেওয়ার কথা থাকলেও সেটি অনেক ক্ষেত্রেই মানা হয় না। বিবিএসের (২০১৫) কৃষি মজুরি বিষয়ক জরিপ বলছে, কৃষি মজুরি হিসেবে পুরুষ যদি ১০০ টাকা পান, নারী পান ৭৫ টাকা। সাত বছর আগে একই কাজের জন্য নারী পেতেন ৪৮ টাকা। বৈষম্যটি কমছে খুবই ধীরগতিতে (প্রথম আলো, ১১ জুন ২০১৮)। এমন বৈষম্যপূর্ণ পরিস্থিতির মাঝেও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাব মতে, নারীরা যদি উৎপাদনের জন্য সম্পদ পুরুষের সমপরিমাণ পেত, তাহলে উন্নয়নশীল

বার্ডের মশিআপুউ প্রকল্পের বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন উপলক্ষ্যে পল্লী নারীদের উপাদিত পণ্য ও প্রদর্শনী স্টল পরিদর্শন করেন মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান।

দেশগুলোতে কৃষি উৎপাদন আরও ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেত, যার ফলে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ১০০ থেকে ১৫০ মিলিয়ন কমিয়ে আনা সম্ভব হতো। ১৯৯৮ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কৃষিতে নারীর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে "অন্ন জোগায় নারী" স্লোগানটি নির্ধারণ করেছিল। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান মতে, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ মিলিয়ে কৃষিতে নারী কৃষকের হার ৪৩ শতাংশ। 'রাইট টু ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ওয়াচ-২০১৯' জানাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী যে পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হয়, তার ৮০ শতাংশই আসে পারিবারিক কৃষি থেকে। বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী কৃষকের অবদান নতুন করে আলোচনার কোনো অবকাশ রাখে না। বাংলাদেশে গ্রামীণ নারী কৃষকদের এই অবদান যে কেবলমাত্র খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে তা নয়। মানুষের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা একটি আবশ্যক ধারা। অনেকে মনে করেন, খাদ্য নিরাপত্তা জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম সূচক। এতে কোনো দেশের মর্যাদা যেমন বাড়ে- অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হয়। গৃহস্থালির সকল কাজের পাশাপাশি কৃষিকাজে নিয়োজিত নারী কৃষকদের ৭৪ শতাংশ গবাদি প্রাণী পালন, ৬৩ শতাংশ স্থানীয় জাতের বীজ সংরক্ষণ, ৪০ শতাংশ শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন, শস্য মাড়াই ও মাড়াই পরবর্তী, খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ কৃষিপণ্য উৎপাদনে যুক্ত থাকেন। বিবিএসের সর্বশেষ জরিপ (২০১৫) অনুযায়ী, গত এক দশকের ব্যবধানে দেশের কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে ১০২ শতাংশ। সেখানে পুরুষের অংশগ্রহণ কমেছে ২ শতাংশ। নারী তার নিজ যোগ্যতায় কৃষি খাতের হাল ধরছেন। বিগত ১০ বছরের মধ্যে প্রায় ৭০ লাখ নারী কৃষিতে যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু কৃষিতে নারীর ভূমিকা শুধু 'সাহায্যকারী' হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী হিসেবে নয়। ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কৃষি খাতে নিয়োজিত পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশে গ্রামীণ খাদ্য ব্যবস্থাপনার বড় কারিগর গ্রামীণ নারীরা। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতি বছর দেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘটনা ঘটে। তখন মূলত নারীরা আপদকালীন সময়ের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পাহাড়ি এলাকায় জুম ফসলে ইঁদুরের আক্রমণ, ফলন না হলে বা ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিগত খাদ্য সংকটে পড়লেও পরিবারের খাবারের যোগান দেন পরিবারের নারীরা। বাংলাদেশের নারীরা শাক হিসেবে ১৫০টিরও বেশি গাছ-গাছালি খাদ্য হিসেবে খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে যা আবশ্যিকভাবে খাদ্যের পুষ্টিমানকে নিশ্চিত করে (বাংলাদেশ ঢাকা ট্রিবিউন, মার্চ ৮, ২০২০)।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে নারী

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান থিংক এশিয়ার প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ৩.২৫ শতাংশ নারীরা সরকারি খাতে এবং ৮.৫ শতাংশ বেসরকারি খাতে কাজ করছে। অবশিষ্ট ৮৯.৫ শতাংশ নারী অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত আছে (ঢাকা ট্রিবিউন, ২৩ মার্চ, ২০১৯)। সরকারি খাতের মধ্যে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির একটা বৃহৎ অংশজুড়ে আছে পোশাক শিল্পকারখানা। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বড় অংশও আসে এই শিল্পখাত থেকে। দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে নিয়োজিত কর্মীদের ৬৫ ভাগই নারী। তাদের শ্রম ও ঘামে অর্জিত হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রার ৮৫ শতাংশ (দৈনিক প্রথম আলো, মার্চ ৮, ২০২০)। অর্থনীতিতে নারীর অন্তর্ভুক্তিকরণ বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করাতে সহযোগিতা করেছে। পোশাক শিল্পকারখানায় নারীর সক্রিয় ভূমিকা, পোশাকশিল্প খাতকে যে পর্যায়ে নিয়ে গেছে তা সত্যিই ঈর্ষণীয়। শিল্পকারখানার ইতিবাচক ও নেতিবাচক সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করে নারীরা আজ এই খাতকে শুধু বাঁচিয়েই রাখেনি উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নারীদের

উৎপাদনশীলতা, সম্পদের নিয়ন্ত্রণ, বৈষম্য হ্রাস, শিশুপুষ্টি ও বিদ্যালয়ের উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি দরিদ্রতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। এর কারণ হিসেবে, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল হতে জানা যায়, নারীরা তাদের উপার্জিত অর্থ নিজ পরিবার ও তাদের সম্প্রদায়ের গঠনমূলক কাজে (কমিউনিটি) পুরুষের তুলনায় বেশি প্রদান করে থাকে (The Financial Express, ২০১৯)।

বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের পরেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ (এসএমই) খাতে নারীদের সংশ্লিষ্টতা উল্লেখযোগ্য। উক্ত উদ্যোগের মধ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান, বেকারত্ব হ্রাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা বেশি। দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ২৫ শতাংশ অবদানের সাথে (এসএমই) দেশের শিল্পায়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। (The Independent, ৮ এপ্রিল, ২০১৮)। ইউএনসিডিএফ (২০১৯) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০ লক্ষ মানুষ ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত। তাদের মাঝে ১৩ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীই নারী। এদের ব্যবসাগুলো ছোট হলেও তারা একসাথে বছরে ১,৮৪২ বিলিয়ন ইউএস ডলারের বেশি আয় করে এবং প্রতিদিন দেশে-বিদেশে তারা কয়েক মিলিয়ন গ্রাহককে সেবা দিয়ে থাকে। এসএমই উদ্যোক্তারা স্থানীয় পণ্য যেমন পাট, কৃষি, চামড়া, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স আইটেম, হালকা প্রকৌশল আইটেম, আইটি পণ্য, প্লাস্টিক এবং সিনথেটিকস পণ্য, হস্তশিল্প, এবং আধুনিক ডিজাইনের পোশাক নিয়ে কাজ করে থাকে। এসএমই খাতে বর্তমানে প্রায় আট লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে নারীর অংশগ্রহণ এবং অবদান অনস্বীকার্য।

উপসংহার

বাংলাদেশের নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় দেশের নারী সমাজের যে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে, তার ধারাবাহিকতা ত্বরান্বিত করেই নারীদের জাতীয় উন্নয়নে যোগ্য ও দক্ষ অংশগ্রহণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তিনি শুধু বাংলাদেশের দীর্ঘতম সময় ক্ষমতায় থাকা সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রীই নন, বরং বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আমূল পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি অর্জন করে প্রভাবশালী নারী নেতৃত্ব হিসেবেও বিশ্ব দরবারে সুপরিচিতি লাভ করেছেন। দেশের উন্নয়নমূলক সকল কাজে নারী সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অবদান রাখছে কৃষি অগ্রগতি, খাদ্যসুরক্ষা নিরাপত্তা ও সুনিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এক (দারিদ্র্য মুক্তকরণ) ও লক্ষ্যমাত্রা দুই (ক্ষুধামুক্তকরণ) অর্জনে প্রত্যক্ষ অবদান রাখছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যে সম্ভাবনাময় সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়নের পথ সুগম করতে রয়েছে বাংলাদেশের নারীদের অপরিসীম প্রশংসনীয় ভূমিকা।

বিআরডিবি'র গাইবান্ধার সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত এমব্রয়ডারি পল্লীর কারচুপির (পাঞ্জাবীর গলা ও হাতের পুতির কাজ) কার্যক্রম।

References

Websites:

- www.worldbank.org/en/country/bangladesh (Accessed: 06 December 2020)
- www.weforum.org/reports/gender- gap-2020-report- 100-years- pay- equality (Accessed: 14 December 2020)
- census.gov/programs- surveys/ces.html (Accessed: 06 December 2020)
- International Labour Organization, ILOSTAT database (Accessed: 14 December 2020)
- www.uncdf.org/article/3986/micro-merchant- research- into- action-series- landscape- assessment- of-retail- micro- merchants- in- bangladesh (Accessed: 06 December 2020)
- bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/7d548018_c6f3_4d60_a2fe_2d785acdb9a9/Final%20Brochure%20Agri- 2018.%2006.05.19.pdf (Accessed: 07 December 2020)
- csrlbd.org/cgi- sys/suspendedpage.cgi (Accessed: 07 December 2020)
- www.ifpri.org/publication/women%E2%80%99s- empowerment-agriculture- what- role- food- security-bangladesh (Accessed: 08 December 2020)
- www.feedthefuture.gov/ (Accessed: 09 December 2020)
- www.bbs.gov.bd (Accessed: 09 December 2020)
- unstats.un.org/home/ (Accessed: 09 December 2020)
- www.righttofoodandnutrition.org/state-right- food- and- nutrition- report- 2019 (Accessed: 10 December 2020)
- www.dhakatribune.com/business/2018/04/22/number- women-sme- entrepreneurs- rise (Accessed: 10 December 2020)
- thinkasia.org/handle/11540/7152# :~ :text=In%20Bangladesh%2C%20only%203.25%20per,of%20them%20work%20without%20compensation (Accessed: 10 December 2020)
- thefinancialexpress.com.bd. (Accessed: 11 December 2020)

Newspapers:

- দৈনিক প্রথম আলো (২০ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০২০)
- দৈনিক প্রথম আলো (৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০)
- দৈনিক প্রথম আলো (০৮ মার্চ, ২০২০)
- দৈনিক প্রথম আলো (১১ জুন, ২০১৮)
- The Independent (০৮ এপ্রিল,২০১৮)

- **সারাওয়াত রশীদ :** যুগ্ম-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া
- **নাছিমা আক্তার :** যুগ্ম পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক (মশিআপুউ), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা
- **মোছাঃ রেবেকা সুলতানা :** উপ-পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া
- **মৌপিয়া আবেদীন :** সহকারী পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার :
পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

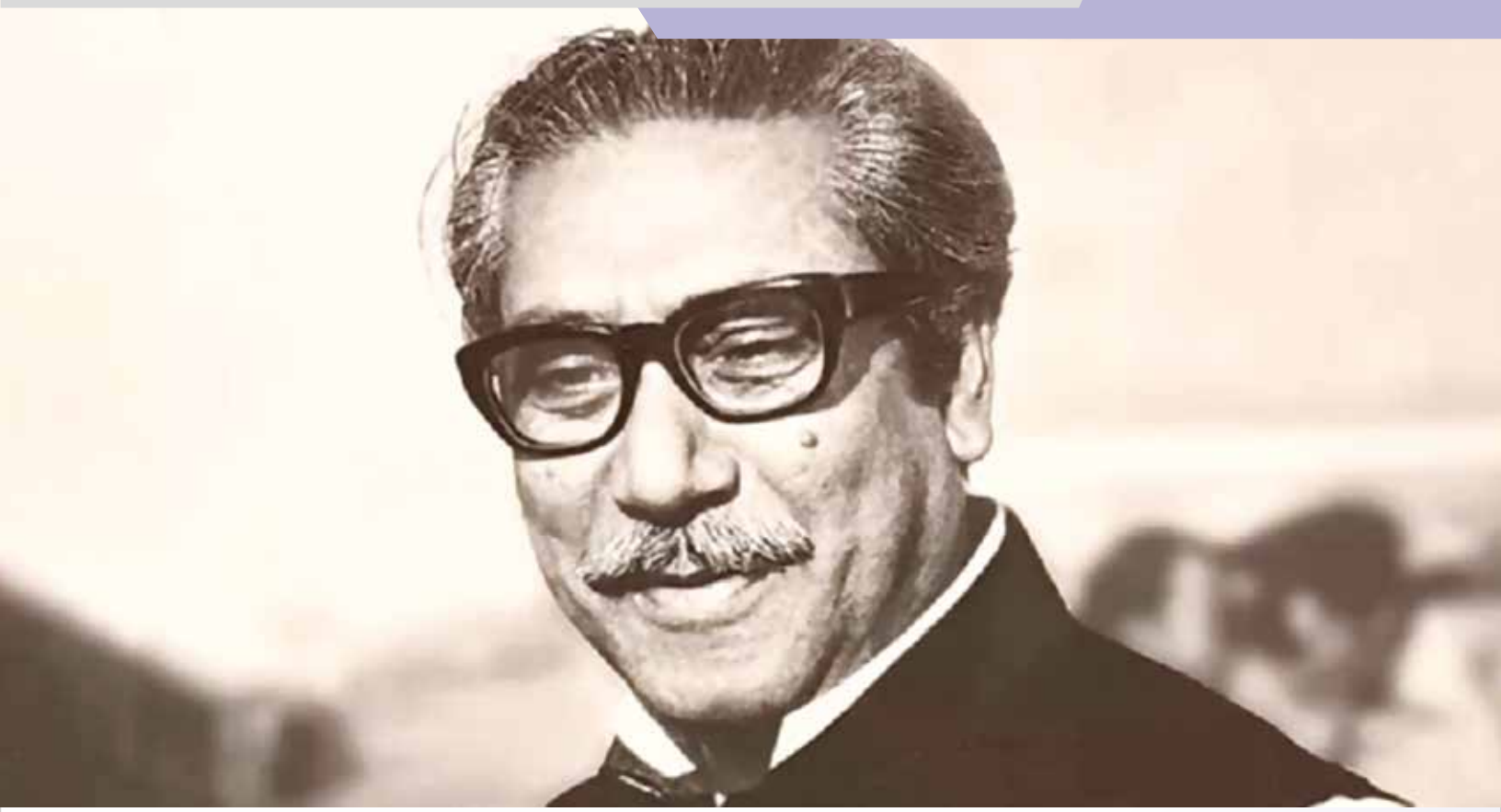

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনের উপজীব্য বাংলাদেশের আবহমান পল্লীর উদ্ভাসিত প্রতিচ্ছবি : "বাংলাদেশ আমার স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা ও আরাধনার ধন। আর সে বাংলা ঘুমিয়ে আছে চির অবহেলিত গ্রামের আনাচকানাচে, চির উপেক্ষিত পল্লীর কন্দরে কন্দরে, বিস্তীর্ণ জলাভূমির আশেপাশে আর সুবিশাল অরণ্যের গভীরে।" স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু একের পর এক পল্লী প্রতিষ্ঠান সৃজনের মাধ্যমে সুপ্ত গ্রামবাংলাকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁর প্রাণমন যুক্ত করেন। এভাবে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ক্রমধারায় অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-এর। বিআরডিবি'র একটি অনন্য প্রয়াস থেকে জন্ম হয় এক অনন্য সংস্থার। এ স্বাতন্ত্র্য সূচক প্রতিষ্ঠানটির নাম পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এবং এর রূপকল্প : 'পল্লীর দরিদ্র্য ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন'। পিডিবিএফ গত দু'দশকে পল্লীর দরিদ্র্য ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে সামাজিক বিনির্মাণ (social construction) ও সংহতি সৃষ্টি, নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা বিধান, জনগণের ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় আহরণ ও নব সম্পদ সৃজনে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে এবং ক্রমে ক্রমে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ ও নিজস্ব সঞ্চয়ের পরিকাঠামোর ওপর সংহতি

বিগত ৯ জুলাই ২০০০ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

বিগত ১৭ জুন, ২০২১ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, কোভিড প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন, সাথে ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান।

শক্তি যোজনের মাধ্যমে এ সংস্থা এককভাবে সঞ্চয়ভিত্তিক ঋণ পরিষেবা প্রদানকারী সরকারি খাতের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির নেপথ্যে যেমন ছিল নাগরিক আকাঙ্ক্ষা, তেমনি উদার বহিঃসহায়তা। পল্লীর জনগণের দারিদ্র্য মোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আইডিএ, ওডিএ, কানাডীয় সিডা ও ইউএনডিপি, বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ১৯৮৪ সালে পল্লী দারিদ্র্য কর্মসূচি (আরপিপি/আরডি-২) গ্রহণ করে। আরপিপি'র সফল বাস্তবায়নের পর কানাডীয় সিডার একক আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১৯৮৮ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১২ (আরডি-১২) এবং ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচি (আরবিপি/আরবিআইপি) বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যুক্ত করেন দারিদ্র্য বিমোচনের এক নতুন স্রোতধারা। তিনি তাঁর মানবিক প্রয়াসের অনুষঙ্গ হিসেবে ১৯৯৯ সালের ৭ নভেম্বর

পিডিবিএফ-এর যুগপূর্তির অনুষ্ঠানে বিপণি পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান জাতীয় সংসদের ২৩নং আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। গত ৯ জুলাই, ২০০০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অভিভাষণের মাধ্যমে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রমের শুভ সূচনা ঘোষণা করেন।

পিডিবিএফ পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে অনানুষ্ঠানিক সংহতি দল ও সমিতি গঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে বিভিন্ন সঞ্চয় পরিকল্পের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা ও সক্ষমতা সৃষ্টি এবং আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে। এ ফাউন্ডেশন পল্লী অঞ্চলে সুফলভোগী সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উদ্দীপনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিতদের বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার জন্য নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সৌরশক্তি (সোলার) প্রকল্প নিয়েও পিডিবিএফ সক্রিয় রয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে ১১ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নর্স দ্বারা পিডিবিএফ পরিচালিত হয়। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পদাধিকারবলে এ বোর্ডের সভাপতি। মহাপরিচালক, বিআরডিবি পদাধিকারবলে এ বোর্ডের সহসভাপতি। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের ৪ জন প্রতিনিধি, ব্যক্তি খাতের ৩ জন প্রতিনিধি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এবং সদস্য-সচিব হিসেবে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে নিয়ে এ বোর্ড গঠিত। বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যবর্গ তিন বছর মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেন।

পিডিবিএফ ক্রমে ক্রমে দেশের ৮টি বিভাগের ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় ৪০৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে মূলধারার কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১১.৫০ লক্ষ এবং প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় ৪.৫৫ লক্ষ গ্রামীণ সুফলভোগীকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। পিডিবিএফ-এর পল্লী পরিষেবা সুফলভোগীদের পরিবারের প্রায় ৮০ লক্ষ সদস্যের মাঝে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিস্তৃত হয়েছে।

পিডিবিএফ সরকারের ৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে বহুমাত্রিক গ্রামীণ পরিষেবা বিস্তৃত হচ্ছে।

বিশ্বব্যাপী গৃহীত ও অনুসৃত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-২০৩০-কে লক্ষ্য করে গৃহীত সরকারের কর্মপ্রয়াসে পিডিবিএফ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে নিম্ন মধ্য আয়ের স্তর থেকে মধ্য আয়ের দেশে বাংলাদেশের অসামান্য উত্তরণের প্রয়াসে এ ফাউন্ডেশন যুক্ত করেছে অব্যাহত কর্মযোগ। ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে 'সোনার বাংলার' রূপায়ণ, ২০৭১ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তিতে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ এবং ২১০০ সালে নিরাপদ ব-দ্বীপের অন্বেষায় দেশের দারিদ্র্য নিরসন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়াই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন

পিডিবিএফ-এর বিগত ১২ বছরের ক্রমপুঞ্জিত সংখ্যাতাত্ত্বিক অগ্রগতি :

করোনাকালীন সময়ে পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র দলের প্রশিক্ষণ।

ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর প্রত্যয় দীপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

অতি সম্প্রতি সরকারের কোভিড-১৯ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পিডিবিএফ-এর অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কোভিডজনিত সংকটকালে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য সরকার ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পকে লক্ষ্য করে ঋণদান কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য এ অর্থ বরাদ্দ করেছে। চলতি অর্থবছরে ইতোমধ্যেই ১০০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য গত ১৭ জুন ২০২১ তারিখে জাতির পিতার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা মনিরামপুর এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিবের নিজ এলাকা মিঠাপুকুরের সাথে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ ঋণদান কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। এভাবে বৃহত্তর লক্ষ্যার্জন প্রয়াসের পাশাপাশি ক্রান্তিকালে সংবেদনশীল কার্যক্রমের সাথেও পিডিবিএফ নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য পল্লী এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং নারী-পুরুষের সমতা বিকাশ সাধন করা। এ লক্ষ্যকে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার জন্য পিডিবিএফ নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

- দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মানব সংগঠন সৃজন;
- বিভিন্ন আয়-উৎসারী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সংগঠিত জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বের বিকাশ ঘটিয়ে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন;
- পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি;
- সাপ্তাহিক ও মাসভিত্তিক সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নিজস্ব সম্পদ সৃজনে সহায়তা করা;
- নবজীবিকা অন্বেষণে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান;
- ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে সদস্যদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা;
- নব উদ্যোক্তা উদ্দীপনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা ও নারী-উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো এবং

পরিবেশের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় দরিদ্রদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ।

কর্ম কৌশল

দরিদ্রদের দলগতভাবে সংগঠিত করা, উপকারভোগীদের আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করা এবং তাদের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করা।

ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্ম সৃজন, নবসম্পদ সৃজন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে পল্লীর ক্রম রূপান্তরের লক্ষ্যে দেশের ৫৫টি জেলার ৩৫৭ উপজেলায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ২১ বছরে পিডিবিএফ মোট ১২,৫১৫ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে এবং ৫.১৫ লক্ষ সুফলভোগীকে আয়-উৎসারী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং উপকারভোগীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি উপকারভোগী সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন, আয় উৎসারী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ওপর দক্ষতা উন্নয়ন ও প্যারেটেক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এই প্রশিক্ষণের ফলে উপকারভোগীগণ দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং ঋণের টাকা সঠিক খাতে ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। বিগত ২১ বছরে পিডিবিএফ ৫.১৫ লক্ষ উপকারভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

পিডিবিএফ-এর গবেষণা কার্যক্রম

পিডিবিএফ সম্প্রতি 'গবেষণা ও উন্নয়ন' নামে একটি নতুন বিভাগ গঠনের মাধ্যমে মাঠ সমীক্ষা ও সারথি প্রকল্পসহ বিভিন্নমুখী কার্যক্রম সূচনার উদ্যোগ নিয়েছে। পিডিবিএফ গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ২০২১ সময়কালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর সাথে যৌথভাবে 'বিপন্ন হাওড় : উন্নয়ন অন্বেষা' শীর্ষক একটি সরেজমিন গবেষণা পরিচালনা করে। পিডিবিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার-এর নেতৃত্বে বার্ড ও পিডিবিএফ-এর গবেষণা দল কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেট জেলায় সমীক্ষা পরিচালনা করে এ গবেষণার ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়েছে। ২০১৭ সালে আকস্মিক বন্যার অভিঘাত হাওড় এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর কতখানি বিপর্যয় ডেকে এনেছে, সরকারের পুনর্বাসন কার্যক্রম তাদের জীবন ও জীবিকায় কী প্রভাব ফেলেছে এবং উন্নয়নের মূলধারায় তাদের যুক্ত করার জন্য কী সৃজনশীল ও আয় উৎসারী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায় গবেষণায় সে সম্পর্কে বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মতবিনিময়ের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। পিডিবিএফ এ গবেষণার ফলাফলের নিরিখে দারিদ্র্যের মানচিত্র (Poverty Mapping) এবং দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও পর্যায় নিরূপণের (Poverty Tracking) এর মাধ্যমে বিশেষ ভৌগোলিক এলাকা হিসেবে হাওড় অঞ্চলে বিরাজমান ভিন্নতর আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করবে। আগামীতে পিডিবিএফ বরেন্দ্র, চলনবিল, চরাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ও সম্পৃক্তির মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণ করে এলাকাভিত্তিক বিশেষ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

পিডিবিএফ-এর এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্প

১. প্রন্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

মেয়াদ : জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১
প্রকল্প এলাকা : ৫টি বিভাগের ১০ জেলার ৫০ উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় : ৭,০০৬.০০ লক্ষ টাকা

২. হাজামজা/পতিত পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে সংগঠিত জনগোষ্ঠীর পাট পচানো পরবর্তী মাছ চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

মেয়াদ : জুলাই, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২১
প্রকল্প এলাকা : ৪ জেলার ২৮ উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় : ৩,৯৬৭.৪৬ লক্ষ টাকা

৩. বাংলাদেশের প্রত্যন্ত বিদ্যুৎ বিহীন এবং চর এলাকায় সৌর শক্তি উন্নয়ন প্রকল্প

মেয়াদ : মার্চ, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২১
প্রকল্প এলাকা : রংপুর বিভাগের ২টি জেলার ২ টি উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন
প্রকল্প ব্যয় : ৩,৩০৮.৪২ লক্ষ টাকা

৪. আলোকিত পল্লী সড়কবাতি প্রকল্প

মেয়াদ : জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২
প্রকল্প এলাকা : ৮টি বিভাগের ১৩টি জেলার ১৭টি উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় : ৪,৮৪৬.৯১ লক্ষ টাকা।

পিডিবিএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

(ক) সংহতি দলের মাধ্যমে পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিনির্মাণ

পিডিবিএফ সংহতি দল ও সমিতি গঠনের মাধ্যমে পল্লীর দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এক নতুন সামাজিক বিনির্মাণের ধারায় কাজ করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে জন মনস্তত্ত্বে অনুকূল প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে পারস্পরিক নির্ভরতা ও আস্থার বাতাবরণ সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ৪৮,৫৬৪টি সমিতির মাধ্যমে ২৬,৭২,৭৩৯ জন সুফলভোগীকে সংগঠিত করে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-'২০ অর্থবছরে ৭১২টি নতুন সমিতির মাধ্যমে ১,২৯,০৪৬ জন নতুন সদস্য ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে সমিতির সংখ্যা ৩০,৭২৫টি এবং সুফলভোগী সদস্য সংখ্যা ১০.৮৮ লক্ষ।

(খ) ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

পিডিবিএফ পল্লী দারিদ্র্য ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন চক্রকে অব্যাহত রাখা ও সমুন্নত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে

পিডিবিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর উপজেলায় সোলার স্ট্রিট লাইট প্রকল্প ও প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংরক্ষণ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের পর্যালোচনা সভায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল আহসান।

দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১২,০৭৯.৫৫ কোটি টাকা এবং আদায়ের হার ৯৯%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে পিডিবিএফ সুফলভোগী সদস্যদেরকে ১,০১৫.৮০ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১,০৪১.২০ কোটি টাকা এবং ঋণ আদায়ের হার ৯২%। পিডিবিএফ-এর ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে প্রায় ৯৭ শতাংশ মহিলা।

(গ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম

পিডিবিএফ এর অনেক ক্ষুদ্র উপকারভোগী সদস্য নতুন ব্যবসা ও কুটির শিল্প সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হন না। কারণ তাদের যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা ক্ষুদ্র ঋণের আওতার বাহিরে চলে যায়। আবার ব্যাংক ঋণ কিছুটা ঝামেলাপূর্ণ বিধায় ব্যাংক থেকে তারা অনেক সময় ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না। আবার কিছু লোক কোনো সমিতির সদস্য নয় কিন্তু পুঁজির অভাবে তারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আরো লাভজনকভাবে চালাতে পারছেন না, তাদেরকে পিডিবিএফ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ দিয়ে থাকে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ২,৬৯,৭৪০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে ৪,১০২.১৬ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে এবং আদায়ের হার ৯৮%। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঋণের আওতায় ২৫,১০২ জন উদ্যোক্তাকে ৫১৮.৬৭ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৫৫৮.৬৭ কোটি টাকা এবং আদায়ের হার ৯৩%।

(ঘ) নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম

সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাকরণের লক্ষ্যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকারসহ সময়ের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পিডিবিএফ ২০১৮-'১৯ অর্থবছর থেকে নারী উদ্যোক্তা ঋণ চালু করে। নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পিডিবিএফ এর সদস্যের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে সচ্ছলতা অর্জন করেছে, যাদের ক্ষুদ্রঋণের চেয়ে অতিরিক্ত ঋণ সহায়তা প্রয়োজন সেই সকল সদস্যদের নারী উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-'২০ অর্থবছরে এ ঋণের আওতায় ২,১৯,৮০৭ জন নারী উদ্যোক্তাকে ২০৬.০৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়, ঋণ আদায়ের পরিমাণ ১৫৭.৭৯ কোটি টাকা এবং আদায়ের হার ৯০%।

কয়েকজন সুফলভোগীর সাফল্যের আলেখ্য

চলনবিলের সংগ্রামী মাজেদা

সিংড়া উপজেলা সংলগ্ন গ্রাম নিগুইন ঘুনপাড়া। গ্রামের গৃহবধূ মাজেদা বেগম খুব অভাবী মানুষ। পিডিবিএফ এর আওতায় নিগুইন ঘুনপাড়া মহিলা সমিতি গঠন করা হয়। উক্ত সমিতির ৯নং সদস্যা মাজেদা বেগমের অভাব-অনটন আর দুঃখ কষ্ট ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। সমিতি করার সময়ে খড়ের চালা দিয়ে তৈরি দুইটি ঘর ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার। অসুস্থ বেকার স্বামী দুই ছেলে আর দুই মেয়েকে নিয়ে সে খুবই কষ্টে দিনযাপন করতেন।দুই ছেলে অন্যের জমিতে শ্রম দিয়ে এবং নিজে অন্যের বাড়িতে কাজ

করে সংসার চালাতেন। সমিতির মাধ্যমে ৩ দিনের হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রথম দফায় ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণ নিয়ে ৩০ টাকা দরে ২৫০টি লেয়ার হাঁস ক্রয় করেন। বাচ্চাগুলোকে সারাদিন চলন বিলের মধ্যে চড়াতেন। রাত্রিবেলায় চলন বিলের এক কোনায় জাল দিয়ে ঘেরাও করে রাখেন। চার মাস পালন করার পর বাচ্চাগুলো ডিম দেওয়া শুরু করে। হাঁসগুলো প্রতিদিন ১৭০ থেকে ১৮০টি ডিম দেয়। প্রতিটি ডিম ১০ টাকা দরে বিক্রয় করেন। প্রতিদিন ১,৭০০ টাকার ডিম বিক্রি করেন। একটি ছেলে নিজ খামারে সারাদিন পরিশ্রম করেন। সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে তিনি এখন প্রতিদিন ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা উপার্জন করেন। ৭-৮ মাস পর পূর্বের কিস্তি পরিশোধ করে আবার ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ৫০০টি হাঁসের বাচ্চা ক্রয় করেন এবং একইভাবে বিলের মধ্যে লালনপালন করেন। বর্তমানে তৃতীয় দফায় ২০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে লেয়ার হাঁস ৫০০টি এবং একদিনের বাচ্চা ৫০০টি মোট ১,০০০টি হাঁসের মালিক হয়েছেন।

বর্তমানে প্রতিদিন ৩৫০টি ডিম দেয়। ১০ টাকা হিসেবে দৈনিক ৩,৫০০ টাকা ডিম বিক্রি করে নিজের ও হাঁসের খরচ বাবদ ২০,০০০ টাকা আয় করেন। বর্তমানে তার সাধারণ সঞ্চয় ৩,৭২০ টাকা। ঋণের পরিমাণ ১২,৩২০ টাকা। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন। বাড়িটি খড়ের বদলে মাটির এবং উপরে টিনের চালা দিয়ে ৩টি ঘর বানিয়েছেন। তিনি নিজেকে পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর সফল সদস্যা বলে মনে করেন। মাজেদা এখন গ্রামের অন্য সদস্যদের অনুকরণীয়। পিডিবিএফ মাজেদার উন্নয়নের সহযোগী হতে পেরে ধন্য। উল্লেখ্য, সিংড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুধু মাজেদাকে নয়, এরকম স্বাবলম্বী হতে অনেককেই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এভাবে মাজেদা বেগম অতীতের দুঃসহ দারিদ্র্যতার সাথে যুদ্ধ করে পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে সাফল্য ছিনিয়ে এনেছেন।

জীবন যুদ্ধে জয়ী তানজিলা পারভীন

মোছাঃ তানজিলা পারভীন, সদস্য নং-০২৪, সমিতির নামঃ সুলতানপুর শেখ পাড়া মহিলা সমিতি, সমিতি কোড নং-০৬০ এর একজন নিয়মিত সদস্য। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), সাতক্ষীরা সদর কার্যালয়ের আওতাভুক্ত সুলতানপুর শেখ পাড়া মহিলা সমিতিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন। তিনি যখন সমিতিতে ভর্তি হন তখন তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারপ ছিল। অর্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করতে হতো। স্বামী ছিল বেকার। এমতাবস্থায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) সাতক্ষীরা সদর কার্যালয়ের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত একজন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে পিডিবিএফ এর সমিতিতে ভর্তি হন এবং সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। কিছুদিন পর তিনি ৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ১টি সেলাই মেশিন ক্রয় করে দর্জির কাজ শুরু করেন। উক্ত কাজের আয় থেকে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত সঞ্চয় জমাসহ কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। এরপর আবার ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরও ১টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন এবং সাথে কিছু ছিট কাপড় উঠান। এভাবে পর্যায়ক্রমে ঋণ নিয়ে তিনি ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তার ১০টি সেলাই মেশিন আছে। তিনি একটি ঘর ভাড়া নিয়ে ১০ জন অসহায় ও দরিদ্র মেয়েদেরকে কাজ শেখান। তানজিলা পারভীন তাদেরকে স্বনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তুলেছেন। এতে ঐ সমস্ত অসহায় ও দরিদ্র মেয়েরাও স্বাবলম্বী হয়ে ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ পাচ্ছে।

তানজিলা পারভীনের সমিতিতে মোট সঞ্চয় জমা আছে ২০,৬৩৫ টাকা। তার বর্তমান ঋণের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা। তিনি আজ পরিবার ও সমাজের বোঝা নন।

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী গ্রামের নারী উদ্যোক্তা নাছিমা বেগমের ফুল চাষ।

ঝিনাইদহ জেলার মহেষপুর উপজেলার খালিসপুর গ্রামের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণগ্রহীতা জনাব ফারুখ হোসেন একজন সফল ড্রাগন চাষি।

ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছেন। তিনি চান যারা বেকার আছেন তারা যেন তার মতো আত্মকর্মসংস্থানে এগিয়ে আসেন। নিজেরা আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। পিডিবিএফ এর সার্বিক সহযোগিতায় দর্জি ব্যবসার মাধ্যমে তার সংসারে সুখের দেখা মিলেছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) পল্লীর বিপন্ন মানুষের প্রতিষ্ঠান। 'সবার নিচে, সবার পিছে, সব হারাদের মাঝে' আমাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। কোভিডের অতিমৃত্যু বিশ্বকে 'স্তব্ধ, ভীত ও বিস্মিত' করেছে। তবুও থেমে থাকেনি পিডিবিএফ-এর পথ চলা। পল্লীর দুঃস্থ বিপদগ্রস্ত ও বঞ্চিত মানুষের পাশে থেকে পিডিবিএফ-এর কর্মীরা তাদের ভাগ্য বদলের লড়াইয়ে সহযোদ্ধার মত সক্রিয়।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ও মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা দিয়েছেন স্বপ্নময় বারতা : রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১। উন্নয়নের প্রাণস্পর্শে পল্লীর জনপদ ও জনগণকে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করে চলেছে পিডিবিএফ-এর কর্মী দল।

মহাজনি শোষণের বিরুদ্ধে বিত্তহীনের সংগ্রাম। কারবারিদের হঠকারিতায় গ্রামীণ দরিদ্রদের রুখে দাঁড়ানোর যুদ্ধ। দাদন ব্যবসায়ীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো বিত্তহীন কৃষাণের প্রতিরোধ। এ জীবন-সংগ্রামে পিডিবিএফ-এর কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে প্রাণিত পল্লীর হতদরিদ্র মানুষের সাথি ও সারথি।

মুহম্মদ মউদুদউর রশীদ সফদার : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ

জাতির পিতা ও জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ

উঠান বৈঠকে মতবিনিময় সভায় ফাউন্ডেশনের সুফলভোগী সদস্যগণ।

এ এইচ এম আবদুল্লাহ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহান নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। রাজনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তিও ছিল জাতির পিতা অন্যতম স্বপ্ন। তিনি স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। বিশেষ করে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ বাংলাদেশে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বারোপ করেছিলেন এবং সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, ডাক দিয়েছিলেন সবুজ বিপ্লবের।

সমবায়কে সংবিধানের অন্যতম মালিকানা হিসেবে স্বীকৃতি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-বিআরডিবি কে নবভাবে পূর্ণ উদ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ, আধুনিক সেচ ব্যবস্থার প্রচলন ও সম্প্রসারণ, উন্নত প্রযুক্তিতে চাষাবাদ প্রচলনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, আরডিএ বগুড়ার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের দরিদ্রতর ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকের জন্য জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণের সূচনাসহ সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের ফলে তার বিভিন্ন সুফল আজকের বাংলাদেশ ভোগ করছে। পল্লী উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষি নির্ভর এদেশে সবুজ বিপ্লবের প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল আইন ও বিধি বঙ্গবন্ধুর সময়ে প্রণীত হয়েছে আর সে অনুযায়ী নব-দিগন্ত উন্মোচনে

হয়েছে যুগান্তকারী সব কর্মসূচির।

জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণের প্রেক্ষাপট

গত শতাব্দীর সত্তর দশক নানা কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। বিশেষ করে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশসহ সেই সময় ফিলিপাইন, ভারত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়াসহ অনুন্নত দেশগুলো ক্ষুধা ও মন্দা কাটাতে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সংগ্রামরত ছিল। দারিদ্র্যপীড়িত এসব দেশের মানুষের মধ্যে দানা বেঁধেছিল বিক্ষোভ-বিদ্রোহ। এসব দেশে ক্ষুধা ও মঙ্গা আক্রান্ত মানুষকে কীভাবে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা যায় সেজন্য জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থাসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পথ খুঁজে ফিরছিলেন।

এ প্রেক্ষাপটে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ১৯৭২ সালে এশিয়া অঞ্চলের ৮ টি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ফিলিপাইনস, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া ও থাইল্যান্ডের ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য Asian Survey On Agrarian Reforms and Rural Development (ASARRD) শীর্ষক একটি স্টাডি প্রকল্প গ্রহণ করে।

এ প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ফিলিপাইনস, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া ও থাইল্যান্ডের দরিদ্র মানুষের মাঝে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। জরিপ প্রতিবেদনের মূল পর্যবেক্ষণে বলা হয়, প্রচলিত উন্নয়ন ব্যবস্থায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে এবং এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্রদের উন্নয়নে অংশীদার করার জন্য সকল প্রকার সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে দরিদ্রদের জন্য একটি 'গ্রহণকারী ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং 'প্রদানকারী ব্যবস্থা' কে ঢেলে সাজাতে হবে। এ লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর স্টাডি প্রকল্পের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলোর কাছে তাদের এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা পেশ করে। এ স্টাডি প্রকল্পে এ ৮টি দেশের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন।

জামানতবিহীন ঋণ কার্যক্রমের বাস্তবায়নে পথিকৃৎ ও পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠান

স্টাডি প্রজেক্টে ৮টি দেশ অংশগ্রহণ করলেও প্রকল্পের সুপারিশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্য দেশগুলো সে সময়ে এগিয়ে আসেনি। এ প্রকল্পের সুপারিশ বাস্তবায়নে সে সময় বাংলাদেশই কেবল সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে।

সুফলভোগীদের কোভিড-১৯ প্রণোদনা ঋণ চেক বিতরণ।

এ সুপারিশের আলোকে ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় "Action Research on Small Farmers and Landless Labourers Development Project (SFDP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে।

প্রকল্পটির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান যথা : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-বার্ড, কুমিল্লা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় -বাকৃবি, ময়মনসিংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-আরডিএ বগুড়াকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

মূলত এ প্রকল্পের মাধ্যমেই শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বে সর্বপ্রথম দরিদ্র ও দরিদ্রতর মানুষকে অনানুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের আয় বৃদ্ধি ও জাতীয় উন্নয়নে অংশীদার করার যুগান্তকারী কার্যক্রমের সূচনা হয়। কিন্তু ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ট্র্যাজেডির মাধ্যমে বাঙালি জাতির মহানায়ক সপরিবারে শাহাদতবরণ করলে প্রকল্পটি তার প্রত্যাশিত ও পরিকল্পিত সরকারি সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রকল্পের ১৯৭৫-'৮০ সালের কার্যক্রম সন্তোষজনক বিবেচনায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-বার্ড, কুমিল্লাকে প্রকল্পটি এককভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

মূলত এ প্রকল্পের মাধ্যমেই শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বে সর্বপ্রথম দরিদ্র ও দরিদ্রতর মানুষকে কেন্দ্রভিত্তিক সংগঠিত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের আত্মকর্মসংস্থান, উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করে জাতীয় উন্নয়নে অংশীদার করার যুগান্তকারী কার্যক্রমের সূচনা হয়। জামানতবিহীন এ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ হচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বিশ্বে তথা বাংলাদেশে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ প্রকল্পের উত্তরসূরি সংগঠন হিসেবে নিঃসন্দেহে স্বীকৃতির দাবিদার এসএফডিএফ। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নিয়ে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তথ্য প্রমাণ, ইতিহাস ও সময়ের নিরিখে যথাযথ ও নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করলে এ জাজ্বল্যমান সত্য প্রমাণিত হবে যে, বাংলাদেশে তথা বিশ্বে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ সংগঠন 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)'। পথিকৃৎ হচ্ছেন বাংলাদেশের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আর এ মহতী প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের সাথে জড়িয়ে আছে জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা- এফএও, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-বার্ড, কুমিল্লা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-বাকৃবি, ময়মনসিংহ এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-আরডিএ, বগুড়া, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি-ইউএনডিপি।

জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যিনি বিশ্বস্বীকৃতি অর্জন

বৃক্ষরোপণে ফাউন্ডেশনের মাঠ পর্যায়ে গাছের চারা বিতরণ।

করেছেন, তিনিও এক সময় এ প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে জামানতবিহীন ঋণ বিতরণ, অনানুষ্ঠানিক সমিতি গঠন, কিস্তি আদায় উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষক হিসেবে পরিদর্শন করেছেন এবং এ প্রতিষ্ঠানের সেমিনার, ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। এসব অর্জিত জ্ঞান তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন তা দেখা যায়নি। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-বার্ড-এর লাইব্রেরিতে এর সকল তথ্য প্রমাণক সংরক্ষিত আছে।

বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্প থেকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তর

নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পরবর্তীতে এ গবেষণা প্রকল্পের ইতিবাচক ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে Small Farmers and Landless Labourers Development Project নামে এবং পরে Small Farmers Development Programme- SFDP নামে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় স্বল্প পরিসরের একটি প্রজেক্ট হিসেবে এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। কিন্তু প্রয়োজনীয় তহবিলের অভাবে এ প্রকল্পটি যেভাবে বিস্তৃত হবার কথা ছিল সেভাবে বিস্তৃত হয়নি। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে ১৯৯৬-'৯৯ সালে প্রকল্পটির কার্যক্রম অব্যাহত রেখে ডিপিপিতে প্রকল্পটি সমাপ্তির পর স্থায়ী ফাউন্ডেশনে রূপান্তরের অনুমোদন প্রদান করা হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পটি Small Farmers Development Foundation- SFDF নামে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু করে।

এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রকল্পটি কখনো পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায়, কখনো বার্ডের আওতায় একটি প্রকল্প হিসেবে কার্যক্রম সচল রাখলেও এ প্রকল্পটিকে জামানতবিহীন ঋণ কার্যক্রমের পথিকৃৎ হিসেবে যেরূপ আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন ছিল তা পায়নি। কিন্তু এ সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রামীণ ব্যাংক, বিআরডিবি, পিডিবিএফ, পিকেএসএফ, ব্র্যাক, আশাসহ বিভিন্ন ব্যাংক, অসংখ্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যাপক মূলধন নিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। ফলে এসএফডিএফ পথিকৃৎ সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও বিনিয়োগ মূলধনের অভাবে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে অন্যান্যের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম সরকারের সময়ে Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) থেকে ২৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা সংশোধন করে জিওবি হতে অর্থ বাড়িয়ে মোট প্রকল্প ব্যয় ২৯.৩৮ কোটিতে উন্নীত করা হয়। এ প্রকল্পে আবর্তক ঋণ তহবিল ছিল ২৭.৪৮ কোটি টাকা। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকার কর্তৃক ৫৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-এসএফডিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে সংশোধন করে ৫৯.১৩ কোটি টাকা ব্যয় নির্ধারিত হয়। এ প্রকল্পে আবর্তক ঋণ তহবিল ছিল ৩৮.২০ কোটি_টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ১৮টি জেলার আরো ৫৪টি দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলায় ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার ফলে আরো বিনিয়োগ তহবিলের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়।

বর্তমান উন্নয়নবান্ধব আওয়ামী লীগ সরকারের গতিশীল নেতৃত্বের সার্বিক সহযোগিতায় 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা-২য় পর্যায়' প্রকল্প নামে একটি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ায় এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬২.৫০ কোটি আবর্তক ঋণ তহবিল পেয়ে অনুমোদিত মোট ৩টি প্রকল্প থেকে ১২৮.১৮ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন সময়ে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে অনুন্নয়ন খাতে ১৪.০০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১৪২.১৮ কোটি টাকা মূলধন মাঠ পর্যায়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ২ লক্ষ ৯ হাজার দরিদ্র পরিবারকে ফাউন্ডেশন সহযোগিতা দিয়ে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধি করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

সুফলভোগী সদস্যের আয়বর্ধক মুরগির খামার।

রহমানের হাতে গড়া প্রকল্পের উত্তরসূরি হিসেবে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-এসএফডিএফ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধিভুক্ত ১৯৯৪ সালে কোম্পানি আইনের ২৮ ধারার বিধানমতে গঠিত সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষি ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ ও নারীদের গ্রাম পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় সংগঠিত করে তাদের উৎপাদন, আত্মকর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনটি ২০০৭ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে।

ফাউন্ডেশন বর্তমানে দেশের ৮ বিভাগের ৩৬টি জেলার ১৭৩ উপজেলায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে এ পর্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে ৬ হাজার ৮ শত ৯৪ টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্র গঠন করে ২ লাখ ১৬ হাজার ১৮৩টি পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা সেবা প্রদান করেছে। ফলে সুফলভোগী সদস্যের পরিবারের সদস্য গড়ে ৫ জন ধরে ১০ লাখ ৮০ হাজার মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকারের সহযোগিতায় ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পসহ এসএফডিএফ সর্বমোট ১৪২ কোটি ১৮ লাখ টাকা 'আবর্তক ঋণ তহবিল' ব্যবহার করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুফলভোগীদের মাঝে ক্রমপুঞ্জিতভাবে এ পর্যন্ত প্রায় ১৩শ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে। এ ঋণ নিয়ে সুফলভোগী সদস্যগণ ফসল উৎপাদন, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, গাভি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, চাষাবাদের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ আত্মকর্মসংস্থানের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে লাভবান হচ্ছেন। সুফলভোগীগণ আত্মকর্মসংস্থানের লভ্যাংশ হতে স্বল্প-স্বল্প সঞ্চয় জমার মাধ্যমে ১০১ কোটি ১৫ লাখ টাকা সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধকরণ ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে ৩৭ হাজার ৮৫৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশে কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষি ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের পুরুষ ও নারীদের গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত করে তাদের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ও নারীর ক্ষমতায়নে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। তবে এখনোও অপ্রতুল আবর্তক ঋণ তহবিলের কারণে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম বিনিয়োগ থাকায় পূর্ণাঙ্গ জনবল ও শক্তি নিয়ে ফাউন্ডেশন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে যেতে পারছে না।

ইতোমধ্যে প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস-কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব-এর কারণে সরকার ঘোষিত মাঠ পর্যায়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কারণে এ প্রতিষ্ঠানের সুফলভোগীগণ বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করলেও পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত সদস্যগণ কাঁচামাল সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্য বিপণন করতে না পারায় তাদের আয়ের পথ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের পর দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার স্বার্থে আয়বর্ধক কার্যক্রম যথা- কৃষি, মৎস্য, পোল্ট্রি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পরিচালনার জন্য ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রের সদস্যদের পুনরায় উৎপাদনে রাখার প্রয়োজনে পর্যাপ্ত পরিমাণ নতুন ঋণ তহবিল সহযোগিতার বিষয়ে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে সুফলভোগী সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের সুরক্ষার স্বার্থে উন্নয়নবান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ফাউন্ডেশনের অনুকূলে এককালীন ১০০ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল অনুদান প্রদান করা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি উত্তরণ পরিকল্পনা অনুযায়ী মাত্র ৪% সার্ভিস চার্জ নিয়ে এ অর্থ ছয় মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ দুই বছর মেয়াদে সদস্য পর্যায়ে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। যা কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে সদস্যদের উত্তরণে কার্যকর অবদান রাখবে। করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলা ও কৃষকদের সুরক্ষার

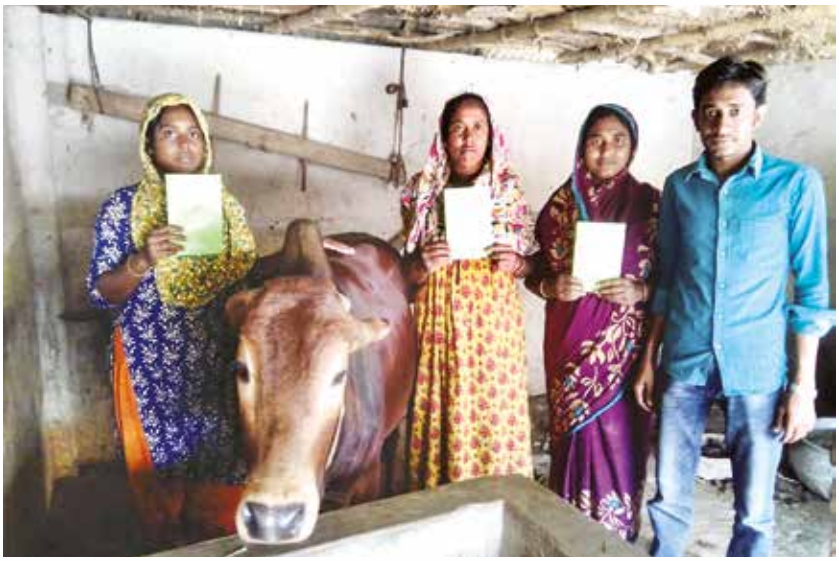

এসএফডিএফ-এর একজন সফল সুবিধাভোগীর পরিবার।

স্বার্থে এসএফডিএফ-এর আওতাধীন কেন্দ্রের সুফলভোগী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি, মৎস্য, ডেইরি এবং পোল্ট্রিসহ অন্যান্য কৃষি খাতে বিনিয়োগের জন্য এবং দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, মাঠে বিনিয়োগকৃত অর্থের সুরক্ষায় করোনা সহযোগিতা কর্মসূচি হিসেবে বিনিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে ও হচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময়ে বিশ্বে তথা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দরিদ্রতর মানুষের স্বনির্ভরতার জন্য জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণের সূচনা হয়। ফলে যেসব মানুষের জামানত দেওয়ার মতো অবলম্বন ছিল না তারা ঋণ সুবিধা ও সহযোগিতা পেতে শুরু করে। ফলে ধীরে ধীরে দরিদ্র মানুষ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়েছে ও ঘটাচ্ছে। আজকের বাংলাদেশ জাতির পিতার প্রদর্শিত দিকনির্দেশনার আলোকে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ সূচনাকারী প্রকল্প "ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এসএফডিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল এবং শুরু হয়েছিল জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম যা আজ দেশের মানুষকে উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলছে। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এসএফডিএফ-এর জন্য গৌরবের বিষয় এই যে, জাতির পিতার হাতে সূচিত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এসএফডিপি) প্রকল্পের উত্তরসূরি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসএফডিএফ এক গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে চলেছে।

বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা মিলিয়ে সারাদেশে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণস্থিতি ৯০ হাজার কোটি টাকারও বেশি এবং সুফলভোগী সদস্য বা কভারেজের সংখ্যা ৪ কোটিরও বেশি। এক বিপুল কর্মযজ্ঞ যা আত্মকর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষি ক্ষেত্রে দেশে বিশাল নীরব বিপ্লবের সূচনা করেছে। এ কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের বহুমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি আজ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর করেছে। এ রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ভিত হিসেবে কাজ করেছে পুঁজিহীন, দিশাহীন, ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক-শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিয়ে জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। জাতির পিতার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে গৃহীত জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি এক্ষেত্রে আর্থিক অগ্রগতির অনুঘটক হিসেবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

এ এইচ এম আবদুল্লাহ : ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

মিল্কভিটা :
বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনার সোনালি স্মারক

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মিল্কভিটার স্টল পরিদর্শন।

অমর চান বণিক

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে কারখানাভিত্তিক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৪৬ সালে। পাবনা-সিরাজগঞ্জ জেলায় নামমাত্র মূল্যে দুধ বিক্রয় হতো, সেহেতু দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা কলকাতাকে মার্কেট হিসেবে চিহ্নিত করে 'ন্যাশনাল নিউট্রিশন কোম্পানি' নামে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ার অভিপ্রায়ে সিরাজগঞ্জ জেলার লাহিড়ীমোহনপুর এলাকায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন করার জন্য মেশিনারিজ নিয়ে আসেন। কারখানার স্থাপনা কার্যক্রম শুরু হলেও দেশ বিভক্তির কারণে ১৯৪৭ সালে এ উদ্যোগ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে জনাব মুখলেছুর রহমান তাঁর নিজস্ব সম্পদ বিনিময় সূত্রে কারখানাটির মালিকানা গ্রহণ করেন। কারখানাটির নাম পরিবর্তন করে ''ইস্টার্ন মিল্ক প্রডাক্টস'' দেওয়া হয় এবং স্থাপনা কাজ ১৯৫২ সালে সমাপ্ত হয়। কারখানা হতে তখন দুধ, ঘি, মাখন ইত্যাদি দুগ্ধজাত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে কলকাতা শহরে স্বল্প পরিসরে কিছু দিন মিল্কভিটা নামে বাজারজাত করা হতো।

১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে সমবায় ব্যবস্থাপনায় এনে সমবায়ভিত্তিক প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং পুরানো নাম সংশোধন করে প্রতিষ্ঠানটির নাম রাখা হয় ''ইস্টার্ন মিল্ক প্রডিউসার্স কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিঃ''। প্রাথমিকভাবে সমবায় ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ফলপ্রসূ না হওয়ায় ১৯৬৮ সালে সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক উক্ত কারখানাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। একই সময়ে আর্থিকভাবে দেউলিয়াত্বের কারণে ঢাকার তেজগাঁয় ''অষ্টো ডেয়রী'' নামে বোতলজাত দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি কর্তৃক দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়। সমবায় মার্কেটিং সোসাইটিও প্রতিষ্ঠান দুটোর আর্থিক অবস্থার উন্নতি অর্জনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। প্রতিষ্ঠান দুটি সীমিতভাবে কিছুদিন উৎপাদন ও বিপণন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও সঠিক ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক সহযোগিতার অভাবে ১৯৭০ সালের প্রথমদিকে কারখানা দুটোর

উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, কৃষক-শ্রমিকের অকৃত্রিম বন্ধু, মেহনতি জনতার কণ্ঠস্বর, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই মেহনতি মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন, কৃষকের উৎপাদিত দুধের ন্যায্যমূল্য প্রদান এবং শহরের ভোক্তা শ্রেণির মধ্যে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ সরবরাহের নিমিত্ত নিজস্ব উৎপাদন ক্ষেত্র দিয়ে দুগ্ধ চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ভারতের ''আমূল'' পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তারই ফলশ্রুতিতে দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে দুগ্ধ সংকট নিরসনের পদ্ধতি নিরূপণের জন্য ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন সংস্থা (ইউএনডিপি) ও ডেনমার্ক'-এর আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্সি ড্যানিডা'-এর সহায়তায় দুই পরামর্শক যথাক্রমে মি. ক্যাসট্রপ ও মি. নেলসন কর্তৃক এ দেশের দুগ্ধ শিল্প নিয়ে স্টাডি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার স্টাডি দুটির সুপারিশ বিবেচনা করে পূর্বতন কারখানা দুটির দায়-দেনা পরিশোধ করে নতুন এলাকায় ''সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প'' নামে ১৯৭৩ সালে একটি দুগ্ধ শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে সরকারের ১৩.১২ কোটি টাকা ঋণ সহায়তায় দেশের পাঁচটি দুগ্ধ এলাকায় নিম্নোক্ত দুটি মৌলিক আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কারখানা স্থাপন করা হয় :

উদ্দেশ্য

ক) শতাব্দী ধরে বঞ্চিত এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়া-দালাল শ্রেণি কর্তৃক নিগৃহীত এ অঞ্চলের দরিদ্র, ভূমিহীন ও নিম্নবিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকবৃন্দকে সমবায়'এর মাধ্যমে সুসংগঠিত করে, তাদের গবাদি পশু থেকে উৎপাদিত দুধের জন্য ন্যায্যমূল্য প্রদানভিত্তিক একটি নিশ্চিত বাজার সৃষ্টি; এবং

খ) শহরাঞ্চলে, যেখানে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ প্রাপ্তি সহজলভ্য নয়, সেখানে ন্যায্যমূল্যে খাঁটি ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

ভিশন

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশকে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। যা শিশু খাদ্যের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণ ত্বরান্বিত করবে এবং গুঁড়োদুধের আমদানি হ্রাস করবে।

মিল্ক ইউনিয়নের বর্তমান অবস্থা

বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের ৮টি বিভাগের ৪২ জেলার ১৩৮টি উপজেলায় ৫১টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের আওতায় ৬৯টি কেন্দ্রীয় সমিতি, ৩,০৮৪টি প্রাথমিক সমিতির ১,৩২,৬০৮ জন সদস্যের নিকট হতে দৈনিক গড়ে ১.৫০-২.০০ লক্ষ লিটার কাঁচা তরল দুগ্ধ সংগ্রহ করে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের জনগণের দুগ্ধ চাহিদা পূরণ করে পুষ্টির জোগান নিশ্চিত করে আসছে।

মিল্ক ইউনিয়নের প্রাথমিক সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতির কার্যক্রম

দেশব্যাপী দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রাথমিক সমিতি এবং কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যাও দিনদিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামার মালিকগণ তাদের উৎপাদিত দুধ ন্যায্যমূল্যে সহজেই বাজারজাত করতে পারছেন এবং মিল্কভিটা একটি গ্যারান্টেড মার্কেট হওয়ায় এবং দুধের মূল্য ননীভিত্তিক হওয়ায় তরল দুধের মূল্য সর্বদাই স্থির থাকে। ফলে মিল্কভিটায় দুধ বাজারজাত করায় সমবায়ীগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত মূল্য পেয়ে থাকেন। এ ধরনের ব্যবস্থা আর কোনো প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান নেই। এতে কৃষকগণের আর্থিক সচ্ছলতার স্থায়ীভাবে উন্নয়ন হচ্ছে, পরিবারের তথা সংশ্লিষ্ট এলাকার জনমানুষের প্রাণিজ পুষ্টির চাহিদা সহজেই মিটানো যাচ্ছে।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি, জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নসহ দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনও গতিশীল হয়েছে।

গত ৯ মার্চ ২০২১ তারিখে মিল্কভিটার বিক্রয় কেন্দ্র সম্পূর্ণ আঙ্গিকে উদ্বোধন করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি, সাথে আছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান এবং মিল্কভিটার চেয়ারম্যান শেখ নাদির হোসেন লিপু।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার স্বার্থে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের জন্য দেশের বিভিন্ন বিভাগে প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি এবং কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে নতুন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের ২০০৯-'১৪ সময়কালে মিল্ক ইউনিয়নের সমিতির সদস্য ছিল ১,২০,৭০৮ জন এবং ২০১৫-'২০ সময়কালে সমিতির সদস্য সংখ্যা হয়েছে ১,৩০,০৬৮ জন। যা গ্রামীণ অর্থনীতিকে দিনদিন আরও গতিশীল করতে সহযোগিতা করছে।

বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো বিভাগেই মিল্ক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সমিতি রয়েছে। বর্তমানে মিল্ক ইউনিয়নের আওতাধীন মোট ৬৯টি কেন্দ্রীয় সমিতি রয়েছে। সমবায় আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের সময়কালে মিল্ক ইউনিয়নের এসব কেন্দ্রীয় সমিতিগুলো গঠন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সমিতির গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সাংগঠনিকভাবে সম্পৃক্ত করে জনগণকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে এবং গ্রাম পর্যায়ে দলগত নেতৃত্বের বিকাশ সাধিত হয়েছে।

মিল্ক ইউনিয়নের প্রাথমিক সমিতি ও কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য অন্তর্ভুক্তি

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, জনমানুষের জীবনমানের উন্নয়নসহ গ্রামীণ অর্থনীতিকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রাথমিক সমিতিতে পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি মহিলা সমবায়ীদেরকেও সমিতির সদস্যভুক্ত করা হচ্ছে। ২০০৯ সালে প্রাথমিক সমিতির মহিলা সদস্য সংখ্যা ছিল ৬,২৮০ জন সেখানে ২০২০ সালে বিভিন্ন প্রাথমিক সমিতিতে মহিলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২১,২০৬ জন হয়েছে। যার ফলে গ্রামীণ মহিলাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা সহজ হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান ঢাকা দুগ্ধ কারখানার মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম দেখছেন।

মিল্ক ইউনিয়নের সেবামূলক কার্যক্রম

এ প্রতিষ্ঠান খামারিদের নিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মিল্কভিটা বিনামূল্যে সমবায়ী দুগ্ধ খামারিদের গবাদি পশুর চিকিৎসা, ভ্যাকসিন এবং অধিক উৎপাদনশীল গাভির জাত উন্নয়নের জন্য উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে বিনামূল্যে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বিনামূল্যে গবাদি পশুর চিকিৎসা, ভ্যাকসিনেশন এবং কৃত্রিম প্রজননের ফলে খামারিগণ নিশ্চিন্তে তাদের গবাদি পশু লালনপালন করতে পারছেন এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জেনেটিক মেরিট সম্পন্ন সংকর জাতের গাভি উৎপাদনের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন দিনদিন বৃদ্ধি করতে পারছেন।ফলে দুধের উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন প্রাথমিক সমিতির দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ীদের আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদি পশু লালনপালন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, দুগ্ধ দোহন, গাভির জাত উন্নয়ন, কৃত্রিম প্রজনন এবং উচ্চফলনশীল ঘাস চাষের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এতে সমবায়ী খামারিগণ সহজেই স্বল্পব্যয়ে গুণগতমানসম্পন্ন অধিক দুগ্ধ উৎপাদন করার মতো উপযোগী খামার গঠন করতে পারেন। যা তাদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করে থাকে।

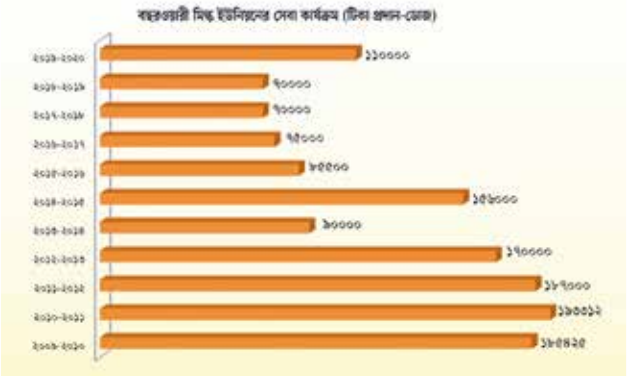

মিল্ক ইউনিয়নের গাভি ঋণ কার্যক্রম

মিল্ক ইউনিয়নের আওতাধীন প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতির দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে বিনাসুদে শুধুমাত্র ৫% সার্ভিস চার্জ নিয়ে সমিতির সদস্যদের মধ্যে গাভি ক্রয়ের জন্য এবং মডেল দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক সমিতির পুরুষ এবং মহিলা সকল সদস্যই এই ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। প্রদানকৃত ঋণের অর্থ সহজশর্তে ৭২ কিস্তিতে সমবায়ীদের সরবরাহকৃত দুধের মূল্য থেকে কর্তন করা হয়ে থাকে। ফলে সমবায়ীগণ অত্যন্ত সহজভাবেই তাদের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে থাকেন। যা আদায়ের হার ৯৭%।

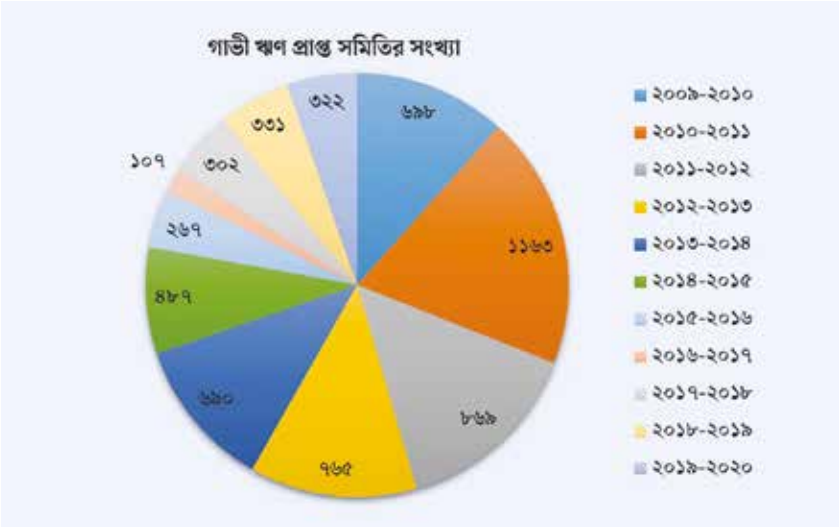

মিল্ক ইউনিয়নের দুগ্ধ পণ্য উৎপাদন কার্যক্রম

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ইউনিয়ন) সারা দেশের ভোক্তা -সাধারণের চাহিদাকে সম্মান জানিয়ে প্রতিবছরই গুণগতমানের পুষ্টিসমৃদ্ধ নতুন নতুন দুগ্ধ পণ্য উৎপাদন করে যাচ্ছে। যা মিল্কভিটা পণ্য হিসেবে সারা দেশের ভোক্তা সাধারণের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে। বিগত ২০১১ এবং ২০১৪ সালে পরপর ২ বছর মিলিয়ার্ড ব্রাউন এবং ব্র্যান্ড ফোরাম বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে মিল্কভিটা সর্বশ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড হিসেবে পুরস্কার লাভ করে।

মিল্ক ইউনিয়নের বিভিন্ন দুগ্ধ পণ্য বিপণন কার্যক্রম

দুগ্ধ পণ্য বিপণন ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কৌশল পরিবর্তন করে ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে ৫টি বিক্রয় কেন্দ্র এবং ১০৯টি পরিবেশক নিয়োগের মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থাপনায় যুগোপযোগী নীতি ও কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতি ও কৌশল গ্রহণ করার ফলে পাস্তুরিত তরল দুধ ও দুগ্ধ পণ্য বিক্রি দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা ওপরের পাই চার্টে দেখানো হলো।

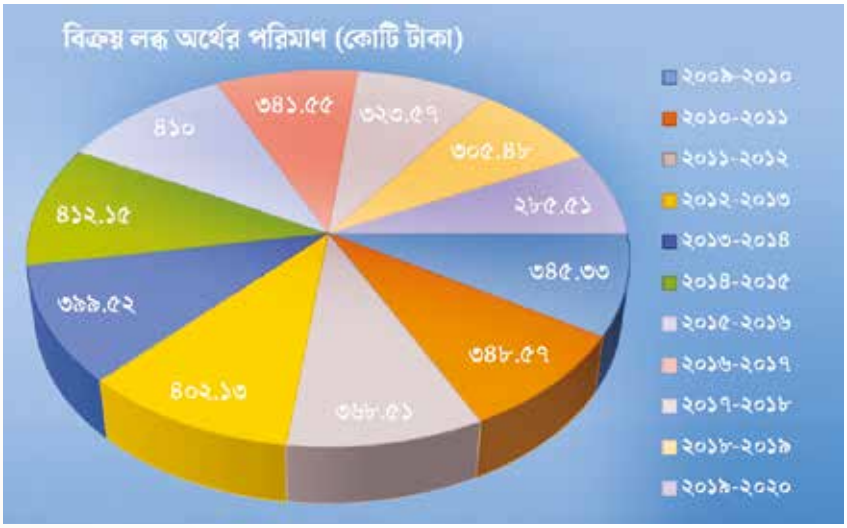

মিল্ক ইউনিয়নের পরিবর্তিত বিপণন নীতিমালা ও কৌশল এবং গুণগতমানে উৎকর্ষের কারণে রসমালাই, মিষ্টি দই এবং টক দই এর চাহিদা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল পণ্য উৎপাদনে কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্যমূল্যে অধিক দুগ্ধ ক্রয় করা হচ্ছে। এতে কৃষক তাদের উৎপাদিত দুধ ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

মিল্কভিটা বাংলাদেশে একমাত্র দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী একটি জাতীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান, যা মিল্কভিটা ব্র্যান্ডে দুগ্ধ ও দুগ্ধপণ্য বিক্রি করে থাকে। আজ থেকে ১০ বছর আগে দুধ ও দুগ্ধ পণ্য বিপণনে সারা দেশে মিল্কভিটা পণ্য একক আধিপত্য বিস্তার করে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কিন্তু বিগত ৫ বছর যাবৎ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনকারী আরও প্রায় ১৮/২০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটাকে অনুসরণ করে বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ফলে মিল্কভিটার কিছু কিছু দুগ্ধ ও দুগ্ধ পণ্য বিপণন ২০০৯-২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬-২০২০ সালে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কমেছে এবং কিছু কিছু দুগ্ধ ও দুগ্ধ পণ্য বিপণন ২০০৯ - ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬-২০২০ সালে তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেড়েছে। তদুপরি কোভিড-১৯ এর কারণে গত মার্চ-২০২০ হতে দুধ ও দুগ্ধ পণ্য বিপণন কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

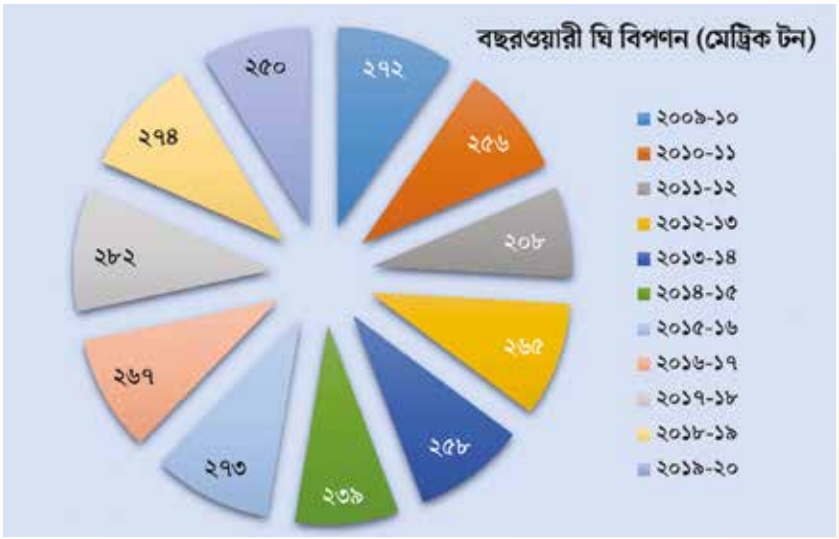

একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব আ.স.ম ফিরোজ এমপি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ কারখানা পরিদর্শন।

মিল্কভিটা সৃষ্টির শুরু থেকেই দেশের উত্তরবঙ্গ হিসেবে পরিচিত জেলাসমূহের দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকের সমুদয় দুধ ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করে থাকে। এতে প্রতিবছর মিল্কভিটা প্রায় ৭-৮ কোটি লিটার দুধ ক্রয় করেছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার ফর্মুলা অনুযায়ী বিভিন্ন দুগ্ধ পণ্য তৈরির মাধ্যমে পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রেখে বিশ্বস্ততার সাথে ভোক্তা সাধারণের নিকট সাশ্রয়ীমূল্যে সরবরাহ করেছে। কিন্তু ২০ বছর পূর্বের তুলনায় বর্তমানে দুগ্ধ উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এবং ২০১৯-'২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে সমিতি পর্যায়ে আনুপাতিক হারে মিল্কভিটার দুগ্ধ সংগ্রহ ও বিপণন কার্যক্রম পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় কিছুটা কমেছে।

বাংলাদেশে দুধের চাহিদা, দুধের উৎপাদন এবং দুধের প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী জনপ্রতি প্রতিদিন ২৫০ মিলি লিটার হিসেবে বাংলাদেশে প্রতিবছর তরল দুধের চাহিদা ১৫২.০২ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশের প্রতিবছর তরল দুধ উৎপাদন হচ্ছে ১০৬.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন, যা জন প্রতি প্রতিদিন ১৭৫.৬ মিলি লিটার করে হয়ে থাকে।

চিত্র নং-২১

মিল্ক ইউনিয়ন কর্তৃক তরল দুধের উৎপাদন, চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত তথ্য

বাংলাদেশে প্রতিবছর তরল দুধ উৎপাদন হয় ১০৬.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে মিল্ক ইউনিয়ন গত অর্থবছরে মোট দুধ সংগ্রহ করেছে ৪৩,৩০০ মেট্রিক টন। যা দিয়ে দেশের মোট দুগ্ধ উৎপাদনের শতকরা ৩ ভাগ এবং দেশের দুধের চাহিদা শতকরা ০.৪০৫ ভাগ পূরণ হয়েছে।

এ ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে গঠিত সরকার বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষক পর্যায়ে দুগ্ধ উৎপাদন ব্যয় কমানোর উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে প্রায় ২,৭৭৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গবাদি পশুর দানাদার গো-খাদ্য উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের অনুমোদন দেন, যার সুফল আজ সারা দেশের সমবায়ী কৃষক ভোগ করছেন এবং স্বল্পব্যয়ে অধিক দুগ্ধ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত সমুদয় দুধ মিল্ক ইউনিয়নের মাধ্যমে সংগ্রহ করে চাহিদা অনুযায়ী বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ২০১৫ সালে প্রায় ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মিল্কভিটার আওতায় সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িঘাটে একটি অত্যাধুনিক গুঁড়োদুধ উৎপাদন কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রাম বিভাগে দুধের উৎপাদন এবং চাহিদা অনুযায়ী বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০১৭ সালে প্রায় ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামের পটিয়ায় একটি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করার অনুমোদন দিয়েছেন। দুগ্ধ উৎপাদনের ব্যয় কমানোর পাশাপাশি অধিক দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার ২০১৬ সালে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদি পশুর জাত উন্নয়নের জন্য প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি মহিষ প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দেন। ফলে ভারত থেকে মুররাহ্ জাতের মহিষ

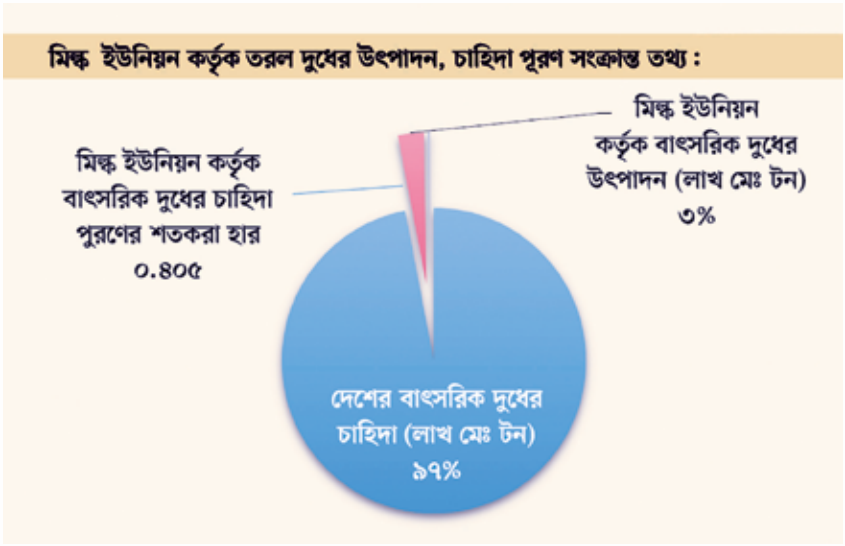

চিত্র নং-২২

আমদানির মাধ্যমে গাভির পাশাপাশি মহিষ পালনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুরে এবং মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার টেকেরহাটে মহিষের খামার স্থাপন করা হয়েছে। এখান থেকে উন্নতজাতের মহিষের বকনা বাচ্চা সমবায়ীদের মাঝে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে মিল্কভিটা সম্পূর্ণ সরকারি অনুদানের মাধ্যমে প্রায় ৩৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার চরাঞ্চল ও তার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে দুগ্ধবতী গাভির জাত উন্নয়ন এবং দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও সারা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় মিল্কভিটার কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য আরও প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকার ৬টি প্রকল্পের ডিপিপি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, প্রতিটি মানুষের প্রাণিজ পুষ্টির চাহিদা মিটবে এবং গুঁড়োদুধ আমদানি না করে বিপুল পরিমাণের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে আমিষের ঘাটতি পূরণ করে একটি মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান ঘটাতে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

অমর চান বণিক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যুগ্ম সচিব), বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড, (মিল্কভিটা)।

বঙ্গবন্ধুর পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ভাবনা: উন্নয়ন অভিযাত্রায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সমবায় অধিদপ্তর

সমবায় ভবন, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, প্রশাসনিক ভবন, কুমিল্লা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

পল্লী ভবন, বিআরডিবি, কাওরান বাজার, ঢাকা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সিলেট

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ

প্রশাসনিক ভবন

হোস্টেল ভবন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

প্রশাসনিক ভবন

নির্মাণাধীন আন্তর্জাতিক হোস্টেল ভবন

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

প্রশাসনিক ভবন

আন্তর্জাতিক হোস্টেল ভবন

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

প্রশাসনিক ভবন

নির্মাণাধীন গুড়াদুধ প্রকল্প, বাঘাবাড়িঘাট, সিরাজগঞ্জ

নির্মাণাধীন শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর

প্রশাসনিক ভবন

হোস্টেল ভবন

নির্মাণাধীন পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর

প্রশাসনিক ভবন

হোস্টেল ভবন

পল্লী জনপদ

নির্মাণাধীন পল্লী জনপদ, রংপুর

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক ভবন, মতিঝিল, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়